শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল - জুন ২০১১

প্রকাশকাল
১৫.১২.২০১১

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইলঃ golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২২০.০০ টাকা
২২০.০০ রুপি
৪ $ ডলার

সংখ্যাটি বের করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ।

শরমিন নিশাত
১০.০৬.২০১১

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

শওকত হোসেন
১৫.০৬.২০১১

স ম্পা দ কী য়

গেল বছর ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর জন্মশতবার্ষিকী; আমাদের সরকার চাইলে জাতীয় পর্যায়ে কিছু করতে পারত । বলি, সরকারের কত কাজ পড়ে থাকে; প্রীতিলতার কথা মনে রাখবার ফুরসত কই!

তারেক মাসুদ-মুশিক মুনীরসহ কয়েকজন গুণী ব্যক্তি; লোকে বলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন– আমাদের কেন যেন মনে হয়; মারা হয়েছে! ঘাতক গ্রেফতার হলেও ছাড়া পেতেও তার সময় লাগেনি!

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীকে প্রায় প্রকাশ্যে খুন করল একটি হাসপাতাল; চিকিৎসা যখন ব্যবসায়– ফলে সব হাসপাতালই তো রোগী চায়; বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়, মুনাফার আশায়!

'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি'– বর্তমান সরকার একাধিক বৈশ্বিক চুক্তি করেছে; যা দেশের জনগণের বড় ক্ষতি বয়ে আনবে ।

শেয়ার বাজারকে ব্যবহার করে সরকার মূলত কিছু লোককে লুট করবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে; এটি হঠাৎ করে ঘটে যায়নি, এটি পূর্ব-পরিকল্পিত । এরা গেলবার ক্ষমতায় এসে একই কাজ করেছিল ।

'যুদ্ধাপরাধী বিচার'-এর মুলা দেখিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসতে পারলে নিশ্চয়ই শেয়ার বাজার নিয়ে তৃতীয় রুটিন খেলাটি খেলবার সুযোগ নেবেন ইনশাল্লাহ! কিন্তু এর ফল যে ভয়াবহভাবে অমঙ্গলকর, এরা কি বোঝে না? 'জিজিএন' খেল, 'যুবক' খেল, 'শেয়ারবাজার খেল'; সাধারণ মানুষদের শোষণ-নিপীড়ণের জন্য ব্রিটিশ-পাকিস্তানির আর কী দরকার?

সাহিত্যাঙ্গনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর নামে পুরস্কার প্রবর্তন করা সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি; ইলিয়াস বাংলা একাডেমীর পুরস্কার পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রয়োজন ইলিয়াসের লেখাকে পাঠকের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেয়া।

বাংলাদেশে ছোট কাগজ, সাহিত্য কাগজ ইত্যাদি কম বেরুচ্ছে না; এর লেখক-সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু শ্রেণী-চিন্তার প্রশ্নে সম্পাদক ও লেখকদের প্রায় সবাই দ্বিধান্বিত, সে-কারণে এঁরা নির্বাকও; একে রাজনীতি শূন্যতা বলা যেতে পারে; আর রাজনৈতিক নৈতিকতা তো জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংকটের চরমে পড়েই আছে। অন্যদিকে বিশ্বের সাধারণ মানুষ আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ এবং ধূর্ত নীরবতাবাদের বিপরীতে পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছে। খোদ ওয়ালস্টিট-ই দিচ্ছে একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাষ! দুঃখজনক হলেও সত্যি, সেই পূর্বাভাস কিন্তু আমাদের সাহিত্যে উঠে আসছে না; যেমনটি আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে আসেনি মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে মুক্তিযুদ্ধের পুর্বাভাষও।

আমাদের কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার, সংগীত ও চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রী সবার– চরম ভোগবাদী এই বিশ্বে শ্রেণী-চিন্তার উদয় হোক!

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
১৫.১২.২০১১

সূচি

স্ম র ণ
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ০৮

ব্য ক্তি ত্ব / প্র ব ন্ধ
শতবর্ষের প্রীতিলতা: দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুৎলতা
ম ফি দু ল হ ক ০৯

দ র্শ ন / প্র ব ন্ধ
রামমোহন এবং ইসলাম
সৈ য় দ মু স্তা ফা সি রা জ ২৩

রা জ নী তি / প্র ব ন্ধ
দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের স্বরূপ প্রসঙ্গে
জা তী য় মু ক্তি কা উ ন্সি ল [লেখক-নামের পরিবর্তে] ৩৬

মূ ল্যা য় ন / প্র ব ন্ধ
প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: নতুন জগতের অসামান্য কারিগর
আ নু মু হা ম্ম দ ৪২

এক আজীবন প্রতিবাদী মুখ: শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
শু ভ কি ব রি য়া ৫৫

চ ল চ্চি ত্র / প্র ব ন্ধ
আজকের প্রেক্ষাপট: আমাদের চলচ্চিত্র
মা হ বু ব জা মি ল ৬০

আমার শিক্ষক তারেক মাসুদ
স লি মু ল্লা হ খা ন ৬৬

চলচ্চিত্র 'রানওয়ে': সমকালীন বাস্তবতার বোঝাপড়া
বেলায়াত হোসেন মামুন ৭১

নাটক / প্রবন্ধ
নাটকের রবীন্দ্রনাথ: সৌন্দর্য ও রসবোধ
ফরীদুল আলম ৮১

মূল্যায়ন / প্রবন্ধ
কাইজার চৌধুরীর কিশোরসাহিত্য
চঞ্চল আশরাফ ৯২

কবিতা
একুশ জন কবির একুশটি কবিতা ৯৭

প্রকাশিত কবিতার দু'টি আলোচনা
রহমান হেনরী : এক / সাকিরা পারভীন : দুই ১১৫

চিত্রশিল্প / প্রবন্ধ
বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে নারীর অবদান
রবিউল হুসাইন ১২৩

নারী / প্রবন্ধ
সমাজতান্ত্রিক দেশে নারী
রেহনুমা আহমেদ ১২৯

ছড়া / প্রবন্ধ
ছড়া ভাবনা
আমীরুল ইসলাম ১৩৮

আবৃত্তি / প্রবন্ধ
জাতীয় মানস গঠনে আবৃত্তিশিল্প
মাহিদুল ইসলাম ১৪৭

শোক অথবা স্মরণ: সাক্ষাৎকার
শেষ পর্যন্ত লেখাই আমার প্রিয়তম বিষয়: রশীদ করীম
ব্রাত্য রাইসু ১৫১

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী: স্মরণ ও মূল্যায়ন
নিঃশব্দের কথা
কুহেলী ইসলাম ১৫৯

অনুবাদ/গল্প
জুতো
নাসার ইব্রাহিম/অনুবাদ: শওকত হোসেন ১৬২

বিশ্বসাহিত্য/প্রবন্ধ
টোমাস ট্রান্সট্র্যোমার: পরাবাস্তব চিত্রকল্প আর আত্মজৈবনিক বাস্তববাদ
কুমার চক্রবর্তী ১৬৭

স্থাপত্য/প্রবন্ধ
‘পুরান ঢাকা’ বনাম নতুন ঢাকার ‘উত্তরা’
সুরাইয়া জাবীন ১৮১

পর্যটন/প্রবন্ধ
বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য-জগৎ ও পর্যটন শিল্পের নতুন দিগন্ত
ফারহানা রশীদ তনু ১৮৮

চি ত্র শি ল্প/ প্র ব ন্ধ
এস. এম. সুলতান : বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা
শ ও ক ত হো সে ন ১৯৪

পু ন র্মু দ্র ণ/ প্র ব ন্ধ
কেন লিখি
জী ব না ন ন্দ দা শ ২০২

গ ল্প
মানুষের প্রতিপক্ষ ঘুণপোকা ঘুণপোকার প্রতিপক্ষ মানুষ
মানুষের প্রতিপক্ষ মানুষ
তা রে ক শা হ রি য়া র ২০৫

স্মরণ

....

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

১৯১১-১৯৩২

[প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দের নামেও পরিচিত (জন্ম: মে ৫, ১৯১১; মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৩২), ডাকনাম রাণী, ছদ্মনাম ফুলতারা, একজন বাঙালি ছিলেন, যিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহিদ ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জন্ম নেয়া এই বাঙালি বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তখনকার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং জীবন বিসর্জন করেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব দখলের সময় তিনি ১৫ জনের একটি বিপ্লবী দল পরিচালনা করেন। এই ক্লাবটিতে একটি সাইনবোর্ড লাগানো ছিলো যাতে লেখা ছিলো "কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ"। প্রীতিলতার দলটি ক্লাবটি আক্রমণ করে এবং পরবর্তীতে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। পুলিশের হাতে আটক এড়াতে প্রীতিলতা সায়ানাইড গলাধঃকরণ করে আত্মহত্যা করেন।]

তথ্যসুত্রঃ উইকিপিডিয়া

শতবর্ষের প্রীতিলতা: দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুৎলতা

ম ফি দু ল হ ক

আজ থেকে শতবর্ষ আগে জন্ম নেয়া যে-নারী বুকের রক্ত ঢেলে মুক্তির মন্দির সোপানতলে জীবন-উৎসর্গ করেছিলেন মাত্র একুশ বছর বয়সে, সেসব অনেককাল আগের কথা, তবু তো দেশবাসীর অন্তর থেকে কখনো মুছে যান নি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তাঁর জীবন, কর্মশপথ ও প্রাণাহুতি আলোড়িত করেছে পরবর্তী অযুত মানুষের হৃদয়, উদ্বেলিত করেছে কত অগণিত নবীন-নবীনার অন্তর। তিনি বাংলার তরুণ-সমাজের আইকন, যেমনভাবে চে গুয়েভারা হয়ে আছেন বিশ্বতারুণ্যের আইকন, কালের সীমানা উভয়ে অতিক্রম করেছেন স্ব-স্ব পরিসরে। প্রীতিলতার আত্মদানের কাহিনী সবার জানা, অথচ তাঁর সম্পর্কে জানা যায় কতই-না সামান্য। আর সেজন্যেই বুঝি তাঁকে বলা যায় 'দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুৎলতা', চকিতে জ্বলে উঠেছিলেন ঝড়ো রাতের অন্ধকারে, পথের দিশা যুগিয়ে আবার মিলিয়ে গিয়েছিলেন কোন অসীমে, গানের পঙ্ক্তি যেন তাঁকে নিয়েই লেখা, 'সহসা কী হাসি হাসো, নাহি কহ কথা/আঁধার ঘনায় শূন্যে, নাহি জানে নাম।'

কথা বিশেষ বলেননি প্রীতিলতা, জানবার জন্য রেখে গেছেন সামান্য কিছু পসরা। অথচ প্রায় একার চেষ্টায় আকস্মিক ঝাঁকুনিতে তছনছ করে দিয়েছিলেন গোটা সমাজ, বদ্ধ ধারণার ভিত কেঁপে উঠেছিল প্রবল কম্পনে, ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঘটেছিল অভাবিত ঘটনা, এক নারীর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভিযাত্রীদল আক্রমণ করলো ইংরেজদের আস্তানা। বোমার আঘাতে তছনছ পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবের অদূরে পড়ে ছিল দলনেতার প্রাণহীন দেহ, পুলিশের এস.পি রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, আক্রমণকারী দলের কারোরই হদিশ মেলেনি, রেলওয়ে ইন্সটিটিউটের ১০০ গজ দূরে রাস্তার পাশে পাওয়া গিয়েছিল 'এক বাঙালির লাশ, পরে দেখা গেল পুরুষের পোশাকে তিনি এক বাঙালি নারী।' জেলা প্রশাসক (ডি.এম) জানিয়েছিলেন, 'তিনি যে আক্রমণকারী দলের প্রধান তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।' তদন্তে শনাক্ত করা গিয়েছিল এই নারী হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, পুলিশের খাতায় যাঁর নাম উঠেছিল আগেই। তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছিল একটি পয়েন্ট ফোরফাইভ-ও রিভলবারের কিছু গুলি, একটি বাঁশি, বিপ্লবী

প্রচারপত্র, ফাঁসিতে মৃত্যুবরণকারী অপর বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি এবং তাঁর নিজের হাতে লেখা বিবৃতি– কেন তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়ে জীবন উৎসর্গ করবার লড়াইয়ে ঝাঁপ দিলেন তা সেখানে বিধৃত হয়েছে সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়-মথিত ভাষায়। প্রীতিলতার বিবৃতিতে মুক্তিশপথ উচ্চারিত হয়েছে দুইভাবে, একদিকে তিনি বলেছেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবনপণ লড়াইয়ের কথা, অপরদিকে বলেছেন প্রচলিত সকল গণ্ডি ভেঙে পুরুষের সঙ্গে সমতালে, এমনকি পুরুষের মতোই সমভাবে, সশস্ত্র অভিযানের নেতৃপদে নারীর অধিষ্ঠানের মধ্যে নারীসত্তার মুক্তির কথা। অসাধারণ এই দলিল প্রীতিলতা সম্পর্কে অনেক কিছু আমাদের জানায়, সেইসাথে মনে হবে জানার চাইতে অজানা রয়ে গেল বুঝি আরো বেশি। প্রীতিলতা ছিলেন গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য, এমন এক সময়ে তিনি সদস্যপদ পেয়েছিলেন যখন বিপ্লবী দলে নারী ব্রাত্য হিসেবে বিবেচিত হত। তবে এই বিবেচনায় চিড় ধরতে শুরু হয়েছিল এর কিছু আগেই, ছিল অন্যান্য দেশের উদাহরণ, আর বাংলাতে এই উদাহরণ তৈরি করেছিলেন লীলা রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক নারী, অনিল রায়ের সঙ্গে মিলে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীসংঘ, স্বয়ং দীপালী সংঘ গঠন করে মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন শরীরচর্চা, লাঠিখেলা এবং আত্মরক্ষার জন্য ছোরাচালনা। বোঝা যাচ্ছিল নতুন এক নারীর জাগরণের পথ করে দিতে চাইছেন লীলা রায়, যাঁর সঙ্গে ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়তে আসা ষোড়শী প্রীতিলতার যোগাযোগ ঘটতে বিলম্ব হয়নি। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে, প্রকাশ্যে সেই নেতাদের যোগ ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে, গোপনে 'যুগান্তর' দলের সাথে, আর একান্ত সংগুপ্তভাবে চলছিল আইরিশ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আদলে প্রজাতান্ত্রিক মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রয়াস, তো সেই দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রীতিলতার যে উদগ্র আগ্রহ তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন দলনেতা সূর্যকুমার সেন। দলভুক্ত অথবা দলসম্পৃক্ত নারীরা কী কাজ করবে তার কিছুটা আপোষমূলক পন্থাও সেই সাথে স্থির হয়েছিল। নারীরা দলভুক্ত হবে বটে, তবে তাদের ভূমিকা হবে যথাসম্ভব নারীসুলভ, রাজনীতিক দলে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ফারাক রয়েছে, সেই পার্থক্য-রেখা বিপ্লবী দলেও থাকবে, সংসারের গন্ডিতে থেকে বিপ্লবী নারী পালন করবেন সহায়ক ভূমিকা। এমনি অবস্থান মান্য করেই দলে এসেছিলেন প্রীতি এবং একান্ত অল্প সময়ে কীভাবে সশস্ত্র আক্রমণে নেতৃভূমিকা গ্রহণ করলেন অতিক্রান্ত সেই পথের পরিচয় আমরা পুরোপুরি জানি না। সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে মন্ত্রগুপ্তির যে আদর্শ অনুসরণ করতে হয় তার ফলে প্রীতিলতা এই উত্তরণের কোনো লিখিত পরিচয় রেখে যাননি। তাঁর যে ডায়েরিতে তিনি কিছু কথা লিখেছেন, ভাগ্যক্রমে সেটা রক্ষা পেয়েছিল পুলিশি তালাশ থেকে, পরে সহকর্মীর কাছ থেকে ডায়েরির কতক অংশ টুকে নিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, চট্টগ্রামের যে বিপ্লবী সন্তান ছিলেন অসাধারণ মানবিক গুণাবলির ধারক এবং পাকিস্তান পর্বের বামপন্থী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যাঁর ছিল বিশেষ অবদান। প্রীতিলতা প্রসঙ্গে বারবার আমাদের

ফিরতে হবে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কাছে, তবে এক্ষণে কেবল এটুকু উল্লেখ করলেই হয়, প্রীতিলতার সেই ডায়েরির খোঁজ পরে আর পাওয়া যায় নি, থেকে গেছে কেবল পূর্ণেন্দু দস্তিদার টুকে নেওয়া অংশটুকু। প্রীতিলতা সম্পর্কে জানবার আরেক সূত্র দীক্ষাগুরু সূর্য সেনের প্রতিক্রিয়া, প্রীতির আত্মাহুতিদানের অব্যবহিত পরে যন্ত্রণাদগ্ধ নেতা 'বিজয়া' নামে সংক্ষিপ্ত এক রচনায় ব্যক্ত করেছিলেন আপন প্রতিক্রিয়া। আর রয়েছে প্রীতির কর্মসঙ্গী বিপ্লবী আন্দোলনের আরেক মহিয়সী নারী কল্পনা দত্তের স্মৃতিভাষ্য, যদিও পরিসরে খুব বড় নয়। তবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথা জানবার সবচেয়ে তাৎপর্যময় অবলম্বন হয়ে আছে পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রণীত 'বীরকন্যা প্রীতিলতা' গ্রন্থ, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতার শহীদ দিবসে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশ করেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই প্রকাশমাত্র জাগিয়েছিল ব্যাপক সাড়া এবং আজো হয়ে আছে প্রীতিলতা সম্পর্কিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এর বাইরে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কারো কারো স্মৃতিকথায় এসেছে প্রীতিলতা প্রসঙ্গ, তবে সেটা তেমন উল্লেখ্য কিছু নয়। কেননা ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহকালে প্রীতিলতা দলের সঙ্গে গোপনে সম্পৃক্ত হয়েছেন মাত্র, এই যোগাযোগের হোতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও দলের মূল নেতা মাস্টারদা ছাড়া আর কেউ তা বিশেষ জানতেন না। যুব বিদ্রোহে প্রীতিলতার সম্পৃক্তির কোনো অবকাশ ছিল না, কেননা তিনি তখনো দলের ভেতর-মহলের কেউ নন, প্রতিশ্রুতিশীল এক তরুণী-কিশোরী মাত্র। পরে যখন তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুবাদে দলের সঙ্গে অনেক নিবিড়ভাবে যুক্ত হলেন ততক্ষণে নেতারা সবাই কারাগারে অথবা বিদ্রোহকালে বরণ করেছেন শাহাদাৎ। আর প্রীতিলতা যখন নিজেই জীবন বিসর্জন দিলেন তখনও তো অবশিষ্ট নেতারা হয় কারাগারে, নতুবা পলাতক, কারো সঙ্গে তাই প্রীতিলতার যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ আর দেখা দেয়নি। সেজন্য চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের স্মৃতিচারণে প্রীতিলতার উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে বিশেষ নতুন তথ্যের যোগান দিতে পারেননি মানিনী চ্যাটার্জি, যদিও ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'ডু অ্যা ডাই : দি চিটাগং আপরাইজিং' এ-বিষয়ে এ-যাবৎ প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে অনায়াস স্বীকৃতি পেতে পারে। মানিনী চ্যাটার্জি নয়াদিল্লির জাতীয় আর্কাইভে অনেক দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে পেরেছিলেন, তাঁর নিজেরই ভাষায় এ-যেন ছিল আলিবাবার গুহা। মামলার কাগজপত্র যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি দেখেছেন চট্টগ্রাম, কলকাতা ও দিল্লি থেকে চালাচালি করা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নথি। তাছাড়া তাঁর সুযোগ ঘটেছিল প্রীতিলতার আক্রমণদলের সাথী কালীকিঙ্কর দে-র সাক্ষাৎকার নেয়ার, যে সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় প্রীতির আত্মাহুতির বিবরণী। ক্লাব আক্রমণকালে কোনো এক ইউরোপীয়র ছোঁড়া পিস্তলের গুলি প্রীতিলতার বুক ঘেঁষে চলে গিয়েছিল এবং রক্তাক্ত অবস্থায়ও সাথীদের ফিরে যাওয়ার পথ করে দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর নিজের অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন সহকর্মীর হাতে। সবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠ সহযোদ্ধাকে

সম্বোধন করে বললেন, 'কালীদা, আপনি ফিরে যান, তবে আপনার সায়ানাইডটুকু আমাকে দিয়ে যান।' মানিনী চ্যাটার্জির বই থেকে ঘটনা-পরম্পরা ভালোভাবে বোঝা যায় না। অনুমান করা যায় আহত প্রীতিলতা তাঁর নিজের কাছে রাখা সায়ানাইডটুকু ইতিমধ্যে মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। কালীকিঙ্কর দে বলেছেন, 'ও আর কথা বলতে পারছিল না, আমি আমার সায়ানাইড বের করে ওর মুখে ঢেলে দিলাম। মনে হয় সায়ানাইড খুব বেশি সময় নেয় না। হতে পারে নিজের সায়ানাইডেই ওর মৃত্যু ঘটেছে।'

মৃত্যুর পর প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে এটা তো ভালোভাবে বোঝা যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করবার সকল প্রস্তুতি নিয়েই প্রীতি ঝাঁপ দিয়েছিলেন অভিযানে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যদি গুলিতে আহত না-হতেন তবে কি তিনি এভাবে জীবন-বিসর্জন দিতেন? আক্রমণের পর কীভাবে তাঁরা সরে আসবেন সেসব ব্যবস্থাদি তো করা ছিল, তদুপরি প্রীতিলতার আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। কিন্তু সেই চরম উত্তেজক মুহূর্তে দলের পুরুষ-সদস্যরা বোধকরি কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। দলনেতা প্রীতিলতার নির্দেশ অমান্য করবার মতো শক্তি তাঁরা কেউ দেখাতে পারেননি। এমনকি প্রীতিলতার মুখে নিজ হাতে সায়ানাইড ঢেলে দেয়ার মতো কাজটিও করতে পেরেছেন তাঁর সহযোদ্ধা, অথচ আহত দলনেতাকে বহন করে ফিরবার চেষ্টা কেউ নিলেন না। যুদ্ধের জীবন-মরণ উত্তেজনার পরিস্থিতিতে মানুষ কী সিদ্ধান্ত নেবে, তার বিচার সুস্থ স্বাভাবিকভাবে করা সম্ভব নয়। তদুপরি গুর্খা সৈন্যদের রক্তচক্ষু টহলদারি যখন চলছে চট্টগ্রাম শহর জুড়ে, তখন মরণের প্রস্তুতি নিয়েই পাঁচ তরুণ ও এক তরুণী ঝাঁপ দিয়েছিলেন অবিশ্বাস্য আক্রমণাভিযানে, মৃত্যুকে মোকাবিলায় তাঁরা সম্মিলিতভাবেই ছিলেন প্রস্তুত, ফলে আজকের মানসিকতা নিয়ে সেই অস্বাভাবিক সময়কে বুঝতে পারা কঠিন। তবু থেকে যায় জানবার অনেক আগ্রহ, প্রীতিলতার পাঁচ সাথী সফলভাবে ফিরে আসতে পেরেছিলেন অভিযান শেষে, পুলিশ কখনোই তাঁদের হদিশ করতে পারেনি, তারপরও, ব্রিটিশ বিদায়ের পরও তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোনো ভাষ্য কেন পাওয়া গেল না নারী নেতৃত্বে পরিচালিত এমন অনন্য অভিযান সম্পর্কে, কেন জানা গেল না অভিযানের আগে সমবেত হওয়া মুহূর্তগুলোর বিবরণ, কীভাবে প্রীতিলতা অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন সকলকে, কীভাবেই-বা সাহায্য করলেন সকলের সফল পশ্চাদপসরণে, কেন তাঁরা চলে এলেন প্রীতিলতাকে ফেলে।

প্রীতিলতার জন্মশতবর্ষের ক্ষণে আমরা নিশ্চয় আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চাইব তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য, নানা ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে জেনে নিতে চাইব প্রীতিলতার প্রীতি হয়ে ওঠার কথা। যৎসামান্য সেসব তথ্য আমাদের সামনে রয়েছে তা আরো যাচাই-বাছাই করে দেখতে চাইব, সেই সাথে চাইব যেন অব্যাহত থাকে প্রীতিলতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া।

দুই.

বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রথমে কিছুটা নিবিড়ভাবে দেখে নিতে চাইব প্রচলিত যেসব তথ্য ও দলিল আমাদের কাছে রয়েছে। এরপর আমাদের হাতে আসা কিছু নতুন তথ্য ও দলিল পাঠকের কাছে পেশ করা হবে, চমকপ্রদ যেসব অজানা তথ্যভাণ্ডার আমাদের জন্য উন্মোচিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন গবেষক রেজিনা বেগম। তাঁর সংগৃহীত কাগজপত্রের ভিত্তিতে আমরা প্রীতিলতাকে আরো কিছুটা গভীরভাবে জানবার সুযোগ পাচ্ছি, সেজন্য নিঃসন্দেহে সকলের সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রীতিলতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রীতিলতা ছিল তাঁর সম্পর্কিত বোন। বয়সে তিনি ছিলেন প্রীতিলতার চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড়। 'লেখকের কথা' প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'প্রীতিলতা আমার সহোদর ছোটবোনের মতো। তাঁর জন্ম আমাদের গ্রামের বাড়িতেই। খুব অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে প্রীতিলতার পিতা পার্শ্ববর্তী গ্রাম ডেঙ্গাপাড়া থেকে বিধবা মায়ের সঙ্গে তাঁর মাতুলালয়ে ধলঘাট গ্রামে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর মামা (আমার পিতামহ) তাঁর মা অন্য দুই ছোট ভাইয়ের জন্য আমাদের গ্রামের ভদ্রাসনের এক অংশ বসবাসের জন্য ছেড়ে দেন। পরে ঐ বাড়িতেই প্রীতিলতার জন্ম হয়।' ভূমিকাংশে নিজের সঙ্গে প্রীতিলতার সম্পর্কের কথা এমনভাবে লিখেছেন বটে পূর্ণেন্দু দস্তিদার, কিন্তু তাঁর মূল গ্রন্থে প্রীতির মানস-গঠন ও বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনে নিজ ভূমিকা বর্ণনা করেছেন যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে। 'কলেজে-পড়া বড়ভাই', 'বিপ্লবী যুবা'– এমন সব পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। অথচ নিজের ভূমিকা না বলেও তাঁর গত্যন্তর ছিল না। তিনি লিখেছেন, 'অস্ত্রশস্ত্র, সাইকেল ও বইপত্র গোপনে রাখার যে-ব্যবস্থা তা কেবল দলের ছাত্র ও যুবকদেরই করতে হত। দলের কঠোর নিয়মে অন্য মেয়ে দূরে থাক, নিকটতম আত্মীয়ের কাছেও সেসব কথা বলা বা জিনিসপত্র রাখা যেত না। 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে' বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ে গেলে প্রীতিলতার সম্পর্কে-বড়ভাই ঐ কলেজ ছাত্রটি নিজের দায়িত্বে কিছু গোপন বই প্রীতির কাছে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' কলেজ-ছাত্র এই বড় ভাইটি যে পূর্ণেন্দু দস্তিদার স্বয়ং সেটা পাঠককে বুঝে নিতে হবে। ঢাকার ইডেন কলেজে পড়বার সূত্রে দীপালী সংঘের সাথে প্রীতিলতার যোগাযোগ ঘটে এবং এক ছুটিতে দীপালী সংঘের আবেদনপত্র নিয়ে এই যুবকের সঙ্গে প্রীতিলতার আলোচনা হয়। সেই সুবাদে মাস্টারদার কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে অশেষ সতর্কতার সঙ্গে দলে নারী-সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত মাস্টারদা সূর্য সেন গ্রহণ করেন এবং স্থির হয় মাস্টারদা, প্রীতিলতা এবং যুবক ছাড়া দলের আর কেউ এ-সম্পর্কে কোনো কিছু জানবে না। পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিপ্লবী যুবার কথা লিখেছেন, যুবাটি যে তিনি নিজে তা কখনো উল্লেখ করেননি।

ইডেন কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আয়োজিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রীতিলতা প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। গরিব কেরানিকন্যার সাধ ছিল কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করবার, এবার সেই সাধ পূরণের সুযোগ ঘটলো এবং তিনি বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে সূর্য সেনের উদ্যোগে কংগ্রেসের ব্যানারে চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোগ নেয়া হলে প্রীতিলতার উদ্যোগে নারী সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রীতিলতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সম্ভবত পুলিশেরও, তবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগের কোনো হদিশ পুলিশ কখনো পায়নি। ১৯৩০ সালের এপ্রিলে সংঘটিত চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ পরাধীন ভারতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রীতিলতা তখন কলকাতায়। এরপর থেকে দলের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি বাড়তে থাকে। পূর্ণেন্দু দস্তিদারও তখন কলকাতায়, পড়ছেন যাদবপুরের ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, পড়বার চাইতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেই তাঁর আগ্রহ ও যোগ বেশি। বিভিন্ন গোপন তৎপরতার সঙ্গে প্রীতিলতার সম্পৃক্তির বিবরণ মেলে তাঁর গ্রন্থে, কলকাতা থেকে বোমা তৈরির মাল-সরঞ্জাম তাঁরা পাঠাতেন চট্টগ্রামে, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আত্মীয় সেজে কারাগারে তাঁর সঙ্গে প্রীতিলতার সাক্ষাৎকার, অনার্স পড়া বাদ দিয়ে সাধারণ বি.এ ডিগ্রি নিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসা ইত্যাদির সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের গ্রন্থে। ইতিমধ্যে তিনিও যে গ্রেপ্তার হয়ে যান সে-প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘প্রীতিলতার সঙ্গে যে তরুণ বিপ্লবী আত্মীয় ভাইটির মারফত সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার সংযোগ রক্ষা করা হত, সে-ও কিছুদিন পূর্বে জনৈক বিশ্বাসঘাতকের অর্থলোভের দরুণ ধৃত হয়েছিল।’ এখানে কিছু তথ্য মেলে ধরা যায় যা বিনয়-ভারাক্রান্ত পূর্ণেন্দু দস্তিদার কখনও উল্লেখ করেননি। পূর্ণেন্দু দস্তিদার কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় থাকতেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা লেখক নীরদ চৌধুরীর বাসায়। বাংলা একাডেমী থেকে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের জীবনী লেখার সূত্রে আমি কলকাতার নারীনেত্রী কমলা মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ-তথ্য জানিয়েছিলেন। পরে নীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী ‘দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক’-এ নামোল্লেখ ব্যতীত পাওয়া যায় সেই যুবকের কথা। সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি স্বভাবজাত কথা নিয়ে ইংরেজ-তোষক এই পণ্ডিত লিখেছিলেন, ‘সেই সময়েই আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর অভিপ্রায়ে পরিচালিত এমনি অভিযানের চাইতে বিশৃঙ্খল কাজ আর কিছু হতে পারে না, প্রথমত ও সর্বাগ্রে, এমনি পরিকল্পনা গোপন ছিল না। যা ঘটেছে ১৯ তারিখ সন্ধ্যাতেই, যখন বিশেষ খবর কলকাতায় এসে পৌঁছায়নি, আমি জেনে গেছি কারা এর সাথে যুক্ত, জেনেছি নেতা অনন্ত সিংয়ের নাম ও তার বেবি অস্টিন গাড়ির কথা। এসব আমি জেনেছিলাম অভিযানকারীদের একজনের ভাইয়ের কাছ থেকে, যে ছিল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমার ভাইয়ের সহপাঠী। ছাত্রটি হোস্টেলে থাকত, সেই রাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে উত্তর

কলকাতায় আমাদের বাসায় আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমার অ্যাডভোকেট বড় ভাই তখন ঢাকায় ছিলেন, তাই বাড়ির কর্তা হিসেবে আমি অনুমতি দিই। সেই আমাকে সবিস্তার খবর জানিয়েছিল এবং যেহেতু আমি কলকাতায় বসে সব জানতে পেরেছি, তাই চট্টগ্রামে পুলিশের পক্ষে এসব জানা কঠিন ছিল না।'

যুবা বিপ্লবী প্রসঙ্গে নীরদ চৌধুরী আরো লিখেছেন, 'আমার দ্বারা আশ্রয়প্রাপ্ত এই যুবকের আচরণ ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন। কলকাতায় অবস্থানরত অন্য বিপ্লবীদের কাছে গোপন সাংকেতিক চিঠি লিখে সে সবাইকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে তিনটি মেয়ে এসে হাজির এবং যুবকের সঙ্গে তারা দেখা করতে চায়। এদের একজন ছিল সেই মেয়েটি যে কলেজে আমার হবু স্ত্রীর কাছে চট্টগ্রামে শহীদ বিপ্লবীদের ছবি গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিল। মেয়েটি ছিল রুক্ষ ও উগ্রচটা ছোট্ট এক পুতুলের মতো। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম যুবকের ভাই যে মৃত্যুবরণ করেছে সেটা সে জানে কিনা, মেয়েটি শান্তভাবে জবাব দিল জানে। আমি তাকে বলেছিলাম সে যেন কথাটা যুবককে না জানায়, তবে মনে হয় সে তা মানে নি, কেননা এমন মৃত্যুতে কাতর হওয়ার পাত্রী সে ছিল না। আরেকটি মেয়ে ছিল কলকাতা হাইকোর্টের অগ্রণী উকিলের কন্যা, যিনি আবার জনপ্রিয় উপন্যাসিকও বটে। বদ্ধ কামরা থেকে যেসব চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসতো তাতে ভেবে অবাক হতাম এর কতটুকু বিপ্লবী আর কতটুকু ছিনালিপনা।' নীরদ চৌধুরী স্বভাবগত বিদ্বেষ ও নিন্দাভাব নিয়ে যে বিবরণী দিয়েছেন সেটা থেকে অনুমান করা যায় প্রীতিলতা ছিলেন ঐ বিপ্লবী নারীদের একজন।

নীরদ চৌধুরীর এইসব ভাষ্য গ্রন্থে প্রকাশিত বটে, তবে পূর্ণেন্দু দস্তিদার কিংবা প্রীতিলতার জীবনের আলোকে তা বিশেষ কেউ বিবেচনা করেছেন বলে মনে হয় না। এখানে আমরা এমনি আরেক স্বল্পজ্ঞাত তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা আমি পেয়েছি বেথুন কলেজের সাবেক অধ্যাপক সুলেখিকা শান্তা সেনের কল্যাণে। কলেজের সার্ধশততম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরা পুরনো কাগজপত্রের ভাণ্ডার ঘেঁটে বের করেছিলেন প্রীতিলতার স্বাক্ষর ও হাতের লেখার নিদর্শন, বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ চারটি বইয়ের প্রাপ্তি-স্বীকার করে তিনি নাম-স্বাক্ষর করেছিলেন 'প্রীতি ওয়াদ্দার'। নিজ নাম থেকে লতা বাদ দেয়ার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, লতার নির্ভরশীলতা যে মোটেই তাঁর কাম্য ছিল না সেটা এখানে প্রকাশ পায়। সশস্ত্র আক্রমণাভিযানে নারী-নেতৃত্বের যে অনন্য পরিচয় রেখেছেন প্রীতিলতা সেটা গ্রহণ করা রক্ষণশীল সমাজ ও রাজনৈতিক মহলের জন্য সমস্যা বিবেচিত হয়েছিল। এক নারীর নেতৃত্বে পিস্তল ও বোমা সজ্জিত দল ইংরেজদের আস্তানায় আঘাত হানল এবং দলের সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আহত দলনেতা অকাতরে জীবন বিসর্জন দিল, এই ঘটনা সমাজে সৃষ্টি করেছিল ভিন্নতর আলোড়ন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন যে, কলকাতার ইংরেজদের সাপ্তাহিক 'ইংলিশম্যান' আক্রমণের সংবাদ প্রকাশকালে প্রীতিলতার শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করে তাঁর নামের আগে 'অসম সাহসিকা', 'বীর নারী' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করেছিল। কলকাতার ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তীব্র প্রতিবাদ করায় পত্রিকা পরে দুঃখপ্রকাশ করে বিশেষণসমূহ প্রত্যাহারের কথা জানায়। কলকাতার ইংরেজ সমাজের এমনি প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, তবে 'ইংলিশম্যান'-এর 'ভুল' থেকে বোঝা যায় আকস্মিক অভিযানের দ্বারা সমাজে কোন্ অভিঘাত তৈরি করতে পেরেছিলেন প্রীতিলতা। এক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের একাংশের প্রতিক্রিয়ায় রাজনীতির পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। প্রীতিলতার অভিযানে নারীর যে নতুন তথা সাহসী, তেজোদ্দীপ্ত, যোদ্ধৃ ভূমিকা লক্ষিত হয় তাতে হতচকিত বাঙালি পুরুষসমাজ প্রীতিলতার ভূমিকা গৌণ অথবা কালিমালিপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের লেখা থেকে মনে হয় একসময় এমনি নানা ধরনের গল্প-কেচ্ছা বেশ চালু ছিল। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রীতিলতার মৃত্যু সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এর জন্য প্রধানত দায়ী সূর্য সেন পরিচালিত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে বহুদিনের বিরোধীভাবাপন্ন একজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী ও পরে ভারতের কংগ্রেস দলে যোগদানকারী এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের বেতনভোগী একজন কর্মচারীর লিখিত, চট্টগ্রামের বিপ্লবী অভিযানের ১৯৩০-এর এপ্রিল থেকে এই বিপ্লবীদলের সর্বশেষ কাজ, ১৯৩৫-এর ইংরেজ ক্রিকেট ক্লাব (বর্তমনে যেখানে চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম) আক্রমণ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ। বইখানা উদ্দেশ্যমূলকভাবে লিখিত হয়েছিল, যদিও চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সেই গৌরবময় সংগ্রামের সঙ্গে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতাদের যোগাযোগ ছিল এবং গৌরব ও মর্যাদার তাঁরাও অংশীদার। সরকারি উদ্যোগে ঐ বইখানা অবলম্বন করে কলিকাতায় একটি সবাক ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছিল। কলিকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে তা যখন প্রদর্শিত হয়, দর্শকদের প্রবল ভিড়ের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়েছিল; কিন্তু ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য ঐ বইটিতে থাকায় চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী তার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিয়ে দাবি করেছিলেন, ভুল তথ্যেভরা ঐ ছায়াছবির প্রদর্শন বন্ধ না করলে, মহান সেইসব দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগীদের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে, তাঁদের মৃত্যুহীন প্রাণদানের প্রতি ঘোরতর অমর্যাদা প্রকাশ হবে। আদালত ঐ ছায়াছবি প্রদর্শন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বইতে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে প্রীতিলতা সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য ও তাঁর মহান মৃত্যু সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রহস্যের ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। তার ফলেই প্রীতিলতার মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে কিছু ভুল ধারণা আছে।' ভুল ধারণাগুলো কী তা অবশ্য ব্যক্ত করেননি পূর্ণেন্দু দস্তিদার, তবে নীরদ চৌধুরী তাঁর আত্মস্মৃতিতে প্রীতিলতার প্রসঙ্গ যেভাবে লিখেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিষ্ঠাবান গবেষক ও পড়ুয়া হিসেবে সর্বদা নিজেকে জাহির করেছেন। প্রীতিলতা প্রসঙ্গে পাহাড়তলি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের কোনো উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে নেই, বরং তিনি ফেঁদেছেন আরেক কাহিনী। নীরদ চৌধুরী লিখেছেন, 'পরের একটি ঘটনা অস্ত্রাগার অভিযানের

দুর্দশাকেও ছাপিয়ে যায়, অন্তত ব্যর্থতার বিচারে। পুলিশের তাড়া খেয়ে এক তরুণী চট্টগ্রামের অদূরে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয় আরেক তরুণসহ। তারা সেখানে আকস্মিকভাবে পুলিশ দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে বাঙালি বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করে, এমনকি হাতে রিভলবার নিয়েও, তবে এই তরুণী লড়াই করে বের হতে চেষ্টা করেছিল এবং তাঁর সঙ্গীসহ গুলিতে মৃত্যুবরণ করে।' প্রীতিলতার বীরত্ব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নীরদ চৌধুরী যেমন এক কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করেছেন তেমনি তরুণীর সঙ্গে তরুণের সম্পৃক্তির ইঙ্গিত দিয়ে আরেক কৌশলী অবস্থান নিয়েছেন। এ হতে পারে পুরুষতান্ত্রিকতার আরেক উদাহরণ। প্রীতিলতা কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তা চট্টগ্রামের এসপি এবং ডিএমের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। এখানে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা চার্লস টেগার্টের একটি ভাষণের উল্লেখ করা যায়। কুমিল্লার দুই নারী কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স হত্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে বীণা দাশ কর্তৃক গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে চার্লস স্টেগার্ট বলেছিলেন, 'এরপর এক নারীসন্ত্রাসী একটি ডাকাতির ঘটনায় অংশ নেয় এবং অতি সম্প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের রেলওয়ে ইন্সটিটিউশনে এক নারীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসী আক্রমণ পরিচালিত হয়। চিরুনি অভিযান চলবার সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঐ স্থানের তিন দিক থেকে বোমা, রিভলভার ও বন্দুক নিয়ে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালায়। এক ইংরেজ নারী মৃত্যুবরণ করে এবং চার নারীসহ আরো এগারোজন অতিথি আহত হয়। পরে ভবনের বাইরে নারীসন্ত্রাসীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তিনি নিজের হাতে বিষপান করেছিলেন।'

চার্লস টেগার্টের বক্তব্য থেকে কোনো সন্দেহ থাকে না কীভাবে প্রীতিলতার মৃত্যু ঘটেছিল। তবুও যে নীরদ চৌধুরী ও তাঁর মতো পণ্ডিতজনেরা প্রীতিলতা সম্পর্কে কুৎসা রটনায় যোগ দিলেন সেটা বিশ্লেষণ দাবি করে বটে। এবার আমরা যেতে পারি রেজিনা বেগম সংগৃহীত পুলিশি কাগজপত্রে। প্রীতিলতা প্রসঙ্গে অপর যে নামটি অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে কল্পনা দত্ত। প্রীতির চাইতে দুই বছরের ছোট কল্পনা দত্তের সঙ্গে প্রীতির জীবনাদর্শে যত মিল জীবনাচারে ততো অমিল। প্রীতিলতা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে, পড়াশোনায় তুখোড়, স্বভাবে লাজুক প্রকৃতির; কল্পনা প্রাণোচ্ছল, প্রগলভ তরুণী, খাপখোলা তলোয়ারের মতো চেহারা, পড়াশোনায় তেমন মনোযোগী নন, স্বভাবে টমবয় প্রকৃতির। প্রীতির কলকাতায় পড়া সম্ভব হয়েছিল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়ার জন্য। একই সময়ে রায় বাহাদুরের নাতনি কল্পনা দত্তও বেথুন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন আইএসসি পড়বেন বলে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংঘটিত হলে কলকাতায় আর মন বসাতে পারেন না কল্পনা দত্ত। সেন্টার পরিবর্তন করে তিনি চট্টগ্রামে এসে আইএসসি পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রীতি ও কল্পনার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া প্রায় একই সময়ে ঘটে, সেই সাথে

লক্ষণীয় উভয়েরই দীক্ষাগুরু ছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। পরে ১৯৩৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলে পুলিশের এক সাক্ষাৎকারে কল্পনা জানিয়েছিলেন যে, বস্তুত তাঁকে রিক্রুট করেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। খাস্তগীর স্কুলে এক ক্লাস ওপরে-নিচে পড়তেন প্রীতি ও কল্পনা। উভয়ে একসঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতেন; কিন্তু পুলিশের কাছে কল্পনা দত্ত এইসব পরিচয়ের কথা সবসময়ে অস্বীকার করেছেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে পুরুষের বেশে সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথম যখন গ্রেফতার হন কল্পনা দত্ত, তিনি বানিয়ে অনেক কথা বলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিলেন। ডিআইবি ইন্সপেক্টর যোগেশচন্দ্র গুপ্ত জেরার রিপোর্টে কল্পনা দত্তের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সেখানে কল্পনা দত্ত বলেছেন, 'মিস নলিনী পালকে আমি চিনি যিনি চিটাগাং গার্লস স্কুলে আমার সিনিয়র ছিলেন। ১৯২৯ সালে বেথুন কলেজে আসা এই দু'জনকে আমি চিনি : ১. চট্টগ্রামের তৎকালীন এসডিও স্বর্গত ডিএন দের কন্যা রীতা দে, বেথুনে আমার সহপাঠী, ২. নন্দনকাননের উকিল বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহের কন্যা পান্না গুহ, সে এখন বিবাহিত। জগবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা প্রীতি ওয়াদ্দাদার নামে একজনকে আমি চিনি। সে স্কুলে আমার সিনিয়র ছিল, তবে তার সাথে কোনো অন্তরঙ্গতা ছিল না।' পুলিশের নজরদারি এড়ানো এবং গোপন সংবাদ প্রকাশ না করবার তাগিদ থেকে এমনি অনেক কথা বলেছিলেন কল্পনা দত্ত, তবে প্রীতিলতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল পুলিশেরই হাতে। ১৯৩১ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে প্রীতিলতা চিঠি লিখেছিলেন চট্টগ্রামে কল্পনার কাছে। পুলিশ এই চিঠি কপি করে নথিযুক্ত করেছিল। পুলিশের খাতায় চিঠির বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষ্যই রয়েছে। উল্লেখ্য কল্পনা দত্তের ডাকনাম ভুলু এবং প্রীতি লিখেছিলেন :

> ভুলু,
>
> তোমার কার্ডখানা পেয়েছি কয়েকদিন হল। তোমার সঙ্গে দেখা করে আসার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। অনেকদিন হল খুকীদের সঙ্গে তোমার কাছে চিঠি লিখিয়াছিলাম একখানা। তুমি সেই চিঠি পেয়েছ কিনা জানিও। আমি Centre change অবশ্যই করবো কিন্তু বড়দিনের ছুটিতে যেতে পারলে বেশ আমোদ করতে পারতাম। অথচ Principal যেতে দেবে না। January-তে ফি দিয়ে যেতে হবে, টেস্টের Result-ও January-তে Out হবে। বড়দিনে যেতে না পারলে আমোদটা থেকে বঞ্চিত হব না? সবাই মিলে হৈচৈ করবে বলেছ, বোনরা লিখেছে। খুকীরা তোমাকে চিঠি দিল কিনা আমার চিঠি পাওয়া মাত্র জানাবে। দেরি করো না, ভালো থেকো।
>
> ইতি
> প্রীতি

নিচে পুলিশের নোট রয়েছে, 'পত্রপ্রেরক জগবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা, তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড ক্লার্ক। লেখক জানা যায় বেথুন কলেজের ছাত্রী। প্রেরক

ও পত্রপ্রাপক উভয়ে উকিল বাবু অম্বিকাচরণ পালের কন্যা মিস সরোজিনী পাল ও মিস নলিনী পালের সহযোগী, আইবি থেকে প্রাপ্ত গোপন খবরে জানা যায় পাল ভগিনীরা চট্টগ্রামের যুগান্তর দলের সদস্য।' প্রীতিলতার চিঠির ভাবোদ্ধার এখন দুরূহ, আরো কিছু তথ্য মিলিয়ে পড়তে পারলে এর মাহাত্ম্য বোঝা যেত। তবে এটা বেশ বোঝা যায়, সবাই মিলে আমোদ করা বলতে প্রীতিলতা বুঝিয়েছেন অন্য কিছু। তেমনিভাবে যে পিকনিকের জন্য তিনি উতলা হয়েছেন তা নিশ্চয় মামুলি কোনো পিকনিক ছিল না। আর কল্পনার মতো প্রীতিও যে সাধের বেথুন কলেজে পড়ার পাঠ চুকিয়ে বিপ্লবের পীঠস্থান চট্টগ্রামে ফিরে আসতে উদগ্রীব ছিলেন সেটা পরীক্ষার সেন্টার বদলের চেষ্টার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রীতি সেন্টার বদল করতে পারেননি, তবে অনার্স না পড়ে সাধারণ গ্রাজুয়েশন করেই ফিরে এসেছিলেন চট্টগ্রামে, প্রকাশ্যে কাজ নিয়েছিলেন নন্দনকানন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। সবশেষে বলতে হয় প্রীতিলতা সম্পর্কে পুলিশের অভ্যন্তরীণ এক নোটিশের কথা। প্রীতিলতার দুটি ছবিসহ এই নোটিশ প্রচারিত হয়েছে, এর একটি-তো প্রীতিলতার সর্বজনপরিচিত ছবি, পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বইয়েও এই ছবির দেখা মিলবে। পূর্ণেন্দু দস্তিদার জানিয়েছিলেন প্রীতিলতা সম্পর্কে বই রচনার জন্য তিনি যখন তথ্য সংগ্রহ করছিলেন তখন কোথাও প্রীতিলতার কোনো ছবি পাচ্ছিলেন না, 'তাঁর মা বাবা অথবা চট্টগ্রামের অন্য কারো কাছে তাঁর কোনো ফটো ছিল না। বহু কষ্টে খবর পাওয়া যায় যে, ১৯২৯-শে ঢাকায় ইডেন কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় যখন খুব ভালো ফল করে, তখন ঐ কলেজ থেকে বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রীতিলতা কলেজের সব অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের সঙ্গে সমবেত ফটোর মধ্যে উপস্থিত ছিল। প্রীতিলতার এক সহপাঠিনীর কাছে কলিকাতায় ঐ ফটো পাওয়া যায়। স্বভাবত লাজুক প্রকৃতির প্রীতিলতা অসংখ্য মেয়ের সারিতে একেবারে পিছন দিকে ঐ ফটোতে ছিল, তার খুব ছোট মুখখানা ঐ ফটো থেকে নিয়ে আমি আমার অক্ষম হাতে একটি বড় করে আঁকি এবং তাঁর বাবা-মাকে দিই। এই বই ও অন্যান্য যেসব বইতে প্রীতিলতার আবক্ষ ছবি দেখা যায়, তা ঐ একমাত্র ছবির অনুলিপি।' পূর্ণেন্দু দস্তিদারের আঁকা ছবি এবং পুলিশের লিফলেটে মুদ্রিত ছবি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় উভয়ে একই উৎস থেকে ফটো সংগ্রহ করেছিল। ইডেনের সেই গ্রুপ ছবি থেকে পুলিশ আলাদাভাবে প্রীতিলতার ছবি বড় করে নিয়েছিল। পূর্ণেন্দু দস্তিদারও এমনি এক ছবি থেকে প্রীতির প্রতিকৃতি আঁকবার প্রয়াস নিয়েছিলেন, ছবি বড় করবার সুযোগ তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। এখন প্রকৃত ছবি পাওয়ার পর এটা বোঝা যায় পূর্ণেন্দু দস্তিদার মোটামুটি প্রীতির প্রতিকৃতির আভাস তৈরি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে প্রীতিলতা ছিলেন আরো কিছুটা ভিন্নতর। সর্বাগ্রে বলতে হয় প্রীতির সেই গভীর অনন্তপ্রসারী দৃষ্টির কথা, ডাগর চোখের এই তরুণী যেন দৃঢ়ভাবে বর্তমানে স্থিত, আবার কোন্ সুদূরের পিয়াসা যেন প্রকাশ করে তাঁর চোখ। পুলিশের দ্বিতীয় ছবিতে যে প্রীতিলতাকে আমরা দেখি তা আগে আর

কখনো দেখা যায়নি। স্পষ্টতই কোনো স্টুডিওতে তোলা ছবি, পুলিশ যে নজরদারির জাল ভালোভাবে বিস্তার করেছিল সেটা এই ছবি সংগ্রহে তাদের সাফল্য থেকে বুঝতে পারা যায়। ষোড়শী সুন্দরী বাঙালি তরুণীর মতো প্রীতিলতা বসে আছেন, আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মায়াভরা কন্যার মতো। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য পুলিশ প্রদত্ত প্রীতিলতার বিবরণীতে তাঁর চেহারা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, 'আগলি লুকিং', উপনিবেশিক ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এর চেয়ে ন্যাক্কারজনক উদাহরণ বোধ করি আর হতে পারে না। তবে নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা যায়, কলকাতার পুলিশ মিউজিয়মে প্রদর্শনরত প্রীতিলতার এই দুই ছবিই আগামীতে তাঁর ছবি হয়ে মানুষের অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকবে, তাঁর মুখশ্রী প্রকাশ পাবে পূর্ণ মহিমায়, নারী-সৌন্দর্যের নতুন ব্যাখ্যাও সেখানে মিলবে।

প্রীতিলতার আক্রমণ অভিযান পরিচালনা এবং তৎপরবর্তী শেষ মুহূর্তগুলো সম্পর্কে সবিস্তার জানতে না পারা গেলেও মাস্টারদা সূর্য সেনের বয়ানে তার এক অনন্য পরিচয় মেলে। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ প্রীতিলতার আত্মাহুতিদানের পরই অক্টোবরে বেজে উঠেছিল পুজোর বাদ্যি। প্রীতির ট্রাজিক জীবনাবসানের পর দলনেতার বিক্ষিপ্ত মানসের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি। তিনি নিজেও এর পরিচয় রেখে গিয়েছিলেন 'বিজয়া' শিরোনামের এই সংক্ষিপ্ত রচনায়। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে মাস্টারদা গ্রেফতারের সময় বাজেয়াপ্ত কাগজপত্রের মধ্যে হাতে লেখা 'বিজয়া' নিবন্ধও পুলিশের হস্তগত হয় এবং মামলায় তা মূল্যবান দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। নিবন্ধের বক্তব্যের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ছিল মাস্টারদার হাতের লেখার নমুনা হিসেবে পুলিশের কাছে এর গ্রহণযাগ্যতা। নিবন্ধটি যে মাস্টারদার লেখা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পুলিশ মাস্টারদার লেখা অন্য যেসব চিরকুট ও চিঠি বিভিন্ন সময় উদ্ধার করেছিল তা নিবন্ধ-রচয়িতার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে প্রমাণাদি তৈরি করা হয়। 'বিজয়া' নিবন্ধের শুরু থেকেই শোনা যায় স্বজন-হারানোর বিলাপ। মাস্টারদা লিখেছিলেন, 'আজ মনে পড়েছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ এমন পবিত্র দিনে তাঁদের কথা মনে করে আমার মতো কঠিন হৃদয়ের [মানুষের] চোখেও জল আসছে– তাঁদের বীরত্বের কথা মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে।'

এমন বক্তব্যের পাশাপাশি মাস্টারদার অন্তরের সংশয়ও এখানে ফুটে উঠেছে, তিনি লিখেছেন, 'কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার দেবীমূলে আহুতি দিয়েছি– কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি– দেশের ওপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এসবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দিই কী করে?' বেদনা

এবং সংশয় তাঁকে এমন গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে রচনায় মেলে একধরনের শৈথিল্য। তিনি মৃত্যুর মিছিলের কথা বলেছেন এবং এর পরপর নিজের ভূমিকা নিয়ে দ্বন্দ্বপীড়িত সংশয়াকুল প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি তিনি কোথাও ভুল করেছেন? এমনি উপস্থাপনা নিবন্ধে রয়েছে দু-বার, ভাষার কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও বক্তব্যে তা এক। মনে হবে যেন তিনি বক্তব্যের দুটি মুসাবিদা করেছিলেন এবং দুই পাঠ এখানে একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এক পর্যায়ে আপন অন্তরের হাহাকার ব্যক্ত করেই বুঝি তিনি লিখেছেন, 'আবার তোমায় জিজ্ঞেস করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাবার বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এসবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করেছি?'

এরপর নিবন্ধের দ্বিতীয়াংশে মাস্টারদা বলেছেন প্রীতিলতার কথা, 'যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গণে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 'তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না।' তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল।

কি করুণ সেই হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল।'

এরপর মাস্টারদা তাঁর স্নেহের ধন এই অনুগামীর নিষ্ঠা, আদর্শচেতনা ও ত্যাগী মনোভাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে লিখেছেন, 'অসুরদলিনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমার এই বর দাও– যেন তাঁর স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়। তাঁর গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তাঁর অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরো শক্তিমান করে তোলে, তাঁর শ্রদ্ধা যেন আমাকে তাঁর শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে– তাঁকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।'

মাস্টারদার এমন হৃদয়-নিংড়ানো প্রতিক্রিয়ায় যা প্রকাশ পায়নি সেটাও বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি কোথাও প্রীতিলতাকে নারী হিসেবে বিবেচনা করেননি, প্রীতির অমন অকুণ্ঠ প্রশংসা সত্ত্বেও কোথাও তাঁর নারীসত্তার পৃথক উল্লেখ বা গুণকীর্তন নেই। সূর্য সেনের নেতৃগুণের এ-আরেক পরিচয়, গুপ্তদলের অমন পুরুষশাসিত পরিমণ্ডলেও তিনি যে প্রীতিলতাকে নারীসত্তা হিসেবে না-দেখে মানবসত্তা হিসেবে দেখেছেন, নারীযোদ্ধা হিসেবে গণ্য না-করে সহযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করেছেন, সেটা এই দলিলে সুস্পষ্ট। তিরিশের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন তুলনা আর বিশেষ মিলবে না। মনে হবে মাস্টারদা ও প্রীতিলতা মুক্তির এক উচ্চতর আসনে সম্মিলিত সাধনা পরিচালনা করেছিলেন। তবে প্রীতিলতাকে লড়তে হয়েছিল বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং মানব হিসেবে নারীসত্তার স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই তো প্রতিনিয়ত তাঁকে করে

যেতে হয়েছে, মাস্টারদার অমন মহান আনুকূল্য সত্ত্বেও। তিনি রেখে গিয়েছিলেন দুটি বিদায়বাণী– একটি অনানুষ্ঠানিক, আরেকটি প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক। অনানুষ্ঠানিক বার্তাটি ছিল হিজলি আটকখানায় বন্দি অগ্রজ পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে লেখা চিঠি, যে-চিঠি সেন্সরের কালিলিপ্ত হয়ে পাঠযোগ্য ছিল না, পড়া গিয়েছিল প্রীতি-রচিত কবিতার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি মাত্র, তিনি লিখেছিলেন, 'আঁধার পথে দিলাম পাড়ি/ মরণ-স্বপন দেখে।' প্রীতিলতার আনুষ্ঠানিক বিদায়-বাণী স্বহস্ত-লিখিত ঘোষণা, মৃত্যু-অভিযানে ঝাঁপ দেয়া বিপ্লবীর ক্ষেত্রে এমন বার্তা রেখে যাওয়া ছিল পালনীয় কর্তব্যের একটি। এখানে তিনি যেমন দেশমাতার মুক্তির জন্য জীবনদানের আদর্শের কথা বলেছেন তেমনি আপন উপলব্ধিও মেলে ধরেছেন।

এই বিদায়-বাণী বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অসাধারণ দলিল। এর প্রতিটি ছত্র দাবি করে আলাদা বিশ্লেষণ। এখানে একইসঙ্গে মিলবে দেশের মুক্তির জন্য জীবন-উৎসর্গ করবার দৃঢ় শপথ, সেই সাথে পাওয়া যায় নারী হিসেবে বঞ্চিতজনের সকল অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা করবার অসাধারণ প্রত্যয়। তিনি বলেছেন, 'দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা উহা পারিব না?' তিনি আরো বলেছিলেন যে, সময় এসেছে যখন এইসব ভুল ধারণা দূর করতে হবে। নারী যদি কম যোগ্য হয় তবে তার কারণ তাদের তেমনটা করে রাখা হয়েছে। সবশেষে তিনি বলেছেন, 'নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে, আমার দেশের ভগিনীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করিবে না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন– এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।' সর্বশেষ এই বাক্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষিত হলেও নারী হয়েছে তাঁর উদ্দিষ্ট। মুক্তি আন্দোলনে নারীদের যোগদানের আহ্বান জানাবার পাশাপাশি বিদ্রোহের আহ্বানও তিনি জানিয়েছিলেন, যে-বিদ্রোহ পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার সর্বপ্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে এবং সর্বকর্মে নারীর সমানাধিকারের দাবিতে। এই বিদ্রোহ তো তিনি ঘোষণা করেছিলেন স্বীয় বিপ্লবী দলের ভেতরে এবং সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে প্রদর্শন করেছিলেন নারীনেতৃত্বের যোগ্যতা ও মহিমা। এভাবে জীবন উৎসর্গ করে মানুষের মুক্তিপথের দিশা যুগিয়েছিলেন আমাদের এই বিদ্যুৎলতা, প্রীতিলতা, দেখা না-দেখায় মেশা।

জন্মশতবর্ষে তাঁকে জানাই সালাম।

রামমোহন এবং ইসলাম

সৈ য় দ মু স্তা ফা সি রা জ

ভারতে ইংরেজশাসনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, 'আরব তাতার তুর্কি মোগল প্রমুখ বর্বর বিজেতারা একের পর এক হিন্দুস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়মে বিজিতদের উন্নততর সভ্যতার কাছে বিজিত হয়ে শীঘ্রই তাদের হিন্দুত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল।'

কার্ল মার্কসের এই উক্তি আমার কাছে অতিমাত্রায় অসতর্ক মনে হয়েছ। হিন্দুস্থানের যে উন্নততর সভ্যতা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সে-ব্যাপারেও তাঁর ধারণা খুব অস্পষ্ট এবং তার প্রমাণ তাঁর আরও কিছু অসতর্ক মন্তব্যে ধরা পড়েছে। তবে সেগুলো এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মার্কস লক্ষ করেননি যে, ভারতে মুসলিম বিজেতাদের সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক প্রবণতার মধ্যে বর্বরতা থাকলেও ইউরোপের মধ্যযুগের বর্বরদের সঙ্গে তাঁদের একাসনে বসানো চলে না। কারণ তাঁরা ভারতের সঙ্গে অপর একটি উন্নত সভ্যতারও সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁরা ভারতীয় সভ্যতাকে উন্নততর মনে করতেন, এমন ধারণা করাও কঠিন– যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ এদেশি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এমন কি সামাজিক আত্মীয় সম্পর্কও স্থাপন করেছেন এবং দারা শিকোহ্ তো একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তবু সামগ্রিকভাবে লক্ষ করলে দেখব, মুসলিম বিজেতারা হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি বা সভ্যতা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের হিন্দুত্বপ্রাপ্তির প্রশ্ন তো একেবারে উদ্ভট। বরং সামগ্রিকভাবে হিন্দুত্বের বিরোধিতাই তাঁরা করে গেছেন।

ইসলামের সামাজিক ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের কোনও ধারণা ছিল, এমন তথ্য মেলে না। বরং ভারতে ইসলাম এবং মুসলিম শাসনের চরিত্রবিচারে হাঙ্গেরীয় ইসলাম-তাত্ত্বিক জ্যুলা গার্মানুসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

গার্মানুস একদা এই শান্তিনিকেতনে ইসলামি বিদ্যার পঠন-পাঠনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মতে, মধ্য-এশিয়ার তুর্কি ভারতবিজেতারা যে সংস্কৃতি বয়ে এনেছিলেন, তা পারসিক এবং তার মধ্যে ছিল বাইজেন্টাইনি উত্তরাধিকার। কিন্তু সেই বিজেতারা

নিজেদের জাতিচরিত্রগুণে ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে সেই সংস্কৃতির পরিমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন এবং কালক্রমে তার উজ্জ্বল রূপান্তর ঘটতে দেখা গেছে। আরবদের সিন্ধুদেশ জয় ভারতে আদৌ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, এবং তারা নিজেরাও প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু উত্তর-ভারতে তুর্কিদের সঙ্গে যে ইসলাম এসেছিল, তা একটি 'পরিবর্তিত' ধর্ম, যদিও ইসলামের মৌলিক কাঠামো ছিল অবিকৃত।

গার্মানুস আরও বলেছেন, 'হিন্দুরা আগেও ইহুদি, খ্রিস্টান বা পার্শিদের গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মুসলিম বিজেতা এবং তাঁদের সমর্থকরা ভারতে অভূতপূর্ব নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন।'

গার্মানুস সেই সমস্যাগুলো নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করেননি। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় সাত শো বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় আমরা জানি, সেগুলো কী। হাত-ফেরতা হয়ে ভারতে আগত 'পরিবর্তিত' ইসলাম ওই সপ্ত শতকে আরও পরিবর্তিত হয়েছিল। মার্কসীয় মতে হিন্দুত্বপ্রাপ্তি না ঘটলেও ভারতীয় মুসলিম জীবনের সাধারণ স্তরে ইসলামের চেহারায় কোনও-কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের ঈষৎ আদল আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু সমস্যাগুলো অবিকৃত রয়ে গেছে। সেই সমস্যাগুলোই পরিণামে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে এবং ভারতকে বিভাজিত করেছে।

মুসলিম বিজেতাদের প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হত, তাহলে আমাদের পরম সুখশান্তিতে কালাতিপাত করা সম্ভব হত। দুঃখের বিষয়, পরিবর্তিত এবং হাতফেরতা হয়ে আসা ইসলামের মধ্যে এমন সব উপাদান রয়ে গিয়েছিল, যা রামমোহনের মতো প্রবল একেশ্বরবাদীকেও 'তুহফাতুল মুয়াহেদ্দিন' লিখে অভিযোগ প্রকাশে বাধ্য করেছিল। বিধর্মী এবং পৌত্তলিকদের সম্পর্কে কুরআনে নির্দেশিত ইসলামি দায়িত্ব, যেটি রামমোহন উদ্ধৃত করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে, প্রাজ্ঞ উলেমারা যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, সাধারণভাবে মুসলিম মানসকে তা আক্ষরিক অর্থেই প্রভাবিত করেছে যুগে যুগে এবং ভারতের ক্ষেত্রে মুসলিম মানসের ওই প্রবণতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে হিন্দুমানসে। রামমোহনের অনুযোগের কারণ সেটাই। যদিও তিনি পৌত্তলিকতা তথা সাকার উপাসনার তীব্র বিরোধী, একেশ্বরবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি অমানবিক মনে করেছেন। রামমোহনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক, তার প্রকৃতি ও পরিণতির বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করতে হলে ভারতে ইসলামের ভূমিকা ও মুসলিম শাসনের চরিত্রসংক্রান্ত এই পটভূমি থেকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

দুই.

পলাশীর যুদ্ধে ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের নিশ্চিহ্ন অবসান সূচিত হয়েছিল। তার ষোল বা আঠারো বছর পরে রামমোহনের জন্ম। গৌরবহানির অপমান ও ক্ষোভে মুসলিম অভিজাত শ্রেণি, উলামাসমাজ এবং তাঁদের সমর্থকরা তখন জর্জরিত। ইংরেজ তখনও

ঘর গুছিয়ে বসতে পারেনি বলে জীর্ণ মুসলিম শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কোনোরকমে মেরামত করে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। সরকারি ভাষা তখনও ফার্সি। হিন্দু অভিজাত এবং উচ্চবর্ণীয়েরা মুসলিম শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন এবং তখনও সে-সম্পর্ক তত বেশি ছিন্ন হয়নি। রামমোহনের ঠাকুর্দা ব্রজবিনোদ রায় নবাব আলিবর্দির অধীনে কাজ করতেন। মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম পূর্ব-ভারতে এলে ব্রজবিনোদ তাঁকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। এসবের ফলে রামমোহন-পরিবারের মুসলিম সংসর্গ ঘনিষ্ঠই ছিল। দ্বিতীয় আকবর শাহের দৌত্যকর্মে রামমোহনকে নিয়োগের কারণও তাই। তাছাড়া সময়ের রীতি এবং বৈষয়িক প্রয়োজনে রামমোহনকে স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফার্সি শিখতে হয়েছিল বাল্যকালেই। এজন্য তাঁকে পাটনা পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি আরবি শিখেই সেই ভাষায় ইউক্লিড এবং অ্যারিস্টোটল পড়ে ফেলেন। কুরআন পড়েন। ইসলামি মূল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। ইসলামি মূলতত্ত্বের রিজনিং, একেশ্বরবাদ, নিখিল মানব-ভ্রাতৃত্ব, মানব-সাম্য এবং দর্শন প্রকরণের গভীর প্রভাব পড়ে তাঁর মনে। তিনি একেশ্বরবাদে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নয়, মুতাজিলা এবং সুফি দর্শনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। তার ফলে ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্থাৎ ইসলামি চার্চের বাইরে অবস্থিত ইসলাম-জাত ঈশ্বরতত্ত্ব এবং দর্শনের বিদ্রোহী ধারাটিকেও আত্মসাৎ করা সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে।

কিন্তু এক দুর্ধর্ষ প্রতিভাধর তরুণ, যাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই সত্যান্বেষণের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল এবং পরে দেখব, গৃহত্যাগী হয়ে তিনি অজানা জনপদে, পার্বত্য অঞ্চলে, এমনকি দুর্গম পর্বত অতিক্রম করে সত্যান্বেষী সন্তরূপে ঘুরছেন, তাঁর মধ্যে নিশ্চয় কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। কেন সত্যের অন্বেষণে তিনি বহির্মুখী, যখন তাঁর পরিপার্শ্বে, তাঁর সমাজ-জীবনে, হিন্দু-সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে অজস্র সত্যের কথা উচ্চারিত ছিল? অর্থাৎ কেন তিনি মনে করেছিলেন তাঁর স্বাভাবিক পরিপার্শ্বে হিন্দুধর্মে তথা দর্শনের প্রচলিত ধারাবাহিকতায় সত্য নেই, কিংবা তার বিকৃতি ঘটেছে এবং তাই তাঁকে আরবি-ফার্সি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি থেকে সত্য খুঁজে নিতে হল? কেন তিনি প্রচলিত জীবন-ধর্ম-সমাজসংস্কৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করলেন? নিশ্চয় এর কোনো গভীরতর কারণ ছিল। তাঁর বাল্য বা কৈশোর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানা নেই। শুধু টের পাই, প্রচলিত হিন্দু জীবন-ধর্ম-সমাজসংস্কৃতির প্রতি তাঁর মনোভাব যেন অপ্রসন্ন। আমার ধারণা, তাঁর জীবনে কোনো এক তীব্র ঘটনা ঘটেছিল, কোনো সাংঘাতিক ঘটনার নিদারুণ প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মানসজগতে, তাঁর কোমল মনকে আঘাত করেছিল কোনো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এবং তার পরিণামে বিশাল অচলায়তন থেকে ছিটকে দূরে সরে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল, যে ভিত্তিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, জীবনধারণ করছেন এবং অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্ন ও সংকল্পে মগ্ন হয়েছেন, সেই ভিত্তিটি অসৎ দ্বারা আক্রান্ত। অতএব

সৎ এবং সত্য আছে অন্য কোনোখানে। এরপর তিনি যখনই ইসলামের মূল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাঁর হয়তো মনে হল, তিনি সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবার।

কিন্তু সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা কি সতীদাহসংক্রান্ত? আমার সেটাই মনে হয়। রামমোহনের ঐশীভাবনাসংক্রান্ত দার্শনিক ভূমিকার মধ্যে তথাকথিত সংস্কৃতিসমন্বয়ের আদল দেখা গেলেও তার অন্তর্নিহিত গূঢ় নিয়ামক আসলে সত্যানুসন্ধান। সত্যকে অন্বেষণ না করলে তো সত্যকে পাওয়া যায় না। রামমোহন ইসলামিশাস্ত্র পড়লেন এবং তাই তাতে অনুরক্ত হলেন, এটাকে আপেল ফলের পড়া দেখে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কারের গল্পের মতো গল্প বলেই মনে হয় নিছর কাকতালীয়। নিউটনের অন্বেষণটাই আসল ঘটনা, আপেলপতন আকস্মিক যোগাযোগমাত্র। বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত অন্বেষণটাই মূল তথ্য, আরবিতে ইসলামিতত্ত্ব পাঠ একই আকস্মিক যোগাযোগ। নিতান্ত রাজকর্মের প্রত্যাশায় তাঁর আরবি-ফার্সি পড়তে যাওয়া। অন্য কারণে নয়।...

তিন.

একেবারে আদিম দশার ট্রাইবগুলোকে বাদ দিলে সভ্যতার ইতিহাসে সব সংস্কৃতি যেমন মিশ্র, তার অঙ্গহিসেবে ধর্মও মিশ্র। ধর্মের মধ্যেও একটি পরিমিশ্রণ-প্রক্রিয়া রয়েছে। তাই ধর্ম পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে আমি রিলিজিয়ন বোঝাতে চাইছি। ইহুদি-খ্রিস্টান-ইসলাম এই সেমিটিক ধর্মত্রয় এবং আরও কিছু ধর্ম প্রকৃতপক্ষে রিলিজিয়ন। হিন্দু ধর্মকে রিলিজিয়ন বলা যায় না। রবীন্দ্রপ্রতিধ্বনিতে বরং বলব, এ একটা কালচার। রিলিজিয়ন মাত্রেই সুসংগঠিত, তার সুদৃঢ় একটি প্রাতিষ্ঠানিক আকৃতি আছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তা পরিমিশ্রণ প্রক্রিয়ারূপী নিয়মের ঊর্ধ্বে কদাচ নয়। সব রিলিজিয়নই সেকারণে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ তার আদি রূপটি অব্যাহত এবং অবিকৃত থাকেনি।

আরবের মরুভূমিতে যে ইসলামের অভ্যুদয়, সেই ইসলামের মূল তত্ত্বটি কিন্তু মোটেও আকস্মিক নয় বা কোনো ভুঁইফোড় ব্যাপার নয়। আমরা জানি, ইহুদি এবং খ্রিস্টানিতত্ত্বেও মৌলিক একেশ্বরবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন ইসলামপ্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ। খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ শতকে রোমান সম্রাট কন্‌স্ট্যান্টাইনের সভাপতিত্বে নিসিয়া পরিষদে Homoiousios তত্ত্ব এবং Homoiousios তত্ত্বের বিরোধে একেশ্বরবাদী প্রেসবাইটার আরিয়ুসকে পর্যুদস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ অ্যাথনেসিউস ত্রিত্ববাদকে প্রায় গায়ের জোরেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু আরিয়ুসের একেশ্বরবাদী তত্ত্বের বিনাশ ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামমোহনের যুগে খ্রিস্টীয় ইউনিটারিয়ান আন্দোলনও আরিয়ুসের অনুগামী একটি আন্দোলন এবং রামমোহন এদেশে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তাঁকে ওই Athnasian creed-এর বিরোধিতা করতে দেখি। অন্যত্র তিনি দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, ‘I am

therefore anxious to support them, even at the risk of my life. I rely much on the force of truth, which will, I am sure, ultimately prevail' , বড় বিস্ময়কর এই ঘোষণা!

ইসলামের অভ্যুদয়ের কালে তার প্রবক্তার মুখেও এই বজ্রগর্ভ ঘোষণা আমরা শুনতে পাই। হযরত মুহাম্মদের সমকালে সাকার বিগ্রহোপাসকদের প্রভুত্ব। কিন্তু তখনও 'হানিফ' পদবিধারী সন্তরা একেশ্বরবাদের প্রচারক। এমন কি, হযরতের সমকালেও এক আরব সন্ত ইসলামের অনুরূপ একেশ্বরবাদী অধ্যাত্মবাদ প্রচার করেছিলেন। সুতরাং ইসলাম কোনো ভুঁইফোড় অথবা অবিমিশ্র নতুন তত্ত্ব ছিল না। স্বয়ং হযরতের মতোই, ইসলাম মানুষের চিরকালের সত্য ধর্ম, প্রথম মানুষ আদম থেকে মর্ত্যে এর প্রচলন এবং ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। হযরত মোহাম্মদ বলেছেন, তিনি একজন মানুষমাত্র– কিন্তু তিনি ঈশ্বরের এক বার্তাবাহী। হযরতের মতে, ঐশ্বরিক সত্তা অজর অমর, নিদ্রা যান না তিনি, আহার করেন না, সন্তানসন্ততির জন্মদান করেন না, মানুষোচিত জৈব ধর্মের ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান এবং সকল মানুষই ব্যক্তিহিসেবে মানুষি মর্যাদার সমান। যেহেতু এই ঐশ্বরিক সত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং পরম নিয়ামক সেই হেতু মানুষের তিনি উপাস্য– বিশেষ করে মানুষ তার জীবনের কৃতজ্ঞতাবোধে তাঁর উদ্দেশে নতজানু হোক। এই হল হযরত মুহাম্মদের মূল শিক্ষা।

রিলিজিয়ন হিসেবে আদিতে ইসলাম ছিল একটি সরল সাদাসিধে ধর্ম। তার মধ্যে দর্শন, অনুশাসন এবং তৎকালীন লোকাচারের সমন্বয় ঘটেছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু হযরতের মৃত্যুর পর খলিফাতন্ত্র কেন্দ্র করে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটল। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের দরুণ এবং আত্মপ্রসারের ফলে ইসলামের সেই আদি সাদাসিধে রূপটাও হতে থাকল জটিল, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ ও অভিসন্ধিজনিত বিস্তর জিনিস প্রক্ষিপ্ত হয়ে ইসলাম অনকটা বদলে গেল। আরবে ইসলামের দুটি প্রধান সংগ্রহ বা উত্তরাধিকারজাত সম্পদ ছিল মিশর, ইরাক এবং গ্রিক সভ্যতার ঐতিহ্য। উম্মায়েদ বংশের পতনের পর আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের আমলে পারসিক ঐতিহ্য করতলগত হল ইসলামের, সেইসঙ্গে বাইজেন্টাইন সংস্কৃতিও। মধ্যএশিয়ার তুর্কি ভারতবিজেতা, তাঁদের সমর্থকবৃন্দ, পারসিক উলামারা এদেশে যে ইসলামকে নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে আদি ইসলামের মিল খোঁজা অবান্তর– যদিও মূল কাঠামোটা মোটামুটি অবিকৃতই ছিল।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আদি ইসলামের মৌলিক থিওলজি যা প্রচণ্ডভাবে একেশ্বরবাদী এবং কোনো মধ্যবর্তীকে অবতারবাদী অর্থে স্বীকার করে না এবং যা ঘোষণা করে, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে ব্যবধান শুধু বিশ্বাসসংক্রান্ত, সেই মুতাজিলাতত্ত্ব এবং সুফিবাদের স্রোতগুলো বহমান থেকেছে। রামমোহন যখনই সেই স্রোতে অবগাহন করলেন, তাঁর যেন নবজন্ম ঘটল। প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ধারার প্রতি তাঁর

মনোভাব অপ্রসন্ন ছিল। এবার তাঁর চোখে আরও বড় করে ধরা পড়ল বিকৃতির রূপ। সুতরাং অবতীর্ণ হলেন জিহাদে– ধর্মযুদ্ধে।

এরপর তাঁকে আমরা দেখি পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে। অসমসাহসে লিখে ফেলেন পৌত্তলিকতাবিরোধী নিজের যা কিছু মতামত। পরিণামে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। এ যেন শাস্তিভোগকারী গৃহনির্বাসিত অর্জুনের অভিযাত্রা– যেখানেই যান, নতুন নতুন অস্ত্রশিক্ষায় নিজেকে পারদর্শী করে নেন। কারণ তিনি জানেন, ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে তাঁকে লড়তে হবে।

চার.

কাশীতে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নকালে বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ঘটেছিল, কিংবা আরও পরে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, মহানির্বাণতন্ত্র– এসবের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর প্রাথমিক সত্যদর্শন যে অ্যারিস্টোটলপাঠের মাধ্যমে মুতাজিলা দর্শন থেকে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। আরবদার্শনিক তথা থিওলজিস্টরাই গ্রিক অ্যারিস্টোটলকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। রূপান্তরিত বলছি, কারণ আরবি অ্যারিস্টটল আসলে কিন্তু নিওপ্লেটোনিক তত্ত্বই। একটু ভুল ঘটেছিল ওঁদের। নবম শতকে আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইশাক আল-কিন্দিই প্রথম দর্শন-লেখক আরবি ভাষায় এবং তিনি নিওপ্লেটোনিক তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা প্লাটিনাসের ‘ইনিডস’ গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ করেন। কিন্তু নাম দেন ‘অ্যারিস্টোটলের থিওলজি’। এর ফলে নিওপ্লেটোনিক তত্ত্ব অ্যারিস্টোটলের পোশাকে আবির্ভূত হয় আরবজগতে। ইসলামের যে বিষয়গুলো অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, নিওপ্লেটোনিকতত্ত্ব অবলম্বন করে সেগুলোর প্রতি আঘাত হানতে চাইলেন যাঁরা, তাঁরাই মুতাজিলা। মুতাজিলা কথাটির অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী। তাঁদের মূল তিনটি প্রশ্ন ছিল, ঈশ্বরের প্রকৃতি, কুরআনের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক– এই তিনটি প্রসঙ্গে। এর আগেও অবশ্য একদল মুসলিম থিওলজিস্ট অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের বলা হত কাদরি। তাঁদের মতে, মানুষ কী করবে না-করবে, সেটা তার নিজের এক্তিয়ারে– ঈশ্বরের নয়। অর্থাৎ তাঁরা মানুষের স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। মুতাজিলারা কাদরিদের পরবর্তী গোষ্ঠী। মুতাজিলামতে ঈশ্বর হিন্দুতত্ত্বের নির্গুণ ব্রহ্মার প্রায় কাছাকাছি। কাজেই কুরআন
চিরন্তন নয়, অ-সৃষ্ট কিছু নয়। কুরআনের ঐশী সত্য সম্পর্কেই তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রকারান্তরে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁরা বলতেন, মানুষ নিজের ভালোমন্দের জন্য দায়ী। মানুষ তার কর্মে স্বাধীন। তাই বলে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দেবেন, একথা ভাবাই যায় না।

রামমোহনের ‘তুহফাত-উল-মোয়াহেদ্দিন’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তার ছত্রে ছত্রে মুতাজিলা-দর্শনের প্রতিধ্বনি শুনবেন। আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের সমৃদ্ধি ঘটে খলিফা

হারুন-অল-রশিদের আমলে– যিনি আরব্য সহস্র রজনীর এক প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তী যুগে। তাঁর পুত্র আল মামুনের রাজত্বকালে মুতাজিলা-বাদ রাষ্ট্রীয় মতবাদ হয়ে ওঠে। আল মামুন ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে মুতাজিলাবাদী ইসলামকে তাঁর রাজ্যের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের খ্রিস্টীয় ভঙ্গিতে ইনকুইজিশন বা মিহ্নাহ্ করে লাঞ্ছিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে কতলও করা হয়। মামুনের পর খলিফা হন তাঁর ভাই আল-মুতাসিম। তিনি মিহ্নাহ্ চালু রাখেন। কিন্তু তাঁর পুত্র আল-মুতাওয়াক্কিল খলিফা হয়ে ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুতাজিলাতন্ত্র এবং মিহ্নাহ্ উচ্ছেদ করেন।

মুতাজিলাতন্ত্রের মিহ্নাহ্-তালিকায় ছিল বাগদাদের সুন্নি ইমাম আহমদ ইবনে হান্‌বলের নাম। সুন্নি মুসলিমদের চারগোষ্ঠীর অন্যতম হানবলিগোষ্ঠী তাঁর মতবাদ থেকে গড়ে ওঠে। সউদি আরবের রাজবংশ এই গোষ্ঠীভুক্ত। আল মামুনের আদেশে ইমাম হানবলকে শেকলে বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছিল। আল-মুতাসিমের আমলে কারাগারে তাঁকে কতল করা হয় ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাসে বর্ণনা আছে, ৮ লক্ষ ৬০ হাজার নরনারী তাঁর শবানুগামী হয়েছিল। বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ও রক্ষণশীল মতবাদেরই সতত সমর্থক। আবার এ-ও বোঝা যায়, কোনো শুদ্ধ দার্শনিক বা থিওলজি-সংক্রান্ত নিরীহ তত্ত্বও কীভাবে পীড়ন এং সন্ত্রাসের উপলক্ষ হয়ে ওঠে। মুতাজিলা-দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা বড় মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। এটাই যেন ইতিহাসের নিয়ম, শাসকগোষ্ঠী শাসন ও শোষণের হাতিয়ার সংগ্রহে বরাবর দার্শনিকদের শরণাপন্ন হন।

মুতাজিলা দর্শন রাষ্ট্রীয় সমর্থন হারিয়ে যখন স্তিমিত প্রদীপশিখাটি হয়ে এসেছে, তখনই সেই শিখার মৃদু নীলাভ অগ্নিকণা থেকে অগ্নি সংগ্রহ করে আরেকটি প্রদীপ জ্বলে উঠল এবং সে প্রদীপের দ্যুতি বিচিত্র, তার প্রজ্বলনচ্ছটা বর্ণময়– তার নামই সুফিবাদ।

রামমোহন কেন সুফিবাদে আকৃষ্ট হলেন, কেন তিনি যখন তখন অনর্গল সুফি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং কেন সুফিবাদ বেদান্ততত্ত্বে পরম আত্মসমর্পণের কারণ হয়েছিল, সেকথা বোঝবার জন্য সুফিবাদ সম্পর্কে কিছু কথা খুবই প্রাসঙ্গিক।

সুফি শব্দটার ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামানো হয়েছে। দুটি সূত্রের দিকে অঙুলিনির্দেশ করা যায় এবং তার মধ্যে যুক্তিও আছে, তা হল: হিব্রু কাব্বালীয় দর্শনের Ain Sof অর্থাৎ পরম অসীম-তত্ত্ব এবং গ্রিক শব্দ Sophos যা থেকে সফিস্ট, থিওসফি কিংবা ফিলসফির উদ্ভব। এগারো শতকে আল-বিরুনিও এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁর 'ভারত' গ্রন্থে হিন্দুতত্ত্বের সঙ্গে সুফির মিল নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। কাব্বালীয় দর্শনে ঈশ্বর এক পরম এবং অসীম সত্তা। তা ছাড়া বাইবেলের কাব্যসমূহের বাহ্যিক অর্থের আড়ালে গূঢ় গোপন অর্থ রয়েছে– যা একমাত্র সাধকই আবিষ্কার করতে পারেন। সুফিরাও একই পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং কুরআনের গভীরতর অর্থ নিষ্কাশনে ব্রতী। গ্রিক Sophos শব্দের অর্থ ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা। সফিস্টদের তর্কবিলাসী স্বভাব এবং

আচার-আচরণের সঙ্গেও সুফিদের প্রচণ্ড মিল। গ্রিক সূত্রেই পিথাগোরাসীয় মতবাদের প্রতিধ্বনিও সুফিবাদে শোনা গেছে। আবার চৈনিক সূত্রে তাও ধর্মের যোগাযোগে তন্ত্রবাদও সুফিতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

তবে সুফিবাদের উৎস অবশ্যই ইসলাম– আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, কুরআন। কিন্তু ইরানের অপেক্ষাকৃত উদার আবহাওয়ায় এগারো শতকে সুফিবাদ বহুমুখী হয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। শিয়া এবং সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের মুসলিম সুফিবাদের অনুগামী ছিলেন। তারপর সুফিবাদে শোনা গেছে ভারতীয় দর্শনসমূহেরও প্রতিধ্বনি। বেদান্তকেন্দ্রিক অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধ তন্ত্র এবং সহজিয়াবাদ, বৈষ্ণব দর্শন– সবকিছুই সুফির চিন্তায় অনুরণিত হয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে যে তিনটি সুফিকণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি, তিনটি প্রধান কণ্ঠস্বর, তা হল: ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রতিভাস অর্থাৎ শংকরচার্যের মায়াবাদী প্রত্যয় এবং অন্যটি উপনিষদোক্ত 'সো অহম'– আনাল হক্, মনসুর হাল্লাজ ছিলেন যার প্রবক্তা। আর তৃতীয়টি হল: পরমসত্তা এবং বিশ্বসত্তা পৃথক– স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। এ সেই প্রেসবাইটার আরিয়ুসের খ্রিস্টানি একেশ্বরতত্ত্ব যা ত্রিত্ববাদের বিরোধী। সুফিদের এই তিনটি প্রধান স্কুলের নাম যথাক্রমে– শহুদিয়া, ওয়াজুদিয়া এবং ইজাদিয়া। এই তিনটি স্কুল কেন্দ্র করে মোটামুটি চারটি সুফি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল চারজন সন্তকে কেন্দ্র করে। এগুলোকেই বলা হয়েছে চিশতি, কাদিরি, নাখ্শ্বন্দি এবং সুহরাওয়ার্দি। প্রবক্তাদের নামে নামে।

সুফিদর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। কিন্তু রামমোহন প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামকে এড়িয়ে কেন সুফিবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা এই সংক্ষিপ্ত সূত্র থেকেই বোঝা যায়। পাটনায় আরবি ভাষায় অ্যারিস্টোটল অর্থাৎ ছদ্মবেশী নিওপ্লেটোনিকতত্ত্ব এবং ইউক্লিড পাঠ তাঁকে যে শুধু মুতাজিলা এবং সুফিবাদে আকৃষ্ট করেছিল তা-ই নয়, থিওলজির ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ অর্থাৎ লজিকের প্রয়োগ করতেও শিখিয়ে ছিল। এর পর কাশীতে হিন্দুশাস্ত্র পাঠের সময়ও তিনি ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবেন। তার ফলে শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা আধুনিক যুক্তিবাদীর ভূমিকায় দেখি এবং এ বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথার প্রতিধ্বনি না করে পারি না যে, 'তুহফাত-উল-মুয়াহেদ্দিন গ্রন্থে কেবল যুক্তিবাদ, শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ।'

'তুহফাত-উল-মুয়াহেদ্দিন' প্রকৃতপক্ষে একটি দার্শনিক সনদ। একে নিছক গ্রন্থ বললে সম্ভবত অমর্যাদা করা হয়। অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ১৮৪৮-এর 'কমিউনিস্ট ইশতাহার', 'তুহফাত' উনিশ শতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐশী পরমতত্ত্বের তেমনি এক ইশতাহার। এটিও সমান অর্থে যুক্তিবাদী, বৈপ্লবিক এবং যুগপ্রবর্তক একটি দলিল। পরিহাসচ্ছলে কেউ বলতেই পারেন, ডাল এবং ডালনার তুলনা উদ্ভট। কিন্তু তাঁদের আমি সবিনয়ে গভীরভাবে 'তুহফাত' পাঠের অনুরোধ করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধর্মে বিশ্বাসী নই, মানবধর্মেই

বিশ্বাসী। কিন্তু 'তুহফাত' পাঠের পর আমার মনে হয়েছে, যদি এ বিশ্বের কোনো পরম নিয়ন্তা এবং তাঁর বিধানে বিশ্বাসী হতাম, তাহলে তুহফাতই হত আমার মুক্তির দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় ধর্মের মানবতন্ত্রী এবং সৃজনশীল বিশাল ক্ষমতার পরিচয় যেমন দেখলাম, তেমনি তার মানববিদ্বেষী এবং বিধ্বংসী দানব-চেহারাও তো কম দেখলাম না। এখনও ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়, নরহত্যা ও রক্তপাত ঘটে মুহুর্মুহু। এখনও ধর্ম তৈরি করে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষের মধ্যে অতিকায় সব পাঁচিল। মানুষকে শেখায় পরস্পরকে ঘৃণা করতে। ধর্মের আলোর দিক যেমন দেখেছি, তেমনি তার অন্ধকারের দিক তো কম দেখিনি। রামমোহনের 'তুহফাত-উল-মুয়াহেদ্দিন' নামক ইশতাহারে ঘোষিত হয়েছিল সেই অন্ধকারবিনাশী আলো জ্বালানোর ডাক। যদি সে-ডাক এদেশের ধর্মবিশ্বাসীরা শুনতেন, যদি তাঁরা আর এক পা বাড়িয়ে যুক্তিবাদকে স্পর্শ করতেন, তাহলে পরম প্রজ্ঞা লাভ কতখানি হত জানি না, কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমাদের এই বিশাল মাতৃভূমি খন্ডিত হত না, হিন্দু ও মুসলমানের রক্তে এই মাটি হত না কলঙ্কিত। আমরা রামমোহনের কণ্ঠস্বরে পরস্পরকে 'বেরাদর' বলে সম্ভাষণ করতে পারতাম। রামমোহনের পবিত্র 'তুহফাত' উপহার ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সংস্কার দুর্মর, মোহ অবিনাশী এবং সত্য কঠিন। কঠিনকে ভালোবাসা সহজ নয়। কেউ কেউ পেরেছিলেন ভালোবাসতে, যেমন রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনেরই প্রতিভূ তিনি। পরবর্তী প্রফেট।

পাঁচ.

রামমোহন প্রফেট-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। মুতাজিলা এবং সুফিদের মতোই ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যবর্তী কাউকে আবশ্যিক বলে তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর এই প্রত্যয়টিও কিন্তু ইসলামের মূলতত্ত্ব থেকে সংগৃহীত। ইসলামের প্রবক্তা হজরত বারবার ঘোষণা করেছেন, তিনি মানুষ মাত্র। মর্ত্যে ঈশ্বরের প্রতিভূ নন। তবে ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন। সেকারণে ইসলামি বিশ্বাসবাক্যে 'ঈশ্বর ছাড়া উপাস্য নেই' ঘোষণা করেও হযরত মুহাম্মদের নামটি শুধু বার্তাবহ হিসেবে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু হজরত মুক্তিদাতা নন, মুক্তিদাতা ঈশ্বর। রামমোহন মনে করতেন, প্রফেটদের ঈশ্বরবোধ কিংবা ঋষিদের ব্রক্ষজ্ঞান 'প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের মতোই স্বাভাবিক।' এ কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়া নয়। 'আত্মার অবস্থাবিশেষে' পরমপ্রজ্ঞার প্রকাশ। ইসলামি মূল তত্ত্বেও অলৌকিকতা স্বীকার করা হয়নি। মুসলিমদের একটি সম্প্রদায় নিজেদের লা-মাযহাবি অর্থাৎ সম্প্রদায়বহির্ভূত বলতেন এবং নিজেদেরকে 'মুহাম্মদী' বলেও ঘোষণা করতেন। এঁরা কুরআনে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলির নৈসর্গিক ব্যাখ্যা দিতেন। কাজেই বোঝা যায়, ইসলামের কিছু মূল তত্ত্ব থেকেই রামমোহন প্রফেটের মধ্যবর্তিতার ভূমিকা ও অলৌকিকতা বাতিল করার প্রেরণা

পেয়েছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র এবং ইউরোপীয় দর্শনের তৎকালীন যুক্তিবাদী ধারণাগুলো তো পরবর্তীকালে তাঁর মতামতকে আরও দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'তুহফাতে' রামমোহন 'মানজারাত-উল-আদিয়ান' নামে আরবি ভাষায় নিজের লেখা একটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন। বইটি পাওয়া যায়নি বলে জানি। এই বইটি পেলে আমরা তাঁর ইসলামি শাস্ত্রানুশীলন সম্পর্কে আরও তথ্য পেতাম। এছাড়া 'জবাব-এ তুহফাতুল মুয়াহ্হিদিন' নামে আরেকটি ফার্সি রচনায় তিনি জোরাস্তার-পন্থীদের সঙ্গে বিতর্কে নেমেছিলেন বলে জানা যায়। এই বইটি সম্পর্কে আমার জানা নেই। এ-ও শুনেছি, এটি নাকি তাঁর নিজের লেখা নয়। তবে বুঝতে পারি, তাঁকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল এবং তিনি প্রত্যেককে তাদেরই অস্ত্রে প্রতিহত করছিলেন। উলামাকুলের সঙ্গে যুদ্ধের পর তাঁকে দেখি 'জবরদস্ত মৌলবি' বলে স্বীকৃতি লাভ করতে। যুক্তিবাদী একেশ্বরতত্ত্বের স্বপক্ষে আরবি ন্যায়শাস্ত্র এবং দর্শনে ব্যবহৃত টার্মগুলো ব্যবহারে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সুতরাং তাঁকে জবরদস্ত মৌলবি না বলে উপায় নেই। অন্যদিকে খ্রিস্টান সমাজ তাঁকে ভেবেছেন, তেমনি জবরদস্ত বাইবেলতাত্ত্বিক এক খ্রিস্টান। কারণ এ শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত। আবার হিন্দুসমাজ তাঁকে জেনেছেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে। হিন্দু শাস্ত্রের তাবৎ দুরূহ বিষয় তাঁর নখদর্পণে। সত্যি বলতে কী, এক অন্ধকার যুগের রাত্রি অবসানে ব্রাহ্মমুহূর্তে দিগন্তরেখায় তিনি আলোকাভাস, তাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁরই পশ্চাতে আসছিল নবীন উজ্জ্বলতা– নতুন একটি যুগ, আমরা যাকে ইউরোপীয় অনুকরণে পুনর্জাগরণ বলেছি– আসলে তা একটি নতুন জাগরণ, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চেতনা। সগ্র জাতির দীর্ঘকাল ধরে মূর্ছিত আত্মার প্রথম চেতনা সঞ্চার রামমোহনের আবির্ভাবে।

ছয়.

প্রারম্ভে একটি অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছিলাম: সামগ্রিকভাবে মুসলিম শাসক, উলামা সমাজ এবং তাঁদের অনুগত ব্যক্তিরা হিন্দুস্থানের ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। অন্তত এটাই বারবার যুগে যুগে মুসলিমপ্রবণতা। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী হলেও তার ব্যক্তি-অস্তিত্বে স্বাধীনতার নিয়মসমূহ সতত ক্রিয়াশীল। মানুষই পারে স্বেচ্ছায় অমৃত এবং বিষের মধ্যে বিষকেই ঠোঁট তুলে নিতে হাসিমুখে। তার মানে মানুষের ব্যক্তি-অস্তিত্বে এমন এক শক্তি আছে, যা প্রয়োজনে তাকে যূথচিন্তার বা যূথমানসিকতার গড্ডলপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে– সে যা পছন্দ করে, যা তার অভিপ্রেত, সেখানে।

সুতরাং ভারতীয় সমাজ– হিন্দুসমাজ এবং মুসলিমসমাজ যে মানসিকতাই পোষণ করুক, গড্ডলপ্রবাহের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে আরেক মানসিকতা প্রবহমান থেকেছে এবং তা ধর্মের ক্ষেত্রে একটি সমন্বয়ের। বিশ্বের অতত্র– প্রায় সর্বস্থানে আমরা ধর্মীয় সহাবস্থান যদি-বা দেখেছি, সমন্বয় দেখিনি– সে-ও এই ভারত বাদে। আবার সংস্কৃতির

ক্ষেত্রে সমন্বয় যদিও দেখেছি, ধর্মের ক্ষেত্রে দেখিনি– সে-ও এই ভারত ছাড়া অন্য কোথাও। সংস্কৃতির পরিমিশ্রণ অবাধ। কিন্তু ধর্মের পরিমিশ্রণ অবাধ নয় এবং এক্ষেত্রে পরিমিশ্র আত্মসাৎ-এর নামান্তর। ইসলামি শরিয়ত যখন রোমান আইন সংগ্রহ করে, তখন তা আত্মসাৎ। পরিমিশ্রণ বা সমন্বয় নয়। কিন্তু ভারতে হিন্দুশাস্ত্র আর ইসলামি শাস্ত্র থেকে বিষয় সংগ্রহ করে পরিমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল, তা সমন্বয়। স্পষ্ট কথায় ধর্মসমন্বয়।

মুসলিম শাসনের সময়, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে ব্যাপকভাবে আমরা সংস্কৃতি-সমন্বয় দেখতে পাই। ভাষা, লিপি, পোশাক, সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য খাদ্যগ্রহণ রীতি, সামাজিক আদব-কায়দা– এক কথায় ব্যক্তি এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল। এ সমন্বয় ছিল অবাধ। বহুব্যাপক। এখনও ওইসব অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম কমন নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও ক্রমশ এ প্রবণতা নতুন পরিস্থিতিজনিত প্রতিক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ধর্মসমন্বয়ের প্রবাহটি বিচ্ছিন্ন এবং প্রায় একঘরে ধরনের হলেও ভারতে তা একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল। মুঘল বাদশাহ আকবর, তাঁর প্রপৌত্র দারা শিকোহ্ এবং আরও কিছু শাসকের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ করা যাবে। জনজীবনের স্তরে কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব প্রমুখ সন্তপুরুষের মতবাদ সেই ধর্মসমন্বয়কে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। বাংলায় শ্রীচৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণীতেও একই সুর শোনা গেছে। বাংলার বাউলতন্ত্র তো ধর্মসমন্বয়ের একটি বিরাট প্রতীক।

রামমোহন আমরা দেখি সেই সমন্বয়-ঐতিহ্যের আরেক মহৎ উদ্ভাস। কিন্তু তাঁর সমন্বয়বাদী প্রয়াস আধুনিক মননক্রিয়ার পরিশীলনজাত– উচ্চতর বৈদগ্ধ্য এবং যুক্তিবাদের নিকষে বাছাই করা, মননপ্রকর্ষের এক সমৃদ্ধ শস্য। তাঁর সমন্বয় সর্ব ধর্মের যেন এক রাসায়নিক যৌগ। যাঁরা শাস্ত্রীয় দর্শনে বিশ্বাসী নন, কিংবা যাঁরা নিরীশ্বরবাদী, অথবা যাঁরা Deeist-দের মতো শুধু পরমসত্তায় বিশ্বাসী, কিন্তু রিলিজিয়নে বিশ্বাসী নন, তাঁদের সবারই রামমোহনের সমন্বয়বাদী ড্রকট্রিনের অনুগামী হতে বাধা নেই। কারণ, তাঁর এই ডকট্রিন আন্তর্জাতিক মানব-ভ্রাতৃত্বের, এতে আছে সংস্কার থেকে মুক্তির আহ্বান। মানবচেতনার উর্ধ্বস্তর সম্পর্কে উল্লেখ আছে এই নতুন মতবাদে। মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি আছে। আছে প্রাচীন জাড্য থেকে মুক্তির পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়ে সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনোদিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।'

মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। এই পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য বাল্যেই তিনি পা বাড়িয়েছিলেন ঘরের বাইরে বৃহত্তর পটভূমিতে। আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, হিন্দুধর্মের মূল ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশাল উত্তরাধিকার সম্পর্কে তখন হিন্দুরা নিজেরাই

আত্মবিস্মৃত, উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়। মুসলিম আমলের প্রায় সপ্ত শতাব্দী ব্যাপী প্রগাঢ় সেই সুষুপ্তি। অন্যদিকে মুসলিম শাসক, উলামা ও তাঁদের অনুগত সমাজের হিন্দুধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন, তেমনি নিজেদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কেও বিভ্রান্তির শেষ নেই। পরিবর্তিত ইসলাম ভারতে সপ্ত শতাব্দী পরে পারিপার্শ্বিক ধুলোময়লায় ম্লান হয়ে উঠেছে। হিন্দু জাতপাত, গুরুবাদ এবং আরও অনেক প্রায়-পৌত্তলিক লোকাচার সঙ্গগুণে বা দোষে ইসলাম ধর্মেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। দিল্লিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহর শুদ্ধি আন্দোলন, কিংবা পরবর্তী ওয়াহাবি আন্দোলন, পূর্ববঙ্গের হাজি শরিয়তউল্লার ফরাজি আন্দোলন– এসবেরই ইসলাম থেকে ধুলোময়লা এবং বিধর্মী-সংসর্গ ঝাড়পোঁছের ব্যস্ততাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিছু পরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলনও একই ধরনের তৎপরতা। অর্থাৎ সবাই আপন-আপন ঘর ঝাড়াই এবং চুনকামে মন দিয়েছেন। কিন্তু রামমোহন?

রামমোহন যে পথে হাঁটছিলেন, সেপথ নিছক পুনরুদ্ধারের নয়, নবনির্মাণের। সেই নির্মাণের কাঠামোতে হিন্দু আছেন, মুসলিম আছেন, খ্রিস্টান আছেন। বেদ, বাইবেল, কুরআনের অন্তর্নিহিত সাধারণ সত্য সেই কাঠামোর ভিত্তি। কারণ তিনি অবাধ মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান প্রেমে আলিঙ্গন করতে উৎসুক।' তিনি যদি নিছক হিন্দু হতেন, যদি শুধু বেদান্তই তাঁর একান্ত অভিপ্রেত তত্ত্ব হত, তাহলে আমরা দেখতাম আরেক মহান হিন্দু সন্তকে– এবং তেমন সন্ত তো এ ভারতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি হিন্দু নন, মুসলিম নন, খ্রিস্টান নন। একজন বিরাট মাপের ভারতীয়– যাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, ইনি কি হিন্দু? নাকি মুসলমান? নাকি খ্রিস্টান? প্রকৃত পক্ষে ইনি একজন মানুষ। যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি ইসলামে খুঁজে পান বেদান্তের সত্য, বেদান্তে খুঁজে পান ইসলামের সত্যকে আবার তিনিই বাইবেলে আবিষ্কার করেন ভারতীয় ঋষির সিদ্ধান্তকে। এবং সেই সিদ্ধান্তে প্রতিধ্বনিত হতে শোনেন বাইবেলের মূল পরমার্থকে।

এবং যেহেতু তিনি ভারতীয়, ভারতপথের পথিক, সেই হেতু তিনি আশ্রয় করেন ভারতেরই ঐতিহ্যের অন্তর্গত এবং ভারতের মাটির স্বাভাবিক ভাষাকে। আরবি-ফারসি নয় হিব্রু-আরমাইক নয়, স্বদেশের প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতকেই ঈশ্বরোপাসনার ভাষা বলে গ্রহণ করেন। আবিষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনি উচ্চারণ করেন, ওঁ তৎ সৎ। কুরআনের 'আলিফ লাম মিম' এই সাংকেতিক বাক্যের প্রতিধ্বনি ওই উচ্চারণে। হিব্রু বাইবেলের কাব্বালীয় 'Ain sof' ঘোষণাও তাই। বাইবেল নববিধান যিশুখ্রিস্টের কণ্ঠে উচ্চারিত 'I am the way, I am the life'– এই বাক্যেও সেই পারমার্থিক তত্ত্বের প্রতিফলন।

সাত.

তাই বলে একথা ভাবলে ভীষণ ভুল হবে যে রামমোহন ছিলেন শুধুমাত্র এক শাস্ত্রবিদ্‌, কিংবা দার্শনিক প্রবক্তামাত্র। শাস্ত্রজ্ঞ বা দার্শনিকরা সচরাচর আত্মভোলা, গৃহধর্ম সম্পর্কে উদাসীন, আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতায় কেউ কেউ সর্বত্যাগীও। রামমোহন ছিলেন তার বিপরীত। তাঁর সব কর্মই অতিমাত্রায় জীবনমুখী। তিনি জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, স্বপ্ন ও কল্পনা থেকে বিমুখ ছিলেন না। বরং জীবনভোগে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। আহার এবং সজ্জায়, শারীরিক সামর্থ্য এবং চর্চায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল গভীর। তাঁর এমন বিচিত্র ধারণাও ছিল যে, মুসলিম প্রচুর মাংস খায় বলেই হিন্দুর চেয়ে স্বাস্থ্য-শক্তিতে দড়। সুতরাং তিনি নাকি হিন্দুদের মাংসভক্ষণের পরামর্শ দিতেন– হয়তো কৌতুকচ্ছলেই। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর অভিপ্রায় আমরা আঁচ করতে পারি।

আসল কথাটা হল, তিনি ছিলেন প্রকৃতই জীবনরসিক। সেকারণেই সাধুসন্ত-দার্শনিকের আদল সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ভারতের নবনির্মাণে সক্রিয় এবং তৎপর দেখি। নব-ভারত নির্মাণে তাই তিনি নির্দ্বিধায় ইংরেজের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। বহু ক্ষেত্রে হাতও মিলিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ বিতর্কিত এবং এক্ষেত্রে অবান্তর।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে নিরাসক্ত, উদাসীন এবং সতত নিরুত্তাপ হিন্দু মানসিকতার উত্তরাধিকার সত্ত্বেও রামমোহন কোথায় সংগ্রহ করলেন খরতর জীবনের প্রবাহে ঝাঁপ দেবার এবং মত্তমাতাল জীবনশক্তির প্রেরণা? এ প্রেরণাও যে ইসলামি দর্শনের কাছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। স্বয়ং পয়গম্বরের জীবনযাপন এবং জীবনাদর্শে এই আসক্তি প্রবল ছিল। মুসলিমরা দিনরাত্রি পাঁচবার প্রার্থনার শেষে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা করে থাকেন: 'হে ঈশ্বর! আমাকে পরকাল এবং ইহকাল উভয়েরই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যসমূহ দান কর।'

ব্যক্তিজীবনে শুধু পরকাল নয়, ইহকালেও– এই মর্ত্যলোকেরও শ্রেষ্ঠতর সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করা হয় ইসলামে। ইসলাম বস্তুত অতিশয় গৃহীর ধর্ম। কিন্তু অপরিমিত ভোগ, অসংযত বাসনাও একই সঙ্গে নিন্দনীয়। সংযমের মধ্যে ভোগ করতে বলেছে ইসলাম। মুতাজিলা ও সুফিরাও কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুসন্ত ছিলেন না। অনেক সময় তাঁরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরেছেন। সামাজিক নির্মাণকর্মেও সহযোগিতা করেছেন। কারণ ইসলাম প্রচণ্ডভাবে জীবনবাদী এবং ভোগমুখী ধর্মও।

পরমার্থসন্ধানী দার্শনিক রামমোহনের জীবনে এই জীবনবাদকেই লক্ষ করি। জবরদস্ত মৌলবির মতোই তিনি গৃহকর্ম, বৈষয়িক কর্ম, সমাজকর্ম এবং পারমার্থিক কর্মে নিরন্তর ব্যস্ত থেকেছেন। 'যাতে অমৃত নেই, তা নিয়ে আমি কী করব' বলে তিনি আর্তনাদ করেননি। তাঁর যাত্রা ভিন্ন মার্গে। তিনি মর্ত্যেই অমৃতকে জেনেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানবজমিন আবাদ করে সোনা ফলানো যায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা– এই প্রত্যয় উচ্চারণ সত্ত্বেও তিনি জাগতিক বিষয়ে গভীরভাবে লিপ্ত থেকেছেন। মৃত্যু

সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' বলে। তিনি ছিলেন একজন পূর্ণায়তন, পরিপূর্ণ মানুষ। তার চেয়ে বড় কথা, সেই প্রথম আমরা তাঁর মধ্যে দেখলাম আন্তর্জাতিক মানুষকে, এবং এই প্রখর জীবনচেতনা, এই আন্তর্জাতিকতার বোধ তিনি সর্বপ্রথম পেয়েছিলেন ইসলামের কাছেই।

*[উৎসঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য গ্রন্থ; দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৩।] * শান্তি নিকেতনে রামমোহন সেমিনারে পঠিত (১৯৮৩)।

রা জ নী তি / প্র ব ন্ধ

দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের স্বরূপ প্রসঙ্গে

....

জা তী য় মু ক্তি কা উ ন্সি ল [লেখক-নামের পরিবর্তে]

বিদেশি অর্থের জোরে নানা ধরনের ব্যয়বহুল ও দৃষ্টি-আকর্ষক আয়োজনের ক্ষেত্রে এনজিওদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। 'দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম' নামক তেমনি এক চটকদার আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। 'অন্য রকম দক্ষিণ এশিয়া গড়া সম্ভব' স্লোগান নিয়ে ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আঞ্চলিক ফোরাম। বাংলাদেশে সক্রিয় দেশি-বিদেশি এনজিওগুলো পাঁচ দিনের এই ব্যয়বহুল আয়োজন সংগঠিত করেছে; সহ-আয়োজক হিসেবে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 'সিভিল সোসাইটি' নামে পরিচিত সনাতনী চিন্তায় গা-ভাসানো মূলধারার বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনগুলোকে ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়াতে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে আয়োজকরা। ক্রিটিকাল বা বিচারবাদী চিন্তাহীনভাবে সকল কিছুতে অংশ নিয়ে উপস্থিতি, জনপ্রিয়তা ও তহবিলের যোগান রক্ষাকারী নানা বামপন্থী সংগঠন, নেতা ও ব্যক্তি এই আয়োজনে অংশ নিয়ে একে বৈধতা দিলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু না থাকলেও, সাধারণভাবে

শিক্ষার্থী ও তরুণসমাজ এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করার বিপজ্জনক প্রবণতা এতে বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য 'দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম'-এর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে যথোপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

দুই.

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের ধারাবাহিকতা ও অংশ হিসেবে আয়োজিত হচ্ছে এই দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম। আঞ্চলিক এই ফোরাম এর আগে আয়োজিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানে। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে পুঁজিপতিদের বার্ষিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বিপরীতে, বিশ্বায়ন ও নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত প্রতিবাদ এবং চিন্তাভাবনা বিনিময়ের উদ্যোগ হিসেবে প্রথম ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামটি ২০০১ সালে আয়োজিত হয়েছিল ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রে শহরে। আর সর্বশেষ ফোরামটি হয়েছে এ বছরে সেনেগালের ডাকারে। অ্যাটাক (ATTAC) সহ কয়েকটি ফরাসি এনজিও, সেখানকার একটি সংবাদপত্র, ব্রাজিলের একটি এনজিও ও নিয়োগদাতা বা মালিকদের সংগঠনের উদ্যোগে এবং সে সময় ব্রাজিলে ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির সহায়তায় প্রথম ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামটি অনুষ্ঠিত হবার পর এটি এখনো কার্যকর রয়েছে। মূলত গত শতকের নব্বই দশকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নবিরোধী যে মনোভাব বিশ্বের দেশে দেশে জনগণের মধ্যে গড়ে উঠে তাকে অবলম্বন করে এবং জনগণের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নবিরোধী ক্ষোভ-বিক্ষোভ ধারণের আধার হিসেবে গড়ে তোলা হয় ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম। যা প্রথম দিকে বিশ্বব্যাপী প্রচুর সাড়া পেয়েছিল; এর পেছনে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো, নোয়াম চমস্কি এবং অরুন্ধতী রায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু বিগত ১০ বছরে এটি মূলত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওদের একটি বার্ষিক বাগাড়ম্বরে ভরপুর কার্নিভালে পরিণত হয়েছে।

তিন.

বিশ্বায়নবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকেই সোশ্যাল ফোরাম নিয়ে যেসব বাস্তবভিত্তিক সমালোচনা ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এর পেছনে অর্থ যোগানদাতাদের পরিচিতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে। শুরু থেকেই মূল ফোরাম সিআইএ-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ব্রাদার্স ফান্ড, চার্লস স্টুয়ার্ট মট ফাউন্ডেশন, ডব্লুউ. এলটন জোনস ফাউন্ডেশন, নরওয়ে, ইটালি, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগোশ্লাভিয়া ও আফগানিস্তানে মার্কিন-ন্যাটো যুদ্ধের সমর্থক জার্মানির গ্রিন পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হেনরিশ ব্যোল

ফাউন্ডেশন, ব্রিটিশ সংস্থা অক্সফাম, নেদারল্যান্ডের অক্সফাম-নোভিবসহ ইউরোপ-আমেরিকা-ব্রিটেনের আরো অনেক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ পেয়ে এসেছে। অর্থের যোগানদারের স্বার্থে যে তারা কাজ করছে এতে কোনো সন্দেহ নেই, নয়তো বহু আগেই তাদের অর্থের যোগান বন্ধ হয়ে যেত।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংস্থা অ্যাকশন এইড ও অক্সফামের মতো এনজিওগুলোর তহবিলের একটি বড় অংশ আসে নিজ দেশের সরকারের কাছ থেকে। সুতরাং তারা কোনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তো নয়ই, বরং তাদের 'উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুগামী। কোনো সন্দেহ নেই যে, দ. এশিয়া সোশ্যাল ফোরামটিও বিভিন্ন বিদেশি এনজিও এবং ঢাকাস্থ দূতাবাসগুলোর আর্থিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চার.

প্রায় প্রথম থেকেই বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি তহবিলদাতা সংস্থাগুলো ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামগুলোকে এক ধরনের কেনাবেচার হাট হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ফান্ডারস নেটওয়ার্ক অন ট্রেড অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন পর্যবেক্ষক মর্যাদায় নিয়মিতভাবে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে যোগ দেয়। তাদের কাজ হচ্ছে নানা তহবিলদাতা সংস্থার পক্ষে অর্থায়ন করা। এরা ছাড়াও হাজির থাকে প্রায় সকল তহবিলদাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা, যারা বিভিন্ন দেশের এনজিও ও তৃণমূল সংগঠনগুলোর চিন্তাভাবনা, আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে বোঝার এবং নিজেদের চিন্তাভাবনা দিয়ে সেগুলোকে প্রভাবিত করায় সচেষ্ট থাকে।

পাঁচ.

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলে কিছু নেই। অর্থের উৎস নিয়ে তাদের ওয়েবসাইটে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। একই ধারা লক্ষণীয় বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম আয়োজকদের ওয়েবসাইটে। তাদের অর্থের উৎস, এই পাঁচ দিনের আয়োজনের অর্থের পরিমাণ, কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্পন্সর করছে কিনা, আয়োজক কারা, দেশের ও বাইরের কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অংশ নেবার জন্য নিবন্ধন করেছেন সে সম্পর্কিত কোনো তথ্যই তাদের ওয়েবসাইটে দেয়া নেই। তাদের আলোচ্যসূচিতে রীতিমাফিক 'জানার অধিকার' এবং 'জবাবদিহিতা' থাকলেও, নিজেদের তথ্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে তারা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর মতোই রক্ষণশীল।

ছয়.

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিপরীতে বিকল্প বিশ্বায়ন রূপায়িত করা ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের আয়োজকদের ঘোষিত অবস্থান। সে অর্থে বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর তাদের শত্রুশিবিরে থাকার কথা। কিন্তু ২০০৭ সালে কেনিয়াতে অনুষ্ঠিত সপ্তম ফোরামটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল কট্টর শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী কেনিয়া এয়ারওয়েজ এবং কুয়েতি বহুজাতিক মোবাইল ফোন কোম্পানি সেলটেল। ফোরামে সকল অংশগ্রহণকারীকে সেলটেল বিনামূল্যে টকটাইমসহ সিম কার্ড বিতরণ করে; কর্পোরেট মেলার মতো পুরো মেলায় সেলটেলের টি-শার্ট পড়া প্রতিনিধিদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ফোরাম প্রাঙ্গণে সাত ডলারের টিকেট কেটে মেলার মতো প্রবেশ করতে হয়েছিল।

ঢাকার দ.এশিয়া ফোরামে কোন কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে সেটি পর্যবেক্ষণের একটি বিষয় হবে।

সাত.

পাঁচ দিনের এই আয়োজনে শিশু অধিকার, মানবাধিকার থেকে নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক আলোচ্য বিষয় রয়েছে। কিন্তু আলোচনায় নেই শুধু বাংলাদেশেই বিগত তিন দশক ধরে এনজিও ও তাদের সিভিল সোসাইটির কার্যক্রমের তথা 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, সমতা, স্বাধীনতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার' অগ্রগতির কোনো মূল্যায়ন। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক কোনো ধরনের কার্যক্রমে তাদের কোনো আগ্রহ তাদের নেই।

আট.

আয়োজকরা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সিডা, ইউএসএইড, ডিএফআইডি'র মতো সাম্রাজ্যবাদী তহবিল যোগানদাতাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানই যে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে উন্নয়নের নামে এদেশে নানা অপকর্মের সাথে জড়িত তা অস্বীকার করা একমাত্র চরম মতলববাজ বা মূর্খদের পক্ষেই বলা সম্ভব। তারা নারী অধিকার, যৌনস্বাস্থ্য অধিকার ইত্যাদি আলোচ্যসূচির মধ্যে রাখলেও স্থানীয় কোনো এনজিওকে ইউএসএইড'র অর্থায়নের ক্ষেত্রে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নারী অধিকার লংঘনকারী শর্ত ('অর্থ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান গর্ভপাত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে না' এই মুচলেকা দেয়া) জুড়ে দেবার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করছে না। বিচার-বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাদের উদ্বেগ সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোকে কীভাবে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে

খুনিবাহিনীতে পরিণত করেছে সেই প্রসঙ্গে তারা নিশ্চুপ। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মুক্তির আন্দোলনে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ, তার সামান্যতম ইঙ্গিতও তাদের কর্মসূচি প্রদান করে না। এ সকল প্রশ্নে কোনো আলোচনা ছাড়াই 'মানবিক সমাজসম্পন্ন অন্য রকম দ. এশিয়া' কীভাবে সম্ভব হতে পারে?
আয়োজকরা নিজেদের রুটিরুজির জন্য বিপজ্জনক কোনো আলোচনায় আগ্রহী নয়, তারা চায় নিরাপদ বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাজগতে মোহজাল বিস্তার করতে। এদের মাধ্যমে এদেশে সকল ধরনের স্বাধীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, উদ্যোগ ও সামাজিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তি প্রায় বিলুপ্ত হবার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর চশমা দিয়ে দেখার, ব্যাখ্যা করার এবং তাদের শিখিয়ে দেয়া বুলি আওড়ানোর বা তাদের ঢাক পেটাবার বিপজ্জনক প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নয়.

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিকে 'অগণতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠান বলে সমালোচনা করে থাকে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিকীকরণের দাবি তুলে। এর মাধ্যমেই তারা 'সমতা, স্বাধীনতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি মানবিক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। তাদের এই ধ্বনির অর্থ একচেটিয়া পুঁজির গণতান্ত্রিকীকরণের দাবি তোলা। বিশ্বের শ্রমিশ্রেণী ও শোষিত জনগণের দিক থেকে এই উদ্ভট প্রস্তাবের গ্রাহ্যতা কী? পুঁজিবাদ থাকলে শোষণ থাকবে, একচেটিয়া পুঁজি থাকবে, তার আন্তর্জাতিক সংস্থাও থাকবে। শোষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, যার মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হবে তার আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, ডব্লিউটিও প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহের গণতান্ত্রিকীকরণ নয়, বরং জনগণের ক্ষমতা দখল, সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা– এই হল সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণের মুক্তির কর্মসূচি।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই কর্মসূচিকে চাপা দেয়ার জন্য, জনগণকে বিভ্রান্ত করে শোষণব্যবস্থা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যে কৌশল অবলম্বন করে তার একটি হল নিজেরাই অল্প কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার বিরুদ্ধে খণ্ডিতভাবে সমালোচনা হাজির করা।

এটা হল সাম্রাজ্যবাদের 'নিয়ন্ত্রিত সমালোচনার' কৌশল। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যে কোনো সামগ্রিক, ন্যায্য ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনাকে নস্যাৎ করবার জন্যই তাদের এই কৌশল। কেননা তেমন সমালোচনা সঠিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মসূচিকে জোরদার করে ও তার ভিত্তিতে শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে উঠতে সাহায্য করে। ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম হল সাম্রাজ্যবাদের উপরোক্ত ধরনের কৌশল বাস্তবায়নেরই এক প্লাটফর্ম।

দশ.

বাংলাদেশের এনজিওরা পরিপূর্ণভাবে তাদের তহবিলদাতা সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান। এই সাম্রাজ্যবাদী তহবিলদাতাদের ঠিক করে দেয়া নিদান, বিষয় ও বুলি নিয়েই তারা বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম হল তেমনি এক ঠিকাদারি কাজ যা বাস্তবায়নে এনজিওদের সাথে এবার যুক্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের সকল কার্যক্রমকে বিচারবাদী দৃষ্টিতে না দেখলে সেটি সচেতন মানুষদের জন্য যেমন বিভ্রান্তিকর হবে, তেমনি তা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উদ্দেশ্যকেই হাসিল করবে। এ ধরনের আয়োজনে অংশ না নিয়ে, এর বিরোধিতা করা ও স্বরূপ উদঘাটন করা আজ একটি জরুরি কর্তব্য।

১৯.১১.২০১১

[১৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে বাঙলাদেশ লেখক শিবির ঢাকা নগর শাখা আয়োজিত 'দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল ফোরামের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাসভায় পঠিত। রচনাটিকে একটি প্রবন্ধের মর্যাদায় প্রকাশ করা হল। রচনাটি একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে বিধায় এটির কোনো লেখকের নাম উল্লেখ করা হল না। –সম্পাদক]

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: নতুন জগতের অসামান্য কারিগর

আনু মুহাম্মদ

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে আমি কথা বলতে গেলে গত ১২ বছরে গড়ে ওঠা 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎবন্দর রক্ষা' জাতীয় কমিটির আন্দোলন আর তা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়গুলোই নানাভাবে আসতে থাকবে। কারণ এই আন্দোলনের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আর এই আন্দোলনের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, গবেষণা, লেখালেখি, বিতর্ক; লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, বুলেটিন; এই আন্দোলনের নানাপর্বে মিছিল, লংমার্চ, ঘেরাও, শ্লোগান; সারাদেশের নানাপ্রান্ত সফর, পুলিশ-সন্ত্রাসী-মন্ত্রী-ভাড়াটে গবেষক মোকাবিলা; ব্যক্তি গ্রুপ সংগঠন রাজনৈতিক দল নিয়ে অসংখ্য সভা এইসব নিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার প্রতিদিনের সম্পর্ক। আমাদের উদ্বেগ, ক্রোধ, বেদনা, আনন্দ, আশার অনেক কিছুই অভিন্ন; বাংলাদেশ আর এই দেশের মানুষের জীবনমরণের বিষয় ঘিরে।

দুই.

শহীদুল্লাহ ভাই'র সাথে আমার প্রথম আলাপ ১৯৯৮-এর শেষে বা ১৯৯৯-এর প্রথমে কোনো এক দিন। ৮০ দশক থেকেই তাঁর নাম শুনেছি। নাম শুনেছি বাম আন্দোলনের একজন বিরাট সুহৃদ ব্যক্তি হিসেবে। বাম রাজনীতির প্রায় সকল ধারা, এমনকি দলের বাইরেও বহু সংগঠন, লিটল ম্যাগাজিনসহ নানা তরুণ উদ্যোগ সবার কাছেই তিনি এক বিশাল ভরসা, এরকম ভাবেই তাঁর সম্পর্কে জেনেছি। আবার কারও কারও কাছে তাঁর এরকম সমালোচনা শুনেছি যে, তিনি চাঁদা দেয়ার সুযোগে রাজনীতি বা কর্মসূচি 'ডিক্টেট' করতে চেষ্টা করেন। পরিচিত হওয়া এবং একসাথে কাজ করবার অভিজ্ঞতার আগ পর্যন্ত আমার কাছে তাঁর ভাবমূর্তি এমন ছিল যে, তিনি বিশাল ধনী একজন ব্যক্তি, আয়েশি জীবন যাপন করেন, এবং বাম রাজনীতির শুভানুধ্যায়ী হিসেবে অনেককে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। প্রথম আলাপের আগেই তাঁকে দু-একবার দেখেছি; কিন্তু তাঁর সহজ সরল পোশাক চলাফেরা কথাবার্তা সবকিছু সেই এলিট ভাবমূর্তি ভেঙে দিয়েছিল।

আমি তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম তেল গ্যাস কমিটি বিষয়ে আলোচনা করতে, নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে। এই কমিটি গঠিত হয়েছে তার কিছুদিন আগে, ১১ দলসহ কয়েকটি বামদল আহূত কনভেনশনে। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শহীদুল্লাহ ভাই আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেইসময় আমি 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট' ও 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত। তেলগ্যাস নিয়ে মার্কিনিসহ কয়েকটি কোম্পানির সাথে প্রথম দফা চুক্তি হয়েছে ১৯৯৩-৪ সালে। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, নীতি অব্যাহত থেকেছে, দ্বিতীয় দফা চুক্তি হয়েছে ১৯৯৭-৮ সালে। চুক্তিগুলো ছিল গোপন, জনগণ কিছুই জানতে পারেননি। একে একে ১২টি সমৃদ্ধ গ্যাসব্লক কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে গেছে। এদেরই একটি মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল এর অদক্ষতা, অবহেলা ও খরচ কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টার পরিণতিতে মাগুরছড়া বিস্ফোরণ ঘটে। এই দুর্ঘটনার পরই প্রথম মানুষের নজর পড়ে এসব ঘটনাবলির ওপর। তেল গ্যাস চুক্তি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, এর ধরন, এর ফলাফল নিয়ে বিভিন্নমুখি অনুসন্ধান পর্যালোচনা লেখালেখি শুরু হয় তখনই। এই সময় আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটির পক্ষ থেকেও উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি নিয়ে কাজ করতে থাকি। মনে আছে বেশ কয়েকটি ছোটবড় আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। জোট থেকে চুক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সহজবোধ্যভাবে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমরা একটি পোস্টার তৈরি করে প্রকাশ করেছি। সেটাই সম্ভবত এই বিষয়ের ওপর প্রথম পোস্টার। গণতান্ত্রিক কমিটির নামে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সাংবাদিক সম্মেলন প্রকাশনাও করেছি তখন। ৮০ দশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তেল কোম্পানিগুলোর দাপট ও আধিপত্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় তার ভয়াবহ পরিণতি– অর্থনৈতিক দুর্গতি গণহত্যা, দখল, সেনাশাসন, নিয়ে কাজ করেছিলাম। সেই সুবাদে বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে আমিও বুঝতে পারছিলাম আমরা এক দীর্ঘ এবং নির্ধারক লড়াই-এর মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। উন্নয়ন তত্ত্ব, দর্শন এবং রাজনীতি– সবদিক থেকে এই লড়াই চালাতে হবে। কেননা শতবছরের ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, খনিজসম্পদ দখল কেন্দ্র করেই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা সবচাইতে আগ্রাসী, আর সেই আগ্রাসনে দেশের ভেতর জনগণের শত্রুমিত্রদের মেরুকরণও স্পষ্ট হয়। সেজন্য বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খন্ড উদ্যোগের পরিবর্তে ধারাবাহিক ও ঐক্যবদ্ধ কাজের তাগিদই বেশি বেশি করে অনুভব করছিলাম। এই বিষয়টি নিয়ে জোট ও কমিটির মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হল যদি তেল গ্যাস কমিটি দাবিগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করতে সম্মত হয়, যদি ঐক্যবদ্ধ কাজের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকে তাহলে আমরা সেখানেই কাজ করব।

তিন.

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর সাথে তাঁর অফিসেই প্রথম আমার মুখোমুখি বসা। তাঁর পেশাগত প্রতিষ্ঠানের নাম 'শহীদুল্লাহ এন্ড নিউ এসোসিয়েটস'। 'শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানও তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে এরকম দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না যে, নিজের প্রতিষ্ঠিত নিজ নামের প্রতিষ্ঠান কেউ ত্যাগ করে অন্য আরেক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। পরে জেনেছি, সহকর্মীদের কাজের ধরন ও নৈতিক অবস্থানে বিরক্ত হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যাইহোক, আমার সাথে ছিলেন জোটনেতা ফয়জুল হাকিম লালা, শহীদুল্লাহ ভাই-এর সাথে ছিলেন কমিটির তৎকালীন সদস্য সচিব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রয়াত ডক্টর গোলাম মহিউদ্দীন। তখন কমিটির নাম ছিল 'জাতীয় স্বার্থে তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি'। নাম সংশোধন ও কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। শহীদুল্লাহ ভাই কমিটিকে ঐক্যবদ্ধ কাজের মঞ্চ হিসেবে বিস্তৃত করবার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখালেন। আমাকেই দায়িত্ব দিলেন জাতীয় কমিটির কর্মসূচি পুনরায় লিখে পরবর্তী সভায় উপস্থিত করতে। জাতীয় কমিটির মধ্যে কাজ, এর নানা বিষয়ে এর ভাষ্য নিয়ে আমার লেখালেখির সেই শুরু যা এখনও চলছে। সেসময় বাংলাদেশের গ্যাস ভারতে রফতানির তৎপরতা তুঙ্গে। সিলেটের বিবিয়ানা তখন মার্কিন কোম্পানি ইউনোকাল-এর হাতে। ইউনোকাল বাংলাদেশে এসেছে আরেকটি মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল-এর সাথে ব্যবসা বিনিময় করে। এর আগে অক্সিডেন্টাল সিলেটের শ্রীমঙ্গলের পাশে মাগুরছড়া গ্যাসফিল্ডে বড় আকারের দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। গ্যাসক্ষেত্রে নষ্ট হয়েছে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। এছাড়া প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশের ওপর আঘাতও হয়েছে ব্যাপক। এগুলোর জন্য নিয়ম অনুযায়ী কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ইউনোকাল-এর কাছে ব্যবসা বিক্রি করে অক্সিডেন্টাল বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। পেট্রোবাংলা বা জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এটা হবার কথা নয়, তারা জানিয়েছে তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। 'কিছুই না জানা' তো আরও বড় অপরাধ। জ্বালানি সচিব তখন তৌফিক ইলাহী চৌধুরী। জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে বহুজাতিক কোম্পানির আস্তানা বানানোর ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ভূমিকা যে অন্যতম তা পরে আরও স্পষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের প্রধান তৎপরতা তখন দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রফতানির পক্ষে জনমত তৈরি করা। 'গ্যাস রফতানি হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে' এরকম প্রচারণায় তখন আরও যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মন্ত্রী, আমলা, কনসালট্যান্ট, কতিপয় সংবাদপত্র। লিখে, সেমিনারে, সমাবেশে তথ্য যুক্তি দিয়ে এসব প্রচারণার মোকাবিলা ছিল তখন জরুরি কাজ। জাতীয় কমিটি দ্রুত এসব তৎপরতার আস্থাভাজন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জাতীয় কমিটির ভেতরে ও বাইরে অনেক বাম সংগঠন, বিশেষজ্ঞও সক্রিয় ছিলেন। এরমধ্যে শহীদুল্লাহ ভাইসহ মাগুরছড়া গেছি, ব্লোআউটে ক্ষতির বিস্তৃতি

বোঝার চেষ্টা করেছি, ক্ষতিপূরণের দাবি আরও জোরদার করবার পথ নিয়ে আলোচনা করেছি। শহীদুল্লাহ ভাই পরে আমার চাইতেও আরও বেশিবার ঐ এলাকায় গেছেন।

চার.

সভা সমাবেশ লেখালেখি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, ২০০০ পর্যন্ত বড় কোনো কর্মসূচি না এলেও, পাল্টা প্রচারে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্যাস রফতানি-বিরোধী তৎপরতার গুরুত্বও বাড়ছিল। সরকার সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলেও সরকারের ভেতর থেকে সমর্থন নিয়েই ইউনোকাল বিবিয়ানা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন করবার প্রস্তুতি অনেকদূর করে এনেছিল। তাদের ওয়েবসাইটে তা দেখানোও হচ্ছিল। ২০০০ সালে বিল ক্লিনটনের সফরকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার '৫০ বছরের মজুদ না রেখে আমরা গ্যাস রফতানি করব না' এই বক্তব্যে রফতানি-প্রচারকদের উৎসাহে কিছু ভাটা পড়ে। এর কিছুদিন পরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামাত সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এর কয়েকদিনের মধ্যে নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান গ্যাস রফতানির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। বলেন, 'পাট, চা চামড়া রফতানি করতে পারলে গ্যাস রফতানিতে অসুবিধা কী?' বোঝা যায়, সরকার গ্যাস রফতানির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। অতএব জাতীয় প্রতিরোধের জন্য বড় কর্মসূচির তাগিদও তৈরি হল। ঢাকার ওসমানী উদ্যানে জাতীয় কমিটির প্রথম কনভেনশন হল। ঘোষণা তৈরি ও পাঠের দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। ১০ সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অবিলম্বে গ্যাস রফতানির চক্রান্ত বন্ধ এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি চুক্তি বাতিল না করলে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষিত হল। ঢাকা থেকে সিলেটের বিবিয়ানা। সেই যে শুরু হল, তারপর লংমার্চ রোডমার্চ নামে অনেকগুলো কর্মসূচি হয়েছে। ঢাকা-বিবিয়ানা (২০০২), ঢাকা-চট্টগ্রাম বন্দর (২০০২), ঢাকা-মংলা (২০০৩), ঢাকা-টেংরাটিলা (২০০৫), ঢাকা-ফুলবাড়ী (২০০৬), ঢাকা-বড়পুকুরিয়া-ফুলবাড়ী (২০১০), ঢাকা-চট্টগ্রাম (২০১১), ঢাকা-সুনেত্র (২০১১)। সভা সমাবেশ পদযাত্রা মিছিল অসংখ্য। এরমধ্যে সময় গেল ১০ বছর। মনে হয়নি কখনো যে শহীদুল্লাহ ভাই-এর বয়স বেড়েছে। প্রথম পরিচয়ের সময় যেরকম দেখেছিলাম সেইরকমই আছেন, কখনো কখনো তাঁর শারীরিক সক্ষমতা আরও বেশি মনে হয়। এসব কর্মসূচিতে পায়ে হাঁটার বড় অংশ থাকে, খাওয়া বিশ্রাম ঘুম এগুলোরও অনিয়ম-অনিশ্চয়তা থাকে। শহীদুল্লাহ ভাইকে এসবে কখনোই ক্লান্ত দেখিনি, বরং বয়সে কম আরও অনেকের জন্য তাঁর উদ্যম লজ্জার কারণ হয়েছে। স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মোকাবিলা এবং ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকা জনপ্রতিরোধে ২০০২ এর মধ্যে গ্যাস রফতানির অপচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্যাস রফতানির চক্রান্ত দুর্বল হলেও ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ জ্বালানি সম্পদ বিষয়ে আমাদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম 'উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি বাতিল' তা হয়নি। এই চুক্তি বাতিল

না হওয়া পর্যন্ত ফাঁদ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। উন্নয়ন নীতিই এমন যে আরও নতুন নতুন শৃঙ্খল তৈরির পাঁয়তারা সর্বক্ষণ হচ্ছে। আন্দোলনও তাই একটি দুটি দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হওয়া কঠিন। আমরা বুঝি এই চুক্তি বাতিল এবং দেশ ও জনগণের জন্য জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার রাষ্ট্রের একটা গুণগত পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। সেজন্য বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিকাশ অপরিহার্য। গত ১২ বছর ধরেই শহীদুল্লাহ ভাই প্রায় বক্তৃতাতে স্পষ্ট করে বলেন, 'এসব সরকার ধনিক শ্রেণীর সরকার। তারা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদ আর লুটেরাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে।' এই আন্দোলনে তাই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পিছুটান বা অস্বচ্ছতার কিছু কখনো তৈরি হয়নি। এই আন্দোলন বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও লুটেরা শাসক-বিরোধী রাজনীতি বিকাশের পথ তৈরির ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তির রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেছে। জাতীয় কমিটিতে বিভিন্ন দল আছে, যেগুলোর প্রতি শহীদুল্লাহ ভাই বরাবর শ্রদ্ধাশীল, তাদের ওপরই ভরসা করেন, যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো অসঙ্গতি, ভুলনীতি বা সুবিধাবাদিতার লক্ষণ দেখলে, শ্রেণীচেতনার প্রশ্নে আপোষ দেখলে তার ক্ষুরধার সমালোচনা করতে একটু বিলম্ব করেন না। জাতীয় সম্পদ রক্ষার এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গত ১২ বছরে বামদলগুলোর ঐক্য ক্রমেই সংহত রূপ নিয়েছে। শুধু সকলের শ্রদ্ধাভাজন বলে নয়, পুরো আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব তিনি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবার কারণে যে গতিশীলতা তৈরি হয় সেটাই তাঁকে কেন্দ্র করে এই ঐক্যকে সম্ভব ও সংহত করেছে। এতদিন ধরে জাতীয় কমিটির মধ্যে বাম প্রগতিশীল দলগুলোর যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ও কাজ সেটা এই মঞ্চের অন্যতম সাফল্য, অন্যান্য সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। আর এর প্রধান কৃতিত্ব শহীদুল্লাহ ভাইকেই দিতে হবে।

পাঁচ.

জাতীয় কমিটির সঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞ সরাসরিই যুক্ত। শহীদুল্লাহ ভাই নিজে প্রকৌশল শাস্ত্রে শুধু পণ্ডিত নন, তিনি যে শাখায় অসাধারণ কৃতিত্ব নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই শাখার বহু প্রজন্মের মধ্যে তিনি সর্বজনের গুরু হিসেবে স্বীকৃত। পুর-প্রকৌশলী হিসেবে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা এখন কিংবদন্তীর পর্যায়ে। শাস্ত্রবিদ্যা থাকলেই কোনো ব্যক্তির জ্ঞান বা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করা যায় না; শাস্ত্রে বিদ্যা ঐ ব্যক্তি কী কাজে ব্যবহার করতে চায়, ঐ বিদ্যা তার মানসিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কিনা, জ্ঞান তার কাছে নিছক পুঁজি নাকি জগৎ ও মানুষকে উপলব্ধি কিংবা তাদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে– ইত্যাদি সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির মতাদর্শিক অবস্থানের ওপর। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে শহীদুল্লাহ ভাই-এর প্রখর রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সমৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ অন্যতম অবলম্বন থেকেছে।

শহীদুল্লাহ ভাই-এর ধরনটিই হল এমন যে কোনোকিছুই বিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গ্রহণ করা যাবে না, জনপ্রিয় হলেই তার পেছনে ছোটা যাবে না, অবশ্যই প্রতিটি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তথ্য যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে তা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আন্দোলন তাই কখনোই হাওয়ার ওপর অস্বচ্ছতা বা মুহূর্তের উত্তেজনা দিয়ে পরিচালিত হয়নি। ২০০২-৩ সময়কালে চট্টগ্রাম বন্দর জালিয়াত মার্কিন কোম্পানির হাতে তুলে দেবার কয়েক বছরের চক্রান্ত নিয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। এই মনোযোগ দেবার চাপ আসে প্রধানত বন্দরশ্রমিকদের থেকেই। তারাই দেশের এক বড় বিপদ কয়েকবছর ধরে এককভাবে মোকাবিলা করছিলেন। বিদ্যুৎ বিষয়ও যোগ করবার তাগিদ এল। কমিটির নাম সম্প্রসারণ করতে হল– 'তেল গ্যাস ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। বন্দর নিয়ে লেখালেখি সভা-সমাবেশ যখন যথেষ্ট মনে হল না তখন ঢাকা-চট্টগ্রাম বন্দর লংমার্চের কর্মসূচি চূড়ান্ত হল। শহীদুল্লাহ ভাই সার্বক্ষণিকভাবে একদিকে আইনি লড়াই অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলন বিষয়ে খোঁজখবর রাখছিলেন। গ্যাস রফতানি প্রকল্পে ব্যর্থ হবার পর সরকার-বিশ্বব্যাংক-টাটা-ঠিকাদার গবেষকদের নতুন প্রস্তাবনা হাজির হয় টাটা প্রকল্প হিসেবে। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে টাটার প্রকল্পগুলোকে মোকাবিলা করেই আমাদের অনেক কর্মসূচি নিতে হয়। এগুলো নিয়ে টেকনিক্যাল একাডেমিক বিতর্ক এবং সেই সঙ্গে জনমত গঠনের জন্য একের পর এক কর্মসূচি দিতে হয়। টাটার প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল স্টিল মিল, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট এবং কয়লাখনি। স্টিল মিল ও বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য তাদের দাবি ছিল ২০ বছরের জন্য একটানা নির্দিষ্ট দামে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি। যে দামে বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে আমরা গ্যাস কিনি তার থেকে অনেক কম দামে গ্যাস দাবি করছিল তারা। গ্যাস দিয়ে উৎপাদিত স্টিল ও বিদ্যুৎ রফতানিরও পরিকল্পনা ছিল তাদের। বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল এরকম যে, গ্যাস রপ্তানি বন্ধ হল, কিন্তু গ্যাসভিত্তিক পণ্য রফতানির জন্য ভর্তুকিতে গ্যাস সবরাহের আয়োজন শুরু হল। এক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। টাটার কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞরা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর অফিসে এসেছেন। উল্টো যুক্তির মুখে পরাজিত হয়ে বিদায় হয়েছেন। ২০০৫ সালে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটল টেংরাটিলায়। এবারে কানাডার কোম্পানি নাইকো। মাগুরছড়ার মতোই যথারীতি সরকার পক্ষ বলতে থাকল ক্ষতি তেমন কিছু হয় নাই। সরকারি তদন্ত কমিটি যেখানে গ্যাস নষ্টের পরিমাণ জানাল ৩ বিলিয়ন ঘনফুট, বেসরকারিভাবে গঠিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি গণতদন্ত কমিশন দেখল যে কমপক্ষে ২৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নষ্ট হয়েছে। আমাদের সোচ্চার হতে হল এই ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে। নাইকোর সাথে পুরো চুক্তিটাই সরাসরি দুর্নীতির ফল। এটি নিয়ে অনেক সেমিনার প্রকাশনা ছাড়াও আমরা টেংরাটিলামুখি রোডমার্চও করলাম।

ছয়.

পল্লী বিদ্যুৎ নিয়ে সারাদেশে কমবেশি বিক্ষোভ চলছিল। এই বিষয় নিয়েই ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে কানসাটে একের পর এক জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ জনগণের ওপর পুলিশ এবং স্থানীয় এমপি-র মাস্তান বাহিনীর আক্রমণ চলে বিরতিহীনভাবে। পরপর কয়েকটি সংঘাতে, গ্রাম পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর বর্বর হামলা ও গুলিতে কিশোরসহ ২০ জনেরও অধিক মানুষ শহীদ হন। প্রতিবাদ ছাড়াও ঢাকায় আমরা একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করি। এই তদন্ত কাজের জন্য শহীদুল্লাহ ভাই-এর নেতৃত্বে আমরা রওনা হই তাঁর মাইক্রোবাসে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সভা বিকেলে, তার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে। করটিয়ার পর টাঙ্গাইলের কাছে এসে মাইক্রোবাস নষ্ট হল। পথে থেকে কোনো বাসেই উঠা গেল না। টাঙ্গাইল পর্যন্ত গিয়ে তবে বাস পাওয়া যেতে পারে। শহীদুল্লাহ ভাই সহ আমরা মহাসড়ক ধরে হেঁটেই রওনা দিলাম। হাঁটার কোনো জায়গা নেই, বাস যেকোনো সময় ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। বাসট্রাক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে করতেই যাচ্ছি আমরা। শহীদুল্লাহ ভাই বললেন, 'সড়ক ডিজাইনের এই হল গণবিরোধী চেহারা। মানুষ যে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে তার কোনো বিবেচনাই নাই। হেঁটে টাঙ্গাইল বাইপাস মোড়। বাস পাওয়া গেল না। টেম্পোতে এলেঙ্গা। সেখানে এক দুর্বল ভিড়াক্রান্ত বাসে ঠেলেঠুলে কোনোরকম উঠলাম। সেই ভিড় ধাক্কাতেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানিব্যাগ উধাও হল। পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যায়। কানসাটে গেলাম, গোলাম রব্বানীসহ অনেকের সাথে কথা বললাম। পরদিন শহীদদের বাড়িতে বাড়িতে। স্বজনহারানো মানুষদের সামনে দাঁড়ানো কঠিন। নিহত প্রায় সকলেই শ্রমজীবী পরিবারের কিশোর তরুণ। কারও মা, কারও স্ত্রী, কারও সন্তান পেছনে, সর্বস্বহারা অবস্থায়। শুধু বেদনা নয় এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তার মধ্যে সবাই। বেদনা, ক্ষোভ আমাদের মধ্যেও। শহীদুল্লাহ ভাই আরও বেশি বিষণ্ন। কারণ জানলাম, তাঁর পকেট থেকে যে মানিব্যাগ খোয়া গেছে তাতে তিনি ১৫ হাজার টাকা রেখেছিলেন এই শোকাহত অনিশ্চিত না-খাওয়া পরিবারগুলোর হাতে দেবার জন্য।

সাত.

উন্মুক্ত খনি কেন কোনোধরনের খনি সম্পর্কেই আমার কোনো পূর্ব-প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কিংবা উত্তরাঞ্চলের কয়লা নিয়ে ধারণা ছিল আবছা। প্রকৌশল বিদ্যার সূত্রে শহীদুল্লাহ ভাই এর কারিগরি দিক জানতেন, তারপরও উন্মুক্ত খনির বিপদ সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল না। ২০০৫ সালের জুলাই আগস্ট মাসে আমাদের সাথে দেখা করলেন ফুলবাড়ীর একটি প্রতিনিধিদল। তাঁদের বক্তব্য বললেন, কাগজপত্র দিলেন। তাঁরা ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি নামে একটি বিদেশি কোম্পানির উন্মুক্ত কয়লাখনির প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের

বক্তব্য, এই খনি হলে এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হবেন, আবাদি জমি বিনাশ হবে। পরিশ্রম করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে স্থানীয় জাতীয় গণফ্রন্ট ও তাদের কৃষক সংগঠন। সর্বদলীয় ভিত্তিতে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা নিয়মিত সভাসমিতি করছে। ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির মধ্যে ডান-বাম সব রাজনৈতিক দল আছে কিন্তু তারা ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট বা বিরোধী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগ করেছেন- কেউ সাড়া দেয়নি। সবশেষে তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। সাধারণভাবে আমরা জানতে অভ্যস্ত যে, উন্নয়নের জন্য কয়লা উত্তোলন দরকার, খনি দরকার। স্থানীয় জনগণ যে এর বিরোধিতা করছেন তার যুক্তি কতটা সে সম্পর্কে আমরা সাথে সাথে নিশ্চিত হতে পারিনি। উন্নয়নের জন্য কিছু ক্ষতি তো স্বীকার করতেই হবে। তাহলে এই আন্দোলনে যতই এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ থাকুক তাতে সমর্থন দেয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে?

শহীদুল্লাহ ভাই যথারীতি সকল তথ্য যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে নিজে অবস্থান নিতে রাজি নন। আমাদের সভায় সিদ্ধান্ত হল যে, এ বিষয়ে আমরা নিজেরা অনুসন্ধান করে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করব। শহীদুল্লাহ ভাই প্রথমে নানা জায়গায় যোগাযোগ করলেন, হল না। তাঁর সঙ্গে আমিও ভূতাত্ত্বিক জরিপ সহ সরকারি বিভিন্ন দফতরে গেলাম, অনেকের সাথে আলোচনা করলাম। কিন্তু সরকারের কোনো দফতরেই ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে কোনো কাগজপত্র নেই, সরকারের কোনো সমীক্ষা বা মূল্যায়ন এমনকি কোনো সারসংক্ষেপও নেই। কর্মকর্তাদের কোনো পরিষ্কার ধারণাও নেই। কীভাবে তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব? হাল তো ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ সরকারি দফতরে কাগজপত্র থাকে না, জনগণ কিছুই জানেন না, কিন্তু ঠিকই জনগণের জীবন সম্পদ নিয়ে ভয়াবহ চুক্তি হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, অবস্থানও নিতে হবে। শেষ উপায় হচ্ছে, এশিয়া এনার্জির কাগজপত্রই ভালোভাবে পরীক্ষা করা। আমার ওপর মূল দায়িত্ব পড়ল। এশিয়া এনার্জির সব দলিলপত্র পরীক্ষা করেই আমি নিশ্চিত হলাম ফুলবাড়ীর জনগণ খুবই সঠিক অবস্থান নিয়েছেন। বিপদ শুধু তাদেরই নয়, বিপদ সারা বাংলাদেশেরই। যে শর্তে এই প্রকল্প হতে যাচ্ছে এবং যে পদ্ধতিতে কয়লা তোলার প্রস্তাব দিয়েছে একটা বিদেশি কোম্পানি, তাতে আবাদি জমি মাটি পানি মানুষ সবই ধ্বংস হবে; কয়লা বা তার দামও বাংলাদেশ পাবে না। এশিয়া এনার্জির দলিলপত্র এবং আমিনুল ইসলাম বাবলুসহ স্থানীয় সংগঠকদের সংগৃহীত অঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ২০০৫ সালের অক্টোবরে রচিত হল 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: কার লাভ কার ক্ষতি?' শহীদুল্লাহ ভাই দেখার পর ঢাকায় বিশেষজ্ঞদের সামনে এটা উপস্থাপন করে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান আরও সুনিশ্চিত হল ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প অবশ্যই বাতিল করতে হবে। আর জালিয়াত ভূঁইফোড় কোম্পানি এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার করতে হবে। আমাদের অবস্থান নিশ্চিত হবার পর জাতীয় কমিটির

তৃতীয় দফা নাম পরিবর্তিত হল– 'খনিজ সম্পদ' যুক্ত হল, নাম দাঁড়াল– 'তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। এই নামই এখন পর্যন্ত বহাল আছে। শহীদুল্লাহ ভাই, আমি এবং ডক্টর শামসুল আলম ফুলবাড়ীতে গেলাম ২০০৫ সালে ডিসেম্বরে। এরপর আমরা কতবার ফুলবাড়ী গেছি তার সংখ্যা গণনা কঠিন হবে। লড়াই চলেছে চলছে বহুভাবে। দুর্বৃত্ত বিশ্বজোটের তৎপরতা মোকাবিলায় বহুদিকে কাজ করতে হয়েছে, হচ্ছে। একদিকে পুলিশ বিডিআর সেনাবাহিনী হামলা মামলা হুমকি অন্য দিকে অবিরাম তথ্য-যুক্তি-তাত্ত্বিক লড়াই। মোটাতাজা ভাড়াখাটা 'বিশেষজ্ঞ' দেশি-বিদেশি প্রচারমাধ্যমকে মোকাবিলা করতে হয়েছে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।

আট.

তথ্য, যুক্তি এবং সজাগ জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট। ঐদিন এশিয়া এনার্জি ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচি দেবার কারণ একদিকে এই প্রকল্প সম্পর্কে সরকার স্পষ্ট করে কিছু না বললেও এশিয়া এনার্জি নানাধরনের তৎপরতা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। জনগণের বিরোধিতার মুখে দালাল তৈরির জন্য তারা দুর্নীতি-ঘুষ তৎপরতা শুরু করে। মানুষের কথা ছিল এই জালিয়াত কোম্পানির কাজ আর বাড়তে দেয়া যাবে না, দিলে সর্বনাশ হবে। ২৬ আগস্ট চারিদিকে পুলিশ-র‍্যাব ঘেরাও দিয়ে মানুষের ঢল ঠেকানোর চেষ্টা করলেও প্রায় ৮০ হাজার বাঙালি-আদিবাসী জড়ো হন সেদিন। শহীদুল্লাহ ভাই ও আমি সবসময় একসাথেই ছিলাম। মানুষের মধ্যে সেদিন ছিল প্রাণের প্রকাশ, যেন ঐক্য ও প্রতিরোধ সৃষ্টির উৎসব। সেই অনুভূতির প্রকাশ শহীদুল্লাহ ভাই-এর মুখেও দেখেছি। কিন্তু শত্রুপক্ষ জনগণের প্রাণের প্রকাশ দেখতে রাজি নয়, শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ করলেও তারা গুলি চালাল। গুলিতে ৩ জন তরুণ নিহত, ২০ জন গুলিবিদ্ধ, ২ শতাধিক জখম হবার পরমুহূর্ত থেকে ৩০ আগস্ট ফুলবাড়ীসহ ৬ থানার মানুষের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অসাধারণ পর্ব তৈরি করে। পুরো দেশ পাশে এসে দাঁড়ায়। ৩০ আগস্ট সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। চারদলীয় জোট সরকার সারাদেশে উন্মুক্ত পদ্ধতি নিষিদ্ধ এবং এশিয়া এনার্জি বহিষ্কারের দাবি মেনে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

এর কয়েক মাসের মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার এক পর্যায়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। শুরু হয় একদিকে নতুন উদ্যমে কোম্পানির তৎপরতা, আর অন্যদিকে তাদের মোকাবিলায় আমাদের বিভিন্নমুখি কর্মসূচি। জরুরি অবস্থা জারির পরপরই এশিয়া এনার্জি তার ওয়েবসাইটে উল্লাসের সঙ্গে এইমর্মে ঘোষণা দেয় যে, 'এখন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। এখন শীগগিরই ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।' সামরিক বাহিনী ফুলবাড়ী গিয়ে অন্যতম সংগঠক এস.এম. নূরুজ্জামানকে

প্রকাশ্যে বাজারে বর্বরভাবে মারধর করে আটক করে। কয়েকজন প্রাক্তন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে অনেকগুলো ভূঁইফোঁড় সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ' উন্নয়নের নামে এই প্রকল্পের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। নতুন ও পুরনো দালালগোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠে। বুঝতে পারি আমরা যুদ্ধের আরেক পর্বে প্রবেশ করেছি। জরুরি অবস্থায় যখন অন্য সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ তখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে দালালগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের নামে উন্মুক্ত খনি আর ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একের পর এক ব্যয়বহুল আলোচনা সভা শুরু করে, দামি কাগজে ব্যয়বহুল প্রচারণা চালাতে থাকে। এসব তৎপরতার নেতৃত্বে ছিল এমনসব লোক যারা উত্তরবঙ্গে গ্যাস সরবরাহ না করে বাংলাদেশের গ্যাস দ্রুত ভারতে রফতানির পক্ষে ওকালতি করেছিল। জরুরি অবস্থা তাদের বড় সুযোগ। নানা প্রতিবন্ধকতা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমরাও পাল্টা কর্মসূচি শুরু করলাম। পরপর কয়েক মাস শহীদুল্লাহ ভাইসহ চলল আমাদের সফর। কখনো কখনো শহীদুল্লাহ ভাই-এর মাইক্রোবাসে দিনের পর দিন। উত্তরবঙ্গের যেখানে যেখানে তারা ভুল তথ্য আর প্রচারণা চালাচ্ছে সেখানে সেখানেই আমরা গেলাম। একটানা সফর– একটানা কথা, ঝুঁকি কোনোকিছুর চাপই শহীদুল্লাহ ভাইকে দমাতে পারেনি। পরিষ্কার দেখলাম সঠিক তথ্য ও যুক্তিগুলো জনগণের সামনে একবার উপস্থিত করলে অর্থলোভ বা ভয় কোনোকিছুই তাদেরকে পরাজিত বা বিভ্রান্ত করতে পারে না। কতভাবে ভুল তথ্য ও যুক্তি হাজির করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করতে আমাদের নানাদিক অনুসন্ধান করতে হয়েছে, অসংখ্য সভায় বসতে হয়েছে। এগুলো এখনও চলছে। শহীদুল্লাহ ভাই ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতি ও উন্মুক্ত পদ্ধতির নানা দিক নিয়ে কাঠামোগত সমস্যাসহ টেকনিক্যাল বিষয়াদি পরিষ্কার করে গত কয়েক বছরে অনেকগুলো লেখা লিখেছেন, মোকাবিলা করেছেন ভাড়াটে প্রচারণা। প্রত্যক্ষভাবে বোঝার জন্য নিজ উদ্যোগে ভারতের কয়েকটি খনি পরিদর্শন করেছেন। ঢাকা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন আমাদের ধারণাকে আরও স্বচ্ছ করেছে। এগুলো খণ্ডন করার ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। শহীদুল্লাহ ভাই বলেন, 'আমাদের ন্যায্য নৈতিক অবস্থানই আমাদের প্রধান শক্তি।'

নয়.

প্রকৌশল শাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত গুরু হলেও প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শুধুমাত্র সেখানেই নিজেকে সীমিত রাখেননি, বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম ইতিহাস রাজনীতিশাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। মানুষ ও সমাজকে উপলব্ধি এবং সবরকমের আধিপত্য শোষণ ও নিপীড়ন থেকে এই সমাজকে মুক্ত করবার আগ্রহের কারণে নিজের জ্ঞানের পরিধি আরও গভীর করতে তিনি এখনও সদা-যত্নশীল। পাঠ, অভিজ্ঞতা ও মনোযোগের এই ব্যাপ্তি তাঁকে সক্ষম করে তোলে যে কোনো বিষয়কে একটি

সামগ্রিকতার ভেতর উপলব্ধি করতে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহু কর্তাব্যক্তির ভুল বা প্রতারণা উন্মোচন করতে। এরসঙ্গে মানুষ ও সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা তাকে তাঁর জ্ঞানচর্চাকে ব্যক্তির চাইতে বৃহত্তর প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত করতে সাহায্য করে। সেকারণেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্তৃত্ব বরাবর বাংলাদেশের মানুষেরই কাজে লাগছে। অসংখ্যবার আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফরে গেছি। বাস, মাইক্রোবাস, ট্রেন, লঞ্চ। যেতে-আসতে জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেমন আলোচনা হয়, তেমনি আলোচনা হয় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, নদীর ভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক, জলবায়ু, আবাসন সমস্যা, রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস। তাঁর পাঠের কোনো সীমা নেই। কুরআন-হাদিস খুব ভালো জানেন, আরবি ভাষাতেও তাঁর দখল আছে। সুতরাং এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা খুবই আকর্ষণীয়। শহীদুল্লাহ ভাই খুবই মনোযোগী পাঠক। তাঁর অধ্যয়নের পদ্ধতি খুবই নিবিড়। সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বিতর্ক বা তথ্যাবলিও তাঁর মনোযোগের বাইরে নয়।

শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতে করতে, বিস্ময় এবং মুগ্ধতার সঙ্গে তাঁর কঠিন মনোবল, সংযম, শৃঙ্খলা ও সক্ষমতাও দেখি। যেকোনো স্থানে যেকোনো পরিবেশে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, যেকোনো খাওয়া তাঁর পক্ষে হজম করা সম্ভব, যেকোনো যানবাহনে তিনি চলাফেরা করতে পারেন, পুকুর বা দিঘি বা নদীতে সাঁতরে নিতে পারেন। বিপ্লবী নেতা হবার পূর্বশর্ত হিসেবে আমরা শুনি শ্রেণীচ্যুতির কথা। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক বাম নেতার মধ্যে যা দেখিনি তা পেয়েছি শহীদুল্লাহ ভাইয়ের মধ্যে। শহীদুল্লাহ ভাই আপাত দৃষ্টিতে খুবই সোজা-সাপটা, কঠিন, প্রকৌশল বিদ্যার মতোই ছক-মাপ-কাঠামোবদ্ধ। কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, তাঁর জীবনের প্রধান পরিচালিকা শক্তি মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। গভীর সংবেদনশীলতাই তাঁকে হাড়ভাঙা খাটুনি আর একগুঁয়ে রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতায় নিয়োজিত রাখে। নিজের জীবন নিয়ে কিংবা যে কোনো বিষয়ে নিজের মত দ্বিমত বিরক্তি ক্রোধ প্রকাশে তিনি সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য। নিজের জীবনের অনেক বিষয়, বিভিন্ন ঘটনাবলি, কিংবা সহযোদ্ধার বক্তব্য সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশে তার নিঃসংকোচ ধরন অনেক সময় অস্বস্তিকর পরিবেশও তৈরি করে। আমি কখনো কখনো বলেছিও তা। তিনি বলেন, 'আমার করার কিছুই নাই, আমি সবকিছুই স্বচ্ছ রাখতে চাই।'

দশ.

তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। রেকর্ড নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব, প্রকৌশলী হিসেবে দেশ-বিদেশে সফর ও বিরল সাফল্য, গোপন বিপ্লবী পার্টির ইশতেহার ছাপিয়ে পৌঁছে দেবার সময় গ্রেফতার ও জেলারসহ পাকিস্তানি সামরিক

শাসকদের প্রতিনিধিদের মোকাবিলা করে জেলখানায় মাথা উঁচু করে কঠিন সময় পার করা, মুক্তিযুদ্ধে দুইভাইকে হারানো, পেশাগত ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ঐক্য সংঘাত, বিপ্লবী রাজনীতির ওঠানামা ও নানা দুর্বলতা সংকট সত্ত্বেও নিজ অবস্থান থেকে সার্বক্ষণিক সহযোগীর ভূমিকা পালন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, জানতে চান, জনশত্রু কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করতে চান এই বলে যে, জাতীয় কমিটির অর্থের উৎস কী? শত্রুপক্ষ জাতীয় কমিটির কার্যক্রমে অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনায় ক্রুর হাসি হাসে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কমিটির বিভিন্ন কাজে যারা জড়িত তারা সকলেই অংশগ্রহণ করেন নিজ অর্থব্যয় করে, শ্রম দেন সময় দেন নিজের বুঝ বা রাজনৈতিক তাগিদ থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষী পেশাজীবী কেউ কেউ নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে চাঁদা দেন। বড় বড় কর্মসূচিতে খরচের বৃহৎ অংশ আসে অংশগ্রহণকারীদের থেকেই। এই ২০১০-১ সালেই আমরা তিনটি রোডমার্চ ও লংমার্চ করেছি, এগুলোতে যতসংখ্যক মানুষ বিশেষত তরুণ ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল তাদের আমরা নিতে পারিনি থাকা-খাওয়ার সীমিত ব্যবস্থার কারণে। যারা গেছেন তারা সকলেই চাঁদা দিয়েই অংশগ্রহণ করেছেন। এই টাকাই ব্যয়ভারের বড় অংশ। বিভিন্ন অঞ্চলে খাওয়া-থাকার ব্যয়নির্বাহ করেছেন অঞ্চলের সংগঠন। এদেশের যে নাগরিকেরা এদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান শিকার সেই শ্রমজীবী মানুষদের থেকেই অনেক চাঁদা আসে বিভিন্ন কর্মসূচিতে। অনেকগুলো কাজ শরিক রাজনৈতিক দল নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে সম্পন্ন করে। তারপরও ঘাটতি থাকে, আগে আরও বেশি থাকত, এখন পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। সেই প্রয়োজনীয় কিন্তু ঘাটতি খরচের বড় অংশ বহন করেন প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি নিজেই অনেকসময় অন্যদের ওপর ভার কমিয়ে নিজের ওপর ভার টেনে নেন। আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করি, জোর দেই দল ব্যক্তি সকলের অংশগ্রহণের ওপর, তিনি তাতে নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ একমত। তারপরও বলেন, 'ওদের সবার সাধ্য নাই, অন্যান্য কত খরচ আছে তাদের!' আমরা পরিষ্কার দেখি, তাঁর আয়ের প্রতিটি টাকা তাঁর পরিশ্রমের। যে পেশায় তিনি আছেন তাতে উঁচু বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দরকার হয়, কিন্তু তা দিয়েই কাজ হয় না, অফিসে বসেও কাজ শেষ হয় না। এগুলো তো লাগেই, উপরন্তু দরকার হয় হাটে মাঠে ঘাটে শহরে প্রান্তরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-শীত উপেক্ষা করে কাজ করা। যেখানে পেশাগত এই কাজ সেখানেই ছুটে যেতে হয়, 'ফিল্ডে'। ক্লান্তিকর কয়েকদিনের সফর শেষে একসাথে ফিরে পরদিনই অনেকবারই শুনেছি শহীদুল্লাাহ ভাই ঢাকার বাইরে কোথাও রওনা হয়েছেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর এসব সফর অনেকসময় বেআরাম বাসেই সারতে হয়। রাতের কোচ-ধরতে হয় প্রায়ই। জাতীয় কমিটির কাজ তিনি যখন শুরু করেন তখনই তাঁর বয়স প্রায় ৭০। আর এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জাতীয় কমিটির জন্য সময় ও অর্থ দুটোরই বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়। প্রবল অঙ্গীকারের কারণেই এই

বয়সেও সময় ও অর্থ দুটোরই ভার তিনি গ্রহণ করেন, সেই ভার এখনও বহন করে যাচ্ছেন। শুধু জাতীয় কমিটির বাজেট ঘাটতি মেটানো নয় অন্যান্য সকল তৎপরতা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যেকোনো উদ্যোগ, মানুষের মুক্তির নানামাত্রার লড়াই, দখল নিপীড়ন বৈষম্য-বিরোধী সকল তৎপরতায় তিনি যে অর্থযোগান দেন সবই তার নিজের রক্ত-ঘামের উপার্জন।

এর জন্য তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, দেশজুড়ে ছোটাছুটি করতে হয়। আবার জাতীয় কমিটির কাজেও অনেক সময় দিতে হয়। নিজের মেধা, সময়, দিবারাত্রি শ্রম এবং কষ্টার্জিত অর্থ সবকিছুই দেশ ও জনগণের জন্য একইভাবে নিবেদনের এরকম আর কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

এগার.

আমাদের দেশে শ্রমদান বয়সের উচ্চসীমা ৬৫ বছর। ধরা হয় এই বয়সের পর সবাই বিশ্রামে থাকবে। সন্তান-সন্ততি নিয়ে অবসর যাপনেই সময় কাটবে। কিন্তু এই দেশে এই বয়সের পরও যারা বেঁচে থাকেন, সক্ষমতা থাকুক আর না-ই থাকুক, তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্য কঠিন শ্রমকাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। পুত্রকন্যা তাঁদের ভার গ্রহণ করেন না, তাদের সম্পদ সঞ্চয়ও থাকে না। শহীদুল্লাহ ভাই-এর অবস্থা সেরকম নয়। তিনি বসে থাকলেও তাঁর খাওয়া-পরা এমনকি আয়েশের সঙ্গে দেশবিদেশে অবসর কাটানোর উপায় আছে। যোগ্য সন্তানেরা দেশে-বিদেশে আছেন। নিজের চলার মতো অবস্থা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি তা করেননি।

সময় ও শ্রমের এতসব চাপের পরও ঢাকা মহানগরী কিংবা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যদি অনুরোধ আসে তাহলে অন্যকোনো কাজের বাধ্যবাধকতা না থাকলে শহীদুল্লাহ ভাই তাতে সাড়া দেবেনই। সেটা জলাবদ্ধতা নিরসন হোক, ক্ষেতমজুর সমাবেশ হোক, কোনো সংগ্রামী মানুষের স্মরণসভা হোক, কোনো অন্যায়বিরোধী প্রতিবাদসভা হোক তাতে শহীদুল্লাহ ভাই উপস্থিত থাকতে সদাপ্রস্তত। তাঁর যুক্তি–ওদের উৎসাহ দেয়া দরকার । ওরা পরিশ্রম করছে, এই কাজ হতে হবে। শরীরের অক্ষমতা কিংবা অসুস্থতাকে কোনো কাজের পথে বাধা হতে দিতে রাজি নন তিনি। এজন্য, আমার মনে হয়, তিনি অনেকসময়ই নিজের শারীরিক সমস্যাকেও চাপা দিয়ে কাজে অংশ নেন। অসুস্থতার কথা জানান না, নিজের শরীরের ওপর মানসিক বলপ্রয়োগ করে ঠিকই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সেই কাজ দূরে কোথাও যাওয়ার ব্যাপার হোক কিংবা রোদ বা বৃষ্টিতে মিছিল, যা-ই হোক না কেন। মিছিল করতে গিয়ে বৃষ্টি এলে সবাই সরে গেলেও তিনি সরে যেতে রাজি নন। কারণ মিছিল ঠিকমতো শেষ করতে হবে। শহীদুল্লাহ ভাই-এর জীবন কখনোই আয়েশি জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন ছিল না। কষ্টসহিষ্ণু এই অবিচ্ছিন্নতা তিনি সচেতনভাবে বজায় রেখেছেন। এটাই তাঁর জীবন, এটাই তাঁর আনন্দ। তিনি যখন মানুষের কথা বলেন, দেশের কথা বলেন তখন

মা সম্পর্কে কথা টেনে আনেন বহুবার। মানুষকে কট্টর কঠিন সত্য বোঝাতে কবিতা-গল্প বলেন। অনুভব করা যায়, দেশ ও মানুষের সাথে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। প্রকৌশলশাস্ত্রের কাষ্ঠবিদ্যার মানুষ কথা বলতে গিয়ে কঠিন থাকতে চাইলেও হৃদয়ের টান মাঝেমধ্যেই আবেগ আকারে প্রকাশিত হয়। মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসাই নিষ্ঠুর জগতের চালক লুটেরা নির্যাতক সুবিধাভোগীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা আনতে পারে। এই ভালোবাসাই তৈরি করে শহীদুল্লাহর মতো একগুঁয়ে অবিশ্রামী নির্ভয় অক্লান্ত নির্মোহ সংগ্রামী বিস্ময়। এইদেশ এইখানে থাকবে না, আত্মমর্যাদা ও মালিকানার এই লড়াই আরও বহু লড়াই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দেশকে মানুষের সমাজে নিয়ে যাবে। বৈষম্য-নিপীড়নমুক্ত সাম্যের এক স্বাভাবিক জগতে মানুষ নিজেকে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে। জীবন ও সম্পদের ওপর এই দেশের মানুষ তার পূর্ণ কর্তৃত্ব পাবে। শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেই সমাজ নির্মাণের চিন্তা ও লড়াই-এর অসামান্য নেতা-সংগঠক-কারিগর হিসেবে চিরস্মরণীয় থাকবেন।

ডিসেম্বর ২০১১ – জানুয়ারি ২০১২

এক আজীবন প্রতিবাদী মুখ: শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

....

শু ভ কি ব রি য়া

জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার শক্তির জায়গাটা কী? প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমি বিবেকানন্দের সেই লাইনটাকে খুব পছন্দ করি,' 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

পাল্টা প্রশ্ন করলাম পুনর্জন্ম হলে আবার কি প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ-ই হতে চান? খুব জোর দিয়েই বললেন ওসবে বিশ্বাস নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি পেশাগত জীবনে যা করেছি তা ট্যানজিবল, দেখা যায়। সেদিক দিয়ে পেশা হয়তো ওটাই নিতাম। আর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় জীবনে আরো আগে থেকে আসা উচিত ছিল।

একটু দেরি হয়ে গেছে। ১৯৬৫ সালে আমি যখন কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হই তখন আমার বয়স চৌত্রিশ বছর।

ছাত্ররাজনীতি করিনি। কিন্তু আমাদের সময় যারা যারা কমিউনিস্ট ছাত্র ছিলেন তারা যে আমাকে রাজনীতির কথা বলেননি তা নয়। আমি তো ভালো ছাত্র ছিলাম। আর ভালো ছাত্র মানে হচ্ছে রাজনীতি না-করা (হাসি)। তাই রাজনীতিতে দেরিতে এসেছি। পরের বার জন্মালে এই ভুল আর হবে না। আরো কম বয়সেই রাজনীতিতে জড়াব। কনস্ট্রাকশন বিজনেসে গিয়ে পেশাগত জীবনেও কিছু পণ্ডশ্রম হয়েছে। ওটাতে যদি না যেতাম তাহলে খুব ভালো হত। সে বিবেচনায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই হতে চাইতাম। রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় এখন যা আছি তাই থাকতাম। তবে আরও আগে জড়াতাম।

প্রশ্নটা পাল্টালাম, এই যে এত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছেন, হতাশা আসে না? প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ তার বিখ্যাত হাসিটা ধরে রেখেই বললেন, হতাশা জিনিসটা যে কোনো মানুষেরই পুরোপুরি ত্যাগ করা উচিত। এরপর মহাভারতের কাহিনী টেনে বললেন, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে, 'আমরা কি এই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে জিতব? আপনি কি আশাবাদী?' শ্রীকৃষ্ণ বলল, 'বাছা' কর্মে তোমার অধিকার। ফলে অধিকার নাই।'

আমি মনে করি যে, কর্ম করে যাওয়াতেই আমার আনন্দ। ফল কতদূর লাভ হল, কি হল না, সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিস্পৃহ, উদাসীন থাকা উচিত। একজন মানুষ সৎকর্মে নিয়োজিত থাকলে তা থেকেই সে আনন্দ পাবে। এটাই তার ফল লাভ। অন্য কী কী লাভ হল তার হিসাবের কোনো দরকার নেই। আনন্দবোধটা আমাদের কর্মের থেকে আসবে, ফলের থেকে নয়। অতএব হতাশার কোনো প্রশ্ন আসবে না।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পুরো জীবনে এই বিশ্বাস কর্মে পরিণত করেছেন। সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ কঠিন, কঠোর, আপসহীন দৃঢ়তায় জীবনরথ নিজের হাতে চালিয়েছেন। খুলনার দৌলতপুরের এক শহরতলি থেকে দারিদ্র্য আর কঠোর জীবনসংগ্রামকে উতরে তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির প্রাণপ্রদীপ হয়ে দেশের সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎস হয়ে আছেন।

প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ'র দুই জীবন। এক তার পেশাগত প্রকৌশলী জীবন। সেখানে তিনি অনন্য মেধায়, অসাধারণ দক্ষতায়, সততা, নিষ্ঠা ও শ্রমে দেশের প্রকৌশলী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেকে আসীন করেছেন। ঢাকা মহানগরসহ দেশের নানা প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বৃহৎ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনার স্ট্রাকচারাল শক্তি গড়ে উঠেছে প্রকৌশলী শহীদুল্লাহর মেধা ও মননে। আজও দেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভবনে, যে কোনো বড় স্থাপনায় ফাটল ধরলে, বিপন্ন হলে তার প্রকৌশলগত সুরক্ষায় শেষ ভরসার দেশি মানুষ হলেন প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ। বাংলাদেশের

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জগতে প্রকৌশলী শহীদুল্লাহর অবদান এত সূক্ষ্ম মেধার, এত ব্যাপক, এত

বিস্তৃত, এত চ্যালেঞ্জিং সমস্যা তিনি সমাধান করেছেন সেটির বর্ণনার জন্য দরকার একটি আলাদা বড় পরিসর।

দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৭৯ শতাংশ নাম্বার পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তখনকার অধ্যক্ষের অসহযোগিতার কারণে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেননি। চলে গেছেন মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে। মাঠ পর্যায়ের কাজ তাকে আরও ঋদ্ধ করেছে। আরও ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, যোগ্য করে তুলেছে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পেশাগত জীবনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দেননি নীতিগত কারণেই। আর্থিকভাবে সৎ থাকতে চেয়েছেন। আবার পরিবারকে সহায়তা করতে হবে বলে ভালো উপার্জন চেয়েছেন। এই দুই চাওয়ার সফল প্রয়োগ ঘটেছে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগের মধ্যে। দেশের কৃতবিদ্য স্থপতি মাযহারুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে 'বাস্তুকলাবিদ' নামে স্থাপত্য-প্রকৌশল উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচর্যাতেই গড়ে উঠেছে চারুকলা ইনস্টিটিউট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং ভবন। মাযহারুল ইসলাম সাহেব এসব স্থাপনার স্থাপত্য দিক দেখেছেন, শহীদুল্লাহ সাহেব দেখেছেন স্ট্রাকচারাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দিক। এসব কাজ করতে গিয়ে দেশি-বিদেশি নানান মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, নানান চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। সেসব কর্ম, দিনযাপন তার জীবনে এক বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। রাজনীতি আর সংস্কৃতির বড় মানুষদের দেখা মিলেছে এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে এসেই।

এরপর প্রকৌশলী শহীদুল্লাহকে পার করতে হয়েছে আচানক এক জেলজীবন। জেলে বন্দি থাকা অবস্থাতেই এক সময় 'বাস্তুকলাবিদ' ভেঙেছে। তার নিজের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না সেখানে। জেলে থাকতেই জন্ম নিয়েছে নতুন প্রকৌশল উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'। সেই প্রতিষ্ঠান এক সময় দেশের শীর্ষ প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছে। রেট্রোফিটিং কৌশল উদ্ভাবন করে শহীদুল্লাহ অ্যান্ড এসোসিয়েটস দেশজুড়ে এক নির্ভরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। যে কোনো পুরনো বিল্ডিংয়ের পরিসর বাড়াতে হবে, অথচ বিল্ডিং ভাঙবেন না, বিল্ডিংয়ের স্থাপনাগুলোর কোনো ক্ষতি করা যাবে না, ব্যবহারকারীদের অসুবিধা ঘটানো যাবে না– এর জন্য একমাত্র ভরসা দেশের সেরা প্রকৌশলীদের একজন শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা স্টেডিয়ামসহ দেশের অনেক ছোট বড় স্থাপনায় শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ কৌশল প্রয়োগ করেছেন সফলতার সঙ্গেই।

'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড এসোসিয়েটস'-এর মালিকানায় আত্মীয়-পরিজন, সন্তান, পরিবারের কাউকে জড়াননি। বরং প্রতিষ্ঠানে যারা বেতনভুক্ত হয়ে ঢুকেছিলেন

তাদেরকেই মালিকানা দিয়েছেন। নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অসৎ উপায়ে টাকা দিয়ে কাজ নেবেন না, প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ'র এই দৃঢ় পণ– 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসেসিয়েটস'-এ এক সময় ভাঙন আনে। সহকর্মী, শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে নৈতিক বিরোধের জের হিসেবেই তৈরি হয় নতুন প্রতিষ্ঠান। নিজের হাতে গড়া 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' থেকে নিজেই সরে যান। সহকর্মী যারা এ প্রতিষ্ঠান ভাঙতে চেয়েছিলেন তারা প্রকৌশলী শহীদুল্লাহকে ছাড়তে চান কিন্তু 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়োটস'-এর বাজার-পরিচিতি, সুনাম, গুডডইল তাদেরকেই ছেড়ে দেবার আবেদন রাখেন তার প্রতি। শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সহকর্মীদের সেই আবেদন মেনে নেন। নিজের হাতে তৈরি করা প্রতিষ্ঠান সহকর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে সরে আসেন নিজে। বানানো নতুন প্রতিষ্ঠান 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড নিউ অ্যাসোসিয়েটস'।

আজও সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তিনি।

এ একজীবনে শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫৭ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, তার ফিল্ডে দেশের সেরা প্রকৌশলী। অন্য জীবনে শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মাঠের মানুষ। রাজনীতির জন্য নিবেদিত। দেশের তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত। দেশের সক্ষমতায় জনগণের মালিকানায় এ সম্পদ রক্ষা পাবে– সেই আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ-কর্মী নেতাও তিনি। নিজে এখনো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সদস্য নন। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সহানুভূতি শুধু দার্শনিক, আদার্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, আর্থিকও বটে। এখনও প্রতি মাসে তিনি নিজে যা আয় করেন, তার তিন ভাগের দুই ভাগ এ কাজে ব্যয় করেন। বহু বছর ধরেই এ আর্থিক প্রণোদনা জুগিয়ে আসছেন সমাজ পরিবর্তনের কাজে নিবেদিত রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানগুলোকে। বামপন্থিদের কেউ কেউ রসিকতা করে তাকে 'আমাদের লাদেন' বলেও অভিহিত করেন।

বামপন্থি দলগুলো আদর্শগত, রাজনৈতিক নানা মত-পার্থক্যে নিজেদের মধ্যে নানা দূরত্ব তৈরি করলেও শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে কেন্দ্র করে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে নিজেদের সংঘবদ্ধ রেখেছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সেই ঐক্য এবং সংগ্রামের দিকচিহ্ন হয়ে আছেন।

স্পষ্টবাদিতায় কিংবদন্তী হয়ে ওঠা শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কঠোর, কঠিন, রসকসহীন, সত্যভাষণে দেশের অনেক রথি মহারথিরা বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু সমাজবদলের আন্দোলনে নিবেদিত সত্য, পরিশ্রমি যে কোনো অচেনা তরুণ, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মানুষের জন্য অবারিত হৃদয় নিয়ে নিজের দরজা খুলে রেখেছেন তিনি।

তীব্র কঠোরতা আর হৃদয়বান কোমলতা– এ দুইয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ– সমাজবদলের লড়াইয়ে রত তরুণ সমাজের একটা বড় অংশের কাছে প্রেরণা আর ভালোবাসাময় শ্রদ্ধার 'শহীদুল্লাহ ভাই' হয়ে আছেন।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনের প্রতিটি বাঁকে সংগ্রাম আর দৃঢ়তার অসংখ্য গল্প, অসংখ্য অভিজ্ঞতা জমে আছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনতে বার বার ছুটে গেছি তার কাছে। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সময় দিয়েছেন। আমি তার পুরো জীবনের অনেক কথা, বহু গল্প, বিস্তর অভিজ্ঞতা ক্যাসেটবন্দি করেছি।

খুব অবাক হয়েছি তার জেলজীবনের কথা শুনে। রিমান্ড, ইন্টারোগেশন এসব শব্দের সঙ্গে সেই ১৯৬৯ সালেই পরিচিত হয়েছেন তিনি। 'মার্কসবাদী' সংগঠনকে সহায়তা করার অপরাধে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হাতে গ্রেফতার হন শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সামরিক আদালতে তার বিচার হয়। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। ঢাকা ও পাবনা কারাগারে কাটান দুই বছরের অধিক সময়। জেলজীবনে ঘটে নানান অভিজ্ঞতা। রিমান্ড, জিজ্ঞাসাবাদ, জেলজীবনের কোথাও নমনীয় না-হবার অপরাধে নানান শাস্তির মুখে পড়েন। এমনকি পাগল বানিয়ে পাবনা পাগলাগারদে তাকে পাঠানোর চেষ্টাও চলে। অথচ ইস্পাতসম দৃঢ়তায়, অনমনীয়তায় সেই দুর্দিনের মোকাবিলা করেন তিনি।

জেলে থাকা অবস্থায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সেসময় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে দেয় তার দুই কনিষ্ঠ ভাইয়ের লাশ। জেলে বসেই দুই ভাইয়ের নির্মম হত্যার খবর পান তিনি। এসব দুঃখদিন মোকাবিলা করে প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন মুক্ত জীবনে। সেই জীবন এখনো কর্মময়, বর্ণাঢ্য, দুঃখী মানুষের কল্যাণে নিবেদিত, সংগ্রামে মুখর।

তার আশি বছরের বর্ণময় জীবনের অসংখ্য বর্ণাঢ্য ঘটনা-উদ্দীপনায় ভরা। তার প্রতিবাদী জীবন সকলের জন্য প্রেরণার এক আশাজাগানিয়া উৎসমুখ। তাকে জানা গেলে চেনা হবে এক অন্যরকম বাংলাদেশকে।

আজকের প্রেক্ষাপট: আমাদের চলচ্চিত্র

মা হ বু ব জা মি ল

[প্রবন্ধটি সত্তর-এর দশকের শেষদিকে ‘চলচ্চিত্র: সমকাল’ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল; আমাদের চলচ্চিত্র-জগতের সমস্যা সেই সময়ের তুলনায় সমাধানের পথে সামান্যও এগোয়নি, বরং সমস্যা আরও জটিলতর রূপ নিয়েছে। সে-কারণে আলোচ্য প্রবন্ধটি এর লেখক কর্তৃক কিছুটা পরিমার্জিত হয়ে একটি নতুন প্রবন্ধ হিসেবে গোলাঘরে ছাপা হল। –সম্পাদক]

লেনিন বলেছিলেন, ‘অব অল দা আর্টস মোস্ট ইমপর্টেন্ট ফর এ কান্ট্রি ইজ, টু মাই মাইন্ড, দ্যাট অব দি সিনেমা’। কবেকার কথা। অন্তত পাঁচ দশক পূর্বের। আর আজ তারই প্রতিধ্বনি বিশ্বব্যাপী। চলচ্চিত্র আলোচিত অহরহ সুধীজনের দরবারে। এই শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে যাদের সন্দেহ ছিল, তারাও আজ আর সোচ্চার নয়। চলচ্চিত্রও শিল্পের একটি অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন দেশের সরকারও এই শিল্পের দিকে এখন নজর দিচ্ছেন– কারণ ত্রিবিধ একটি শিল্পমাধ্যম, একটি অর্থকরী মাধ্যম এবং একটি বিশিষ্ট প্রচারমাধ্যম। ফলত বিভিন্ন সরকার আয়োজন করেছেন জাতীয় পুরস্কার।

সাহিত্য, কাব্য সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন ও নাটক– শিল্পকলার এতগুলো বিভাগ থেকে নাটকের ক্ষমতাই অধিক। কেননা, নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে তার বক্তব্য পৌঁছে দেয়। আর জনসাধারণের কাছে চলচ্চিত্রের আবেদন ব্যাপকতর। সেজন্য জনসাধারণের কাছে এর মূল্য সর্বাধিক। যে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে এই শিল্পমাধ্যমের যোগাযোগ সেহেতু স্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য।

সাহিত্য, কাব্য, নাটকের সাথে সিনেমাকে আবার জড়ালাম কেন? সাহিত্যের সাথে সিনেমার সম্পর্ক আবার কী? সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষের এক লেখায় পড়েছিলাম– চলচ্চিত্র এবং কথাসাহিত্য আচারে আলাদা, কিন্তু জাতিতে এক। উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বহু, কিন্তু রক্তের মিল অনস্বীকার্য। নাটকের ক্ষেত্রে এই মিল হয়তো স্পষ্টতর, সেই হেতু নাটক সাহিত্য-পরিবারেরই অঙ্গীভূত। ফিল্ম বায়োকনিষ্ঠ জ্ঞাতি। তার আচার-ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক, কিন্তু সাহিত্য যা মানে, জীবনের সেই

মূল লজিক অর্থাৎ যৌক্তিকতা মানতে সে-ও বাধ্য। কিন্তু জীবনের কথা বলবে যে চিত্রের এই অঙ্গীকার, সাহিত্যের ধর্ম তারও ধর্ম হতে বাধ্য। পথ বিভিন্ন, তবু লক্ষ্য এক। কলমে যে চরিত্র আঁকি, আলোছায়ায় তাকেই রূপ দিই। তারা দেহে দুই; কিন্তু মনে এক হতে বাধ্য। আর্টের দু'টি রূপের ওপরই মনস্তত্ত্বের সার্বজনীন বিজ্ঞানের শাসন খাটে। সে-জন্য সাহিত্যকে আমরা যেমন আমাদের সমাজ জীবনের বাইরে কল্পনা করতে পারি না, তেমনি আজ পারি না চলচ্চিত্রকে সমাজবহির্ভূত কোনো এক বিষয় হিসেবে ভাবতে। ফলত আমাদের সমাজের অথবা জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রের বিপুল উপস্থিতিকে স্বীকার আমাদের করতেই হবে। তদুপরি যে কোনো শিল্পই আমাদের শান্ত-রক্ষণশীল বাঙালি জীবনের অবিভাজ্য অংশ– আমাদের চেতনায় প্রোথিত। এ-জন্যই সব শিল্পের পরিপূর্ণ রূপেই প্রতিবিম্বই সংস্কৃতি– বাঙালি সংস্কৃতি। ফলত চলচ্চিত্রও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ।

আপামর জনসাধারণের কাছে যে শিল্প-মাধ্যমের আছে সার্বজনীন আবেদন সেই মাধ্যম সম্পর্কে আমরা কী ভীষণ উদাসীন। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ২৫ বছর পূর্বে আর বাংলাদেশ হল চার বছর। কিন্তু আঁধার পেরিয়ে আলোর হাতছানি কোথায়? আলো, আরো আলো! চিৎকার শুনেছি, দৃপ্ত কণ্ঠে– বক্তা বলেছেন, সভাপতি বলছেন, লেখক বলছেন। অথচ তবুও নবীন সূর্যের যে দেখা পাচ্ছি না।

'মুখ ও মুখোশ' দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ছবির যাত্রা। চলচ্চিত্র সৃষ্টির এই বলিষ্ঠ প্রয়াসে আমরা হয়েছিলাম আশান্বিত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দেখতে পেলাম– এগিয়ে এলেন অনেক প্রযোজক-পরিচালক। কিন্তু তাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য কিন্তু নয় শুভ। এক হীন মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন এইসব প্রযোজক-পরিচালক। ব্যবসায়িক দিকটাই তাদের লক্ষ্য– আর্ট বা শিল্প সৃষ্টির তাগিদ নয়। তাঁরা ভুলে গেলেন চলচ্চিত্র একটি শিল্প এবং এর দ্বারা দেশ ও জাতির কিছু উন্নতি করা যায়। বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গনকে করা যায় দীপ্যমান। অথবা বলা যায়, যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা এ নাটকের 'শিল্পী' নন বরং ব্যবসায়ী। ব্যবসাটা মুখ্য– ভালো সৃষ্টির সদিচ্ছা এদের আছে কিনা, সন্দেহ– থাকলেও তা নেহায়েতই গৌন। অন্তত গত এক দশকে টাকাওয়ালা লোকের অভাব দেখছি না, কিন্তু যে শিল্প-প্রেরণা থাকলে নবতর সৃষ্টি সম্ভব, তারই আশ্চর্যরকম অভাব হচ্ছে পরিলক্ষিত। ব্যবসাগত দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে কেবল মহৎ চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে হবে– এ-ও আমাদের বক্তব্য নয়। কেননা, সে সময় আমাদের এখনও আসেনি এবং সেভাবে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে আসাও বোকামি। কেননা, কোনো প্রযোজক সৎ-শিল্প ভাবনায় ভাবিত হয়ে এগিয়ে এলেন– কিন্তু ব্যর্থ হলেন ব্যবসায়িক সাফল্য আনতে। ফলে তার পরবর্তী সৃষ্টির পথ হল রুদ্ধ। ভালো কিছু পাওয়ার আমাদের বাসনার হল সমাপ্তি।

চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে ভাবতে গেলে সর্বদা একথা যদি স্মরণ রাখি– তাহলে এই দ্বিমুখী চিন্তাধারার বোধহয় সমন্বয় ঘটানো যায়। চলচ্চিত্র কি শুধুই শিল্প, না শুধুই

ব্যবসা? মূলত চলচ্চিত্রশিল্পটি যেমন একটি ব্যবসা, তেমনি এটি একটি শিল্পকলাও। ব্যবসা আগে, না শিল্প আগে– তর্ক না করে যদি বলি– সিনেমা ইজ এ কমবিনেশন অব আর্ট অ্যান্ড কমার্স– তাহলেই ব্যাপারটার মীমাংসা বোধহয় সহজ। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ রেখে সে-জন্য আপাতত শুধুমাত্র নিরীক্ষাধর্মী ও আর্টছবি করা হয়তো সম্ভব নয়। যেজন্য প্রযোজক-পরিচালকরা যদি এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে দ্বিমুখী ভাবনার কমবিনেশান-এ তাহলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যায়, আমরা নিশ্চয়ই ভালো ছবি পাব, যে ছবি সুরুচিপূর্ণ, শিল্পবোধসম্পন্ন এবং রসোত্তীর্ণ হয়ে ধরা দেবে আমাদের কাছে।

আবারো পুনরাবৃত্তি করছি– বর্তমানে শুধুমাত্র 'শিল্প' ছবি করা হয়তো বা সম্ভব নয় আমাদের সামাজিক-মানসিক চারিত্র্যের দিকে লক্ষ করলে। কিন্তু এ অবস্থা অনন্ত কালের জন্যে নয়। ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে অচলায়তনের এবং এই অনড় অবস্থাকে পরিবর্তনের দায়িত্বও চলচ্চিত্রস্রষ্টাদের। তাই আপাতত ছবি করতে হবে সবার জন্যে– স্থূল নয়, সুস্থ। কিন্তু লক্ষ্য হবে দর্শকদের, চলচ্চিত্র- ভোক্তাদের মানসিকতাকে পরিবর্তনের, রুচির পরিবর্তনের।

সোভিয়েত রাশিয়া গড়াকালে শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন যে কথা বলেছিলেন, সে-কথা আমাদের সবার প্রণিধানযোগ্য–

Art belongs to the people. It must penetrate with its deepest roots into the very midst of the masses. It must be intelligible to these masses and beloved by them. It must unite the feeling, thought and will of these masses and elevate them. It must awaken in them artists and develop them.

সত্যজিৎ রায় অনেকটা এ পথেরই পথিক। তাঁর ছবির পরিচ্ছন্নতা, সূক্ষ্মরুচি, পরিমিতিবোধ দিয়ে বিদগ্ধ দর্শকের মনে এনে দিলেন স্বতন্ত্র স্বাদ এবং সাধারণ দর্শকের শিল্পরুচিকে উন্নত করে তুললেন। তদুপরি তৈরি হল একাধিক অনুগামী পরিচালক।

আমাদের দেশে অহরহ এক সোচ্চার শ্লোগান শোনা যায় প্রযোজক-পরিচালকদেও মুখে– বাজারে চলবে না। কী বাজারে চলবে না? আমাদের জীবনের গল্প, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি, আমাদের হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনা-উল্লাসের চেনা জগৎ। কী বাজারে চলবে– মলিন জগতের অবান্তর আর অবাস্তব প্রতিচ্ছবি। স্থূল কাহিনী, ভাঁড়ামো, অশ্লীল কৌতুক, ভিলেন, নায়ক-নায়িকার পথে-ঘাটে-প্রান্তে উল্লম্ফনসহ নৃত্য-গীত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ফরমুলা মাফিক অলীক ছবি করে রাতারাতি বড়লোক হতে চান। সুস্থ, সুন্দর রসোত্তীর্ণ আর সুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র বাজারে চলবে না, এ অপবাদ বাজার তথা জনসাধারণের ঘাড়ে আরোপ করা ঠিক হবে না। কেননা, এক বক্তব্য আজ কেবলমাত্র ভ্রান্তিবিলাস। ভাঁড়ামি আর যৌন আবেদনমূলক ছবিই যে শুধু পয়সা দেয়, অন্য ছবি মার খায়, একথাও আজ আর সত্য নয়।

কথা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র জগতের পরিস্থিতি অনায়াসে আলোচিত হতে পারে। হেতু আমাদের সাথে সাযুজ্য এবং চারিত্রিক রূপ প্রায় একরকম। বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা, ঠিক এরূপ অবস্থা কলকাতার চিত্রলোকে যখন কাল পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে– তখন সহসা এক বিপ্লবের মতো সৃষ্টি হল 'মহাপ্রস্থানের পথে'। বিপ্লবী দেবকী কুমার বসু। কী আশ্চর্য– এ ছবি শুধু পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হল তাই নয়, শুধু বিদগ্ধজনেরা গ্রহণ করল তাই নয়, গ্রহণীয় হল সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে। অচলায়তনের ভিত্তিতে প্রথম ভাঙন ধরল। কিন্তু চমকে গেল তারা, যারা এতদিন বলত– ফরমুলার বাইরে ছবি করা যাবে না, কেননা বাজারে চলবে না। অবশ্য পরে তপন সিংহের 'অঙ্কুশ' ব্যবসাগত সার্থকতা পেল না। কিন্তু আবার সার্থকতা পেল 'পরিবর্তন'।

অতঃপর বাংলা চিত্রজগতে এলেন সত্যজিৎ রায়। পূর্বের এসব মুষ্টিমেয় সাহসিক পরিচালকদের পর সত্যজিৎ রায় বাংলা ছবিকে এক উন্নততর মানে পৌঁছে দিলেন। নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণের যে ঢেউ এসেছিল, সেই ঢেউকে আরও বেগবান করলেন সত্যজিৎ। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রমিক আরোহণ-উত্তরণের হল শুরু। সম্পূর্ণ গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে– যাতে যৌবন-ঢলঢল, রূপে টলমল নায়িকা নেই, যাতে নতুন মডেল গাড়ি-বাড়ি নেই, নায়ক-নায়িকার মিষ্টি প্রেমালাপ অথবা গান নেই– সেই 'পথের পাঁচালী', কিন্তু সকলেই দেখল, বাজারে চলল। আর পেল বরমাল্য দেশ-বিদেশে। তারপর জোয়ার এল নতুন ধরনের ছবি নির্মাণের– একে একে মুক্তি পেল কাবুলী-ওয়ালা, ডাক-হরকরা, লৌহকপাট, অপরাজিত, অযান্ত্রিক, অন্তরীক্ষ, অপুর সংসার ইত্যাদি। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবগুলোই ব্যাবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছিল, কারণ এইসব ছবির স্রষ্টারা দর্শকদের অজান্তেই তাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করেছিল। কিংবা একথা বলা যেতে পারে, দর্শকেরা এ ধরনের ছবি দেখার জন্যই ছিল প্রস্তুত, শুধু এতদিন সুযোগ করে দেওয়া হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাশ দশকের তুলনা আনলাম এজন্য যে, আমাদের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম। কিন্তু অভাব ওদের মতো একদল নতুন চিন্তায় ভাবিত চলচ্চিত্রস্রষ্টার। ঘটছে না তাদের আগমন আমাদের চলচ্চিত্রাঙ্গনে। মুখরিত হচ্ছে না নবীনতার কল্লোলে।

আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হচ্ছে একদল দর্শকের, যারা সত্যিকার ভালো ছবি দেখতে চান। এজন্যই সাম্প্রতিককালে ঢাকায় দেখেছি নতুন নতুন চলচ্চিত্র সংসদের উদ্ভব। বেশ কিছু শিল্পমানসম্পন্ন ছবির অভূতপূর্ব প্রদর্শনী- সাফল্য।

ফলত মনে হচ্ছে, বর্তমানের চিত্রনির্মাতারা স্থূল কাহিনী নিয়ে বাজারে নামলে তাদের সেই 'মনগড়া-বাজারই' আজ আর তা নিতে রাজি নয়। দর্শকেরা চলচ্চিত্রের মাঝে বিশেষ 'কিছু' চায়। সে চাওয়া-রংচঙে মেকআপ, নামকরা নায়ক-নায়িকার জুটি, স্টুডিও'র ফ্লাডলাইটের চোখধাঁধানি অথবা শুধু টেকনিকের কারসাজিতে বিষয়ান্বিত

হতে চাওয়া নয়। কেবল আঙ্গিকে সন্তুষ্ট নই আমরা– বক্তব্য চাই। কনটেন্ট ফার্স্ট, দেন কামস ফর্ম। বক্তব্যকে জোরালো করার জন্যই আঙ্গিকের প্রয়োজন। বক্তব্য মুখ্য–আঙ্গিক গৌণ। কিন্তু বিতর্ক সাজে সেখানে, যেখানে টেকনিকের কারসাজি দেখানো সম্ভব, যারা টেকনিক দিয়ে পারে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতে। আমরা তা-ও কি পেরেছি? বক্তব্য চাই। কিন্তু কোন বক্তব্য বা কনেটেন্ট? যে বক্তব্য বাস্তব। কেননা আজকের দর্শকেরা জোর গলায় বলছে– আমরা বাস্তব কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ দেখতে চাই। যেসব সমস্যা আমাদের কর্মপথে পার হয়ে এসেছি, তারই প্রতিচ্ছবি। রিয়ালিটি নামক বস্তুকে বাইরে থেকে খোঁজার সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে, ভেতর থেকে বোঝার ও অনুসন্ধানের দুরূহ তাগিদ অনুভব করতে হবে। জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য ও সংকটকে রূপ দেওয়া ও তারই মধ্যে নিজেদের গভীর আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

তাহলে একটা বাস্তব কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ দিতে গেলে আমাদের আশেপাশের চেনা জগৎটাকেই দেখতে হবে অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শিক্ষার্থী-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে দরদ দিয়ে দেখতে হবে। চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে করুণা করা যায়– ব্যথা অনুভব করা যায় না। এজন্যই এখানকার কিছু ছবিতে দেখি বিত্তশালী সমাজের ছবি দেখাতে গেলেই তারা দেখান মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা, স্বল্প পোশাক পরিহিতা তরুণী ইত্যাদি। এত স্থূল বহিঃপ্রকাশ– বাইরের এক খণ্ডাংশ। এতে অন্তর্নিহিত জীবনের গল্প প্রতিবিম্বিত নয়। আইজেনস্টাইন, পুডফকিন, ডি-সিকা, জঁ্যা রেনোয়া, বেয়ারিম্যান, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ চিত্রস্রষ্টা এ পথেরই পথিক। ছবি শুধু ছবিই নয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রপরিচালক পল রোথা বলেছেন:

On principle every film presents a problem or a theory which is definitely connected with the everyday life of the persons for whom it is made. A content of Sociological importance is the basis of all productions and this is woven a narrative story interest.

অনেকে আবার বাস্তবতা নিরূপণ করতে গিয়ে কঠিন ভুল করে বসেছেন। কাহিনীকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য এঁরা চটের আকাশ, কাগজের ফুল আর ইলেকট্রিক

বাল্বের চাঁদ-তারার বদলে দেখাচ্ছেন আসল জিনিসের ফটোগ্রাফ। নায়িকাকে গ্রাম্য সাজানোর জন্য অন্তর্বাস বাদ দিয়ে তাঁরা ভাবছেন এই বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করা গেল। আবার শিল্প-অনভিজ্ঞ চিত্রনির্মাতাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রচুর পরিমাণ বহির্দৃশ্য সমাবেশ করলেই ভিজুয়াল আর্ট সৃষ্টি করা যায়। এহেন গোঁজামিল এবং 'অসুস্থ চিন্তাধারা' আমাদের ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই শিল্প-অনভিজ্ঞতা এবং 'অজ্ঞানতা'র জন্য চিন্তার জগৎ নয় বহুবিস্তীর্ণ, নয় বহুধাবিভক্ত, নয় নির্মল আলোর বন্যায় প্লাবিত।

এই অজ্ঞানতার জন্যই আমাদের চিত্রস্রষ্টারা ফর্মুলার বাইরে যেতে পারছেন না। কারণ যাঁরা আমাদের চিত্রাকাশে 'উজ্জ্বল' হয়ে রয়েছেন, তাঁরা বেশিরভাগই এ শিল্পের মহৎ দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনাহীন এবং তদুপরি জমা হয়েছেন হঠাৎ ধনী হওয়ার লোভে অথবা চলচ্চিত্র জগতের চকচকে আলোর দুর্বার আকর্ষণে। আর এঁরাই তাবৎ শক্তি দিয়ে দ্বার রেখেছেন বন্ধ করে নবীনদের, নতুনদের আগমনে। সেজন্য ঢাকার চিত্রজগৎ নয় নতুন চিন্তার, নতুন অন্বেষার, নতুন নিরীক্ষার বিপ্লবী প্রচেষ্টার অঙ্গন। অচলায়তন ভাঙছে না। বরং দিনে দিনে যেন শেকড় আরও গভীরে যাচ্ছে।

হঠাৎ কোনো একটা ছবি যদি ব্যবসাসফল হল– সাথে সাথে বাকি চিত্রনির্মাতারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই একই ধারার চিত্র নির্মাণে। আবার সে পথ যখন বন্ধুর হয়ে এল, আবার খোঁজ পড়ল আর-এক ফর্মুলার। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তবু সর্বৈব সত্য যে, নিদারুণ সত্য যে, সম্প্রতি স্টুডিও চত্বরে এসেছে 'অশ্লীল প্লাবন'। স্বাধীনতার পর যতগুলো নতুন ছবির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই যুদ্ধবিধ্বস্ত একাত্তরের বাংলাদেশ। আশার কথা হতে পারত। যে-কোনো দেশে এ ধরনের অবস্থার পরই তার পটভূমি নিয়ে রচিত হয় মহৎ উপন্যাস, নাটক, চিত্র। কিন্তু এখানে এসব চিত্র নির্মাণের পেছনে বাস্তবতা কতটুকু আছে জানি না, তবে আছে ব্যবসা– তা-ও অশ্লীল উপায়ে। কারণ প্রত্যেক ছবিতেই 'আবশ্যিকভাবে' থাকছে নারীধর্ষণ এবং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কিভাবে এ দৃশ্য সংযোজন করবে, তা' নিয়ে।

এমতাবস্থায় কী আশা করা যায়? এই-কি বাস্তবতার রূপ? '৭১-এর বিধ্বস্ত বাংলার অত্যাচারের রূপ কি কেবল নারীধর্ষণ? কেন এই বাস্তবতা-বিরোধী 'অলীক' জগতের ছবি আঁকতে চায় আমাদের চলচ্চিত্রনির্মাতারা? কারণ হিসেবে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি।

'অজ্ঞানতা', আর নতুন কিছু উপস্থাপনের সাহসের অভাব এবং তদুপরি দর্শকদের চিনতে পারার, তাদেরকে জানার প্রচেষ্টার অভাব, অতীতে একটি সরণিকে আঁকড়ে ধরে রাখা কেবল। চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার নিদারুণ অভাবেরই প্রতিচ্ছবি এসব।

যুদ্ধবিধ্বস্ত, অত্যাচারিত বাংলার মুখ, বাংলার রূপ আমরা তথা দর্শকেরা দেখব– কিন্তু সে ছবি, সে দেখা যেন বাস্তব দেখা হয়। এ প্রসঙ্গে ইতালির বিখ্যাত সমালোচক পিট্রো বাল্‌ডেল্‌লির উক্তি মনে পড়ছে। ইতালীয় চলচ্চিত্র যখন এমনি নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে, তখন তিনি বলেছিলেন 'ইতালীয় ছবি এখনও প্রাথমিক স্তরে– এখন বাস্তববাদীর পথ ত্যাগ করলে চলচ্চিত্রশিল্পের অপমৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।' একথা আমাদের বাংলাদেশের বেলায়ও প্রযোজ্য নয় কি?

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাতাল হয়ে আছে বিশ্বের চলচ্চিত্রজগৎ। তখন দর্শকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, সীমাবদ্ধতার মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে আর ভুলপথে চালিত হওয়াও যেমন

উচিত নয়, তেমনি উচিত নয় আত্মতৃপ্তি পাওয়া। উন্নতর মান আমাদের লক্ষ্য হোক– হোক উত্তরণের অন্বেষা।

তা বলে আমি বলছি না, শুরু করুন এখনই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বরং আমাদের পূর্বের বক্তব্য সৎ ছবি করুন কমার্স আর আর্ট-এর দিকে লক্ষ্য করে, দর্শকের চাহিদার কথা ভেবে, দর্শকের তৈরি করে নেয়ার ভাবনা ভেবে। প্রটেকশন নয়, বরং এখন কমপিটিশন আসুক। প্রতিযোগিতার মধ্য থেকেই হতে পারে ভালো কিছুর সৃষ্টি। কেননা আজ চলচ্চিত্র কেবল আমোদ বিতরণের বস্তু নয়, এর মধ্যে আমরা জীবন-স্পন্দন অনুভব করতে চাই। প্রযোজক-পরিচালক তথা চলচ্চিত্র সৃষ্টির সাথে জড়িত সবার কাছে একটি আবেদন রেখে এই নিবন্ধ শেষ করা যায়, চিত্রনির্মাণের সময় যেন তাঁরা মনে রাখেন, কাহিনীটি যেন এমন হয়– ইট মে হ্যাভ হ্যাপেনড, ইট মে নট হ্যাভ হ্যাপেনড, বাট ইট কুড হ্যাপেন (মার্ক টোয়েন)। তাহলেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাকাশ নির্মল চলচ্চিত্রের আলোয় হবে আলোকিত, হবে দীপ্যমান।

আমার শিক্ষক তারেক মাসুদ

....

স লি মু ল্লা হ খা ন

`In breaking a statue one risks becoming a statue…'

–Jean Cocteau, 'Le Sang d'un Poète'

"যাঁহারা মূর্তি ভাঙিবার কাজে হাত দিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজেরাই মূর্তি হইয়া উঠিবার ঝুঁকি লয়েন॥"

– জাঁ কক্‌তো, 'জনৈক কবির খুন'

তারেক মাসুদ এন্তেকাল করিয়াছেন। একা করেন নাই, সঙ্গে করিয়াছেন আরো চারিজন। তিনজন সঙ্গী গুরুতর জখম হইয়াছেন, একজন সামান্য। ২৯ শ্রাবণ, শনিবার, বারবেলায় এই ঘটনা ঘটিয়াছে পুরানা ঢাকা জেলার ভিতরে, নতুন জেলা

মানিকগঞ্জ সদরের অদূরে। যখন পহিলা খবরটি পাইলাম, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল ছাত্রছাত্রীর সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম। যখন শুনিলাম প্রথম অবিশ্বাস করিলাম, তারপর অবাক হইলাম। শেষ পর্যন্ত বুঝিলাম বিশ্বাস করিতে হইবে অবিশ্বাসকে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ করিতেই হইবে। অবাককে কথা বলিতে হইবে।

এই শেষের দিকে তারেক মাসুদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মোবাইল ফোন কোম্পানির সংযোগ যেমন মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকে তেমন অনেকখানি। কিন্তু তারেক মাসুদের কথা দিনে একবার ভাবি নাই এমন দিন আমার কমই গিয়াছে। এই অন্তরের দিনেও। তিনি আমার উত্তমর্ণ। নানা সুবাদে। একাধিক কারণে।

তারেক মাসুদ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহার সহিত পহিলা যেদিন দেখা হইল সেদিনই তাহা টের পাইয়াছিলাম। সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছি। ইহা ইংরেজি মতে ১৯৭৬ সালের কথা। তারেক মাসুদ ও পিয়াস করিম একযোগে দেখা দিয়াছিলেন। সে কালের শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন নামে খ্যাত আশ্রয়কেন্দ্রের আশপাশে তাঁহারা ঘুরিতেছিলেন। তখন লেখক শিবির নামে একটি দল জীবিত ছিল। তাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা হইয়াছিলেন তারেক মাসুদ।

তারেক মাসুদের সাথে আমার নতুন করিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন মোহন রায়হান। ১৯৭৮ সালে মোহন রায়হানের পহিলা বহি 'জ্বলে উঠি সাহসী মানুষ' প্রকাশ করিয়াছিলেন 'বাঙলাদেশ লেখক শিবির'।

আমার ধারণা তাহাতে তারেক মাসুদের হাত ছিল। প্রথম দিকে তারেকের নাম সামান্য লম্বা ছিল—আবু তারেক মাসুদ। সেই নামে তিনি ছড়া লিখিতেন। সত্য বলিতে আমি তারেকের ছড়ার তুলনায় তাহার কথা বেশি শুনিতে চাহিতাম। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, জোর করিয়া ছড়া শুনাইয়া তিনি কখনও আমাদিগকে লজ্জা দেন নাই। এই কাজটি আমিও কখনও কখনও করি নাই এমত নহে।

প্রথম পরিচয়েই তারেক আমাকে বলিয়াছিলেন তিনি চলচ্চিত্রকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছেন। আমাদের বন্ধুদের বেশির ভাগই যে যাহার ধ্রুবতারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তারেক হারাইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন সংকল্পে দৃঢ়। তিনি ইতিহাস বিভাগে পড়িতেন। এই পড়া তাহার চিন্তার পথে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তারেক আমাকে কথাটা নিজেই বলিয়াছিলেন, 'ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হওয়া আমার লক্ষ্য নহে।'

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে আমি সিদ্ধান্ত লইয়াছিলাম একটি বিশেষ চরিত্রের পত্রিকা প্রকাশ করিব। আমি লেখক শিবিরের সদস্যপদ লাভ করিবার গৌরবে তারেকের শরিক হইতে পারি নাই। কিন্তু শিবিরের মধ্যে থাকিলেও ইতিহাস বিভাগের অধিক মর্যাদা তারেক মাসুদ শিবির জিনিসটাকে দিতে পারেন নাই। শিবিরের অন্য

পাঁচটি সভ্য আমাকে যতখানি অনাত্মীয় ভাবিতেন তারেক মাসুদ ততখানি ভাবেন নাই। আমি যখন "প্রাক্সিস জর্নাল" কাগজটা বাহির করি তখন তারেক আমাকে আত্মীয় ধরিয়া লইলেন। তিনি আমাদের সম্পাদনা পরিষদে নিজের নামটি যুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

কয়েক বছর পর আমরা একটি পুস্তিকা বাহির করি। নাম ছিল 'সমকালীন সাহিত্যের প্রবণতা ও শ্রেণীচরিত্র প্রসঙ্গে' বা ইহার কাছাকাছি কিছু। এই পুস্তিকা মোটের উপর আমিই লিখিয়াছিলাম। আর আমার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন তারেক মাসুদ। তিনি আমাকে জগতের যত নতুন খবর সবই জানাইতেন। বই আনিয়া দিতেন। সেই পুস্তিকায় প্রায় তিরিশ জনের স্বাক্ষর ছিল। আমার এবং তারেক মাসুদের নাম দুটিও বর্ণানুক্রম অনুসারে ছাপানো হইয়াছিল। আহা, পুস্তিকাটি এখন হারাইয়া কোথায় গিয়াছে জানি না! একটা কথা মনে আছে কবি অসীম সাহার নাম ছাপা না হওয়ায় পরে রবার স্ট্যাম্পযোগে যুক্ত হয়।

তারেক মাসুদের সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হইত। সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে চলচ্চিত্র বিষয়ে আমার আগ্রহ যাঁহারা শিক্ষকের মতন যত্ন করিয়া তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন তারেক মাসুদ তাঁহাদের মধ্যে একেবারে সামনের কাতারে। সত্য আরো বলিতে হইবে। আমার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আমার নিয়তি। শিক্ষকগণের সহিত দ্বিমত করাই আমার বিধিলিপি। শেষের দিকে আমি আর তাঁহার শিক্ষা হইতে উপকার লাভ করিতে সমর্থ ছিলাম না। হয়তো তাহাতে আমারই হয়রানি হইয়াছে।

দুই.

১৯৮৬ সালে আমি মার্কিন মুলুকে চলিয়া যাই। তাহার বছর কয় পরে তারেকও সেই দেশে সাময়িক হিজরত করেন। আমি তখন জীবিকা সংগ্রহের প্রয়োজনে একটি বইপত্রের দোকানে চাকরি করি। একদিন সেই দোকানে ক্যাথারিন শাপির আসিয়া হাজির। তিনি জানাইলেন তারেক তাঁহার আত্মীয়। সংবাদটা আমার জানা হইয়াছিল তাহার কিছু আগে। তারপর একদিন দেখি সত্যসত্যই তারেক মাসুদ নতুন ইয়র্ক শহরে নাতিদীর্ঘ ছায়া ফেলিতেছেন। আমরা পাঁচ হইতে সাত বছর সেই শহরে একটানা বসবাস করিয়াছি।

শেষ পর্যন্ত তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ড নামা এক দ্বীপে বাসা লইলেন। বাসাটি ছিল কাঠের ঘর। আমরা বহুদিন সেই ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ আমি আসিতাম অনেক দূর হইতে। অধিক রাতে ফেরা সম্ভব হইত না। তারেকও তখন আমার মতন বইপত্রের দোকানে কাজ করিতেন। তাঁহার কর্মস্থল ছিল নতুন ইয়র্ক শহরের বাঁকাপথ ওরফে ব্রডওয়ে এবং ১২ রাস্তার সংযোগবিন্দুতে। এই দোকানটি পাঁচতলা। বিজ্ঞাপন অনুসারে তাহার বইপত্রের সকল তাক একটার পর একটা সাজাইলে দৈর্ঘ্য হইবে আট মাইল। নাম স্ট্র্যান্ড বুকস।

আমি কাজ করিতাম ৫ অ্যাভিনিউ ও ১৪ রাস্তার সংযোগস্থলে। আমার বিদ্যালয়ের বইয়ের দোকানটার নাম ছিল 'এয়ুনিবার্সিটি প্রেস বুকস'। অনেক মধ্যাহ্নে আমরা একত্রে এয়ুনিয়ন স্কয়ার পার্কে (ব্রডওয়ে ও ১৪ রাস্তার সংযোগস্থল) বসিয়া দুপুরের খাবার খাইয়াছি। তারেক ভালো রান্নাও করিতেন। তাঁহার 'স্যান্ডউয়িচ' সঙ্গে থাকিত।

কাঠমিস্ত্রী হইলেও তারেক মাসুদ মন্দ করিতেন না। এই সময় তিনি সেই কাজও মাঝে মধ্যে করিতেন। নিজের বাসার ছোটখাট মেরামতির কাজ তিনি নিজেই করিয়া সারিতেন। কখনো কখনো ভাড়াও যাইতেন। এমনই এক যাত্রায়–তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন–তিনি আবিষ্কার করিলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু দলিলচিত্র।

ঘটনাটা শুদ্ধ কাক আসিবার পর তাল পড়িবার বিষয় নহে। ইহার পিছনে সাধনা ছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে এই দলিল অমূল্য রতন। মার্কিন চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেবিনের সহিত পরিচয় ও উদ্ধারপর্ব এতদিনে কিংবদন্তি হইয়াছে। নতুন ইয়র্কে থাকিতেই তারেক মাসুদ ইহার প্রদর্শনী করিয়াছিলেন সেখানে। সেখান হইতে একটি পুস্তিকাও ছাপা হইয়াছিল। সেই পুস্তিকায় আর পাঁচ জনের সহিত আমিও দুই কথা লিখিয়াছিলাম।

তিন.

এই যে শেষের দিকে আমার শিক্ষক বন্ধুর সহিত আমার যোগাযোগ স্থগিত হইয়া আসিল তাহার বীজ এখন দেখিতে পাইতেছি সেই সময়েই রোপা হইয়াছিল। আগেই বলিয়াছি তারেক মাসুদ ছিলেন একাধারে উচ্চাভিলাষী এবং দৃঢ়সংকল্প। এখন বুঝিতেছি তিনি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে পারিতেন ভক্তির জন্য। আমাদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ প্রাণের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ বৈ নহে। তিনি নেতা, আমি বিনীত অনুসারী মাত্র এই ছেদে।

তিনি তবে 'ভক্তি' করিয়াছিলেন কাহাকে? তাঁহার ছবি যাহারা দেখিয়াছেন সে কথা তাহারাই ভালো বলিতে পারিবেন। বাংলাদেশের হৃদয়কে তিনি ভাষা দিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস তিনি পড়িয়াছেন তাঁহার নিজের মতো করিয়া। তারেক মাসুদ যে জায়গায় জন্মিয়াছিলেন সেই ফরিদপুর অঞ্চলে ছিল পরাধীন যুগে কৃষক সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি। বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক-মজুর ও গৃহস্থ উভয় স্তরের কৃষকই–এসলাম ধর্মের সংস্কারকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আদর্শ আকারে গ্রহণ করে। এই আন্দোলন বাংলাদেশে 'ফরায়েজি' নামে জাহির আছে।

এসলামের এই ভাষ্য তারেক মাসুদ গ্রহণ করেন নাই। এসলাম এ দেশে আসিবার আগে এ দেশে যে ধর্মাচার প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল তাহাকে সমূলে বিনাশ করা ছিল ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য। তারেক মাসুদ এসলামকে লোকধর্ম হিসাবে

দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ‘মাটির ময়না’ ছবিতে এই বিশ্বাস এস্তেহার আকারে হাজির আছে।

‘মাটির ময়না’ ছবিটি বাংলাদেশে অনেকেই পছন্দ করিয়াছেন। অনেকে ইহার মধ্যে নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদের নান্দীগান শুনিতে পাইয়াছেন। আমিও এই ছবিটি দেখিয়াছিলাম। আমার মনের কথাটি একদিন দুই স্তবক আকারে লিখিয়াও ফেলি। বলা বাহুল্য তিনি তাহা পছন্দ করেন নাই।

আমি কি লিখিয়াছিলাম তাহা এখন আমার মুখে আসিতেছে না। যাহাই লিখি না কেন, আমি এখনও বলিব ছবিটিতে যে ময়না মাটির নির্মিত, তাহাতে প্রাণের সঞ্চার করা কঠিন কাজ। সেই কাজে তিনি সফল হইয়াছেন কিনা তাহা বলিতে আরো সময় লাগিবে। তবে তিনি যে হাত দিয়াছিলেন তাহা আমাকে অবাক করে নাই।

বাংলাদেশে এসলামের সূচনা যে কারণেই হৌক, এসলাম প্রচারের কারণে বর্ণাশ্রম ধর্মের অবয়বে একটা বড় আঘাত নামিয়া আসে। দুঃখের মধ্যে, খোদ এসলামও এদেশে আসিয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের আঘাতে খানিক পঙ্গু হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ইতিহাস বাদ দিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাস সাধনা চলিতেছে। তারেক মাসুদের সাধনা তাহাকে পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই।

বাংলাদেশে আমরা যে সাধনায় আজও সফল হই নাই– সেই মুক্তির সাধনায় তারেক মাসুদের নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে সাধনা প্রশ্ন জাগায় না, কেবল আবেগ উস্‌কাইয়া দেয় সে সাধনা ধর্মসাধনা মাত্র। আর যে সাধনা প্রশ্ন করে, ধর্মাচারের গোড়ার কথাও প্রকাশ করে তাহাকে বলে অর্থসাধনা।

আমার ভয় হয় তারেক মাসুদ কখনো ধর্মসাধনার পথে হাঁটিয়াছেন, আবার কখনো অর্থসাধনার খবর লইয়াছেন। আমার অপূর্ণ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি আমি ততটুকুই তাঁহার ধর্মসাধনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছি, কখনো অর্থসাধনার বিরুদ্ধে হাত তুলি নাই।

এখন তারেক মাসুদ আর সমুখে নাই। তাই এই কথাটি বিশেষ বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভে– একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম–আমরা দুইজনেই আহমদ ছফার পদতলে বসিয়া প্রজ্ঞা ভিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের পথ একসময় আলাদা হইয়া যায়।

তারপরও আজ আমি বলিব ঢাকা শহরে তারেক মাসুদ নাই বলিয়া এই শহরকে বসবাসের আরো অযোগ্য মনে হইতেছে।

১৫ আগস্ট ২০১১, ২:৪০ পূর্বাহ্ন

চলচ্চিত্র 'রানওয়ে': সমকালীন বাস্তবতার বোঝাপড়া

....

বেলায়াত হোসেন মামুন

বিগত ২০০৪, ০৫ ও ০৬ সালে আমাদের জাতীয় জীবনে যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এসেছিল, যা থেকে এখনও আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই এবং যার ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি আমাদের মন থেকে, অনেকের শরীর থেকে। সেই সময় নিয়ে তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছেন 'রানওয়ে'।

'রানওয়ে' শব্দগতভাবে এমন একটি জায়গা যেখানে বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণ করে, নিয়ে আসে মানুষ অথবা অনেক কিছু এবং নিয়েও যায়।

তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র 'রানওয়ে' শুধুমাত্র বিমানবন্দরের অদূরবর্তী কোনো একটি জায়গায় বসবাসকারী পরিবারের গল্প বলেই এ ছবিটির নামকরণ এমন তা ছবিটি দেখার পর তা আর মনে হয় না। বরং 'রানওয়ে' শব্দটিকে আরো বৃহৎ কোনো অর্থে, আরো ব্যাপকতর অর্থে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। ছবিটি নিয়ে এই আলোচনার কোনো একটি পর্যায়ে হয়তো আমরা সে জায়গায় পৌঁছাতে পারব, অন্তত চেষ্টা করব।

রানওয়ে ছবির পরিবারটি

'রানওয়ে' ছবিতে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের গল্প বলা হয়েছে। যে পরিবার অন্য কোনো বিশেষত্ব ছাড়াই এই ছবির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এমন পরিবার আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে অগণিত, সংখ্যায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে কারণে তারা সাধারণত আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তারেক মাসুদের ছবির এই পরিবার নদীভাঙ্গন এলাকার মানুষ। নদীভাঙ্গনের কবল থেকে বাঁচতে জমি বিক্রি করে ভাগ্য উন্নয়নের আশায় তারা রাজধানীতে বসবাস করছে। পরিবারের কর্তা অথবা প্রধান উপার্জনকারী মানুষটি একমাস হয় কুয়েতে গেছে বাংলাদেশের আরো প্রায় কোটিখানেক মানুষের মতো। যাদের আমরা প্রবাসী শ্রমিক বলে ডেকে থাকি। এই দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী মানুষ তারা। যে কারণে আমরা 'রানওয়ে' ছবিটিকে একজন প্রবাসী শ্রমিকের পরিবারের গল্প হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। যদিও আমরা সে শ্রমিককে দেখি না, ছবির কোথাও তার নামও আমরা শুনিনি। তিনি বৃদ্ধ পিতার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী এবং সন্তানদের পিতা হিসেবেই উল্লেখিত হন। এমনকি যখন কুয়েতফেরত একজন সহকর্মী শ্রমিক তার সম্পর্কে কথা বলেন তখনও তার নাম আমরা উল্লেখিত হতে শুনি না। আর তাই 'রানওয়ে' ছবিটি হয়ে উঠে পিতাহীন একটি পরিবারের গল্প। যে পিতা আছেন

গল্পে, স্মৃতিতে এবং কুয়েত অথবা ইরাকে অথবা অন্য কোথাও। যার ভূমিকা ছবির গল্পের পরিবারটিতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে হাজির থেকে। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের প্রণোদনা দেয়, আশা দেয় শারীরিকভাবে না-থেকেও। পরিবারে আছেন বৃদ্ধ দাদা। যিনি শারীরিকভাবে অসামর্থ্য এবং পরিবারে একমাত্র উপার্জনে অক্ষম মানুষ। যিনি পরিবারটির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, যে কারণে তাকে অনেকটা বিবেকের ভূমিকায় পায় পরিবারটি এবং আমরা দর্শকও। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায় রহিমাকে যিনি বাংলার আবহমানকালের মায়ের প্রতিরূপ। যার ভূমিকা পরিবারে সবচেয়ে বেশি। পরিবারে আছে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। রুহুল এবং ফাতেমা। এই পরিবারের কর্তা যেমন অনুপস্থিত থাকে প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে, যে শ্রমবিভাগটি বাংলাদেশের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে। তেমনি আরও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত পরিবারের অন্য সদস্যরাও। রহিমা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু পালন করে, দুধ বেচে সংসারের ভাগ্যের মোড় ঘোরানোর চেষ্টায়। কন্যা ফাতেমা গার্মেন্টসে কাজ করে এবং পুত্র রুহুল মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করতে না পেরে বেকার, নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টায় রত। এমন একটি পরিবারের গল্পের ভেতর দিয়ে নির্মাতা প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোকেই সামনে নিয়ে এসেছেন। যেখানে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ভাগ্যবদলের সংগ্রামে হাজির নারী আছেন, আছেন পোশাকশ্রমিক এবং আছে আমাদের সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং কোণঠাসা হয়ে পড়া মাদ্রাসাছাত্র, যার শিক্ষা তার জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, বিধায় সে বেকার এবং জঙ্গিবাদের মধ্য দিয়ে নিজের মুক্তির পথ সন্ধান করে। হতাশাগ্রস্তের জীবন কাটায়। ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে রানওয়ের এই পরিবারটি বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ– একটি রাষ্ট্র হিসেবে এর যে সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলো রয়েছে তার প্রায় পুরোটাই এই পরিবারের ভেতর দিয়ে হাজির হয় তাই রুহুলদের পরিবারটিকে বৃহৎ অর্থে বাংলাদেশের মেটাফোর হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

রানওয়ে'র আরও চরিত্রগুলো

রুহুলের পরিবারের বাহিরে এই ছবির আরও যে চরিত্রগুলো আমরা পাই তার মধ্যে প্রধান চারটি চরিত্র হলেন রুহুলের মামা, যিনি একটি কম্পিউটারের দোকান চালান। আরিফ এই ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র। যে রাজনৈতিক কর্মী, পরিবার থেকে বিছিন্ন এবং চরমপন্থার মধ্য দিয়ে ইসলামি শাসন কায়েম করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আছেন 'উর্দুভাই' যিনি একজন মুজাহিদ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে এসেছেন। ছবিতে আমরা তাকে দেখি প্রশিক্ষক এবং জঙ্গিদলের দলনেতা হিসেবে। আর আছে শিউলি নামের একটি মেয়ে। পোশাকশ্রমিক, রুহুলের বোন ফাতেমার বন্ধু এবং তাদের প্রতিবেশী। রুহুলকে ভালোবাসে এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে স্পষ্টবাদী। নিজের পিতা যখন একজন নেশাখোরের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তখন সে

বাড়ি ছেড়ে মেসে গিয়ে ওঠে। তবু পিতার পছন্দের কু-পাত্রকে সে বিয়ে করে না। ছবিতে আরও কিছু চরিত্র আছে যারা পরিস্থিতির প্রয়োজনে, গল্পের গতির প্রয়োজনে হাজির হয়। 'রানওয়ে' সমকালীন বিষয় এবং মানুষদের নিয়ে একটি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে। 'রানওয়ে' ছবিতে তারেক মাসুদ আমাদের কী বলেন অথবা বলতে চান?

যে দৃশ্যাবলির মাঝে গল্প শুরু হয়

একটি বিশাল দানবীয় বিমান অবতরণের দানবীয় আওয়াজে বিমানবন্দরের অদূরের কুটিরে টিনের দেয়ালে ঝোলানো জিনিসপত্র কাঁপতে থাকে এবং এই শব্দ ও জিনিসপত্রের কম্পনের শব্দে একজন বৃদ্ধ উঠে বসে অন্ধকারেই হাতড়ে টিনের জগ থেকে পানি ঢেলে খায়। এভাবেই 'রানওয়ে'র গল্প শুরু হয়। দানবীয় উড়োজাহাজের ভীতিকর শব্দে কেঁপে-ওঠা ভয়ার্ত বৃদ্ধের মুখ যেন আমাদের ধাক্কা দেয়, একটু নড়ে ওঠে আমাদের দেখার চোখ, মগজেও কিছু আলোড়ন ওঠে। যে-কারণে আমরা দানবীয় বিমানকে শুধুমাত্র 'বিমান'ই ভাবতে পারি না। আর অদূরবর্তী কুটিরে থাকা সেই বৃদ্ধ যিনি বিমানের অবতরণের শব্দে কেঁপে ওঠেন ঠিক তার ঘরের মতোই, আমরা তাঁর এই ভয় পাওয়াকেও নিছক 'শব্দে' ভয় পাওয়া হিসেবে দেখি না। এর অন্য অর্থ আমাদের ভাবতে হয়। ছবিজুড়েই এই বিমান ওঠানামার শব্দ-দৃশ্য যখনই হাজির হয়, তা আমাদের সচকিত করে তোলে। ছবির পাত্র-পাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতেই এই বিমানের ওঠা-নামা কি নিছকই আমরা তো জানিই যে, ছবির নির্মাতা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া একটি মাছিকেও তার ফ্রেমের মধ্যে আসতে দেন না। তাহলে তারেক মাসুদ কেন বারবার শব্দ এবং দৃশ্যের মাধ্যমে ছবির বিভিন্ন জায়গায় বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণের দৃশ্য গেঁথে দেন? আমরা একটু লক্ষ করে দেখি যে, ছবিতে যখন কোনো অমঙ্গল ঘটে বা ঘটতে চলছে তখন এই দৃশ্য-শব্দ হাজির হয়। আবার যখন কোনো মঙ্গলজনক কিছু– যেমন কোনো তথ্য অথবা কোনো উপলব্ধি চরিত্রগুলোর মাঝে দেখি তখন এই শব্দ-দৃশ্য জানান দিয়ে হাজির হয়। ফলে আমরা ভাবতে বাধ্য হই 'রানওয়ে' ছবিতে বিমান ওঠা-নামার অথবা আকাশের বুকে মানুষের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাওয়ার দৃশ্য এবং শব্দের আলাদা কোনো অর্থ দাঁড় করাতে চান নির্মাতা অথবা এই দৃশ্য-শব্দ নিজেই একটি চরিত্র হয়ে ওঠে অন্য চরিত্রগুলোর মতো!

'রানওয়ে'র গল্পে অন্তর্যাত্রা

ছবির শুরুর দৃশ্যগুলোতে আমরা একজন তরুণের পিছনে হাজির হই। সে অন্য মুসল্লিদের সাথেই ফজরের নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে। অন্য মুসল্লিরা যখন আমাদের ক্যামেরা-কোণের দিকে না-এসে সকলেই ডানে অথবা বাঁয়ে চলে যেতে থাকে তখন আমরা দেখি একজন ১৯-২০ বছরের তরুণ সোজা ক্যামেরার

দিকে মুখ করে সামনে আসতে থাকে। আমরা বুঝে নিই এই তরুণই আমাদের গল্প শোনাবে অথবা এর গল্পই আমরা দেখব। এ দৃশ্যের যে মুন্সিয়ানা আমরা দেখি, ‘রানওয়ে’ ছবিজুড়ে আমরা এমন মুন্সিয়ানার ছাপ অনেক দেখব এবং আনন্দিত হব। সেই তরুণের আমাদের দিকে আসার পরের দৃশ্যে আমরা দেখি একজন নারী একটি বালতিহাতে গোয়ালঘরের দিকে যায়, গাভীর দুধ দোয়ানো শুরু করে ঠিক এমন সময় গোয়ালের উপর দিয়ে সশব্দে একটি বিমান উড়ে যায়।

আমরা যে তরুণকে মসজিদকে থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছিলাম তাকে দেখি একটি বাসায় ঢোকার মুখে টিফিন কেরিয়ার হাতে বের হওয়া একটি মেয়েকে পাশ কাটায় এবং ছেলেটি মেয়েটিকে বলে ‘যাইতেছস’? মেয়েটি বলে ‘হ’। দূর থেকে ওদের কথা-বলা দেখেন গোয়ালঘরে বসা নারীটি। ফলে আমরা এদের আন্তঃসম্পর্ক বুঝে উঠি এবং নির্মাতা আমাদের বাড়তি কোনো ঝামেলা ছাড়াই গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিতে পারেন। ফলে ‘রানওয়ে’ ছবির গল্প স্বাভাবিক ছন্দে এবং কোনো বাড়তি জোরাজুরি ছাড়াই এগিয়ে যায় বা যেতে থাকে। আমরা দেখি ফাতেমা যে ঐ তরুণ রুহুলের বোন তার বন্ধু শিউলিকে নিয়ে ভোর হওয়ার আগে-আগেই টিফিন কেরিয়ার হাতে ছুটে যায় কারখানায়, যেখানে দিনের পুরোটা সময় এবং রাতের বেশ অনেকটা সময় দিয়ে মাস-শেষে যৎসামান্য টাকা পাবে। কোনো কোনো মাসে পাবে না, দুই বা তিনমাস বেতন না-দেওয়া কোনো অসুবিধা নয় এইসব কারখানামালিকদের এবং তাদের (ফাতেমা এবং শিউলিদের) শ্রমে এইসব কারখানামালিক চড়বে নতুন মটরকারে, উড়োজাহাজে, গড়বে প্রাসাদোপম বাড়ি।

আমরা দেখি রুহুল একটি কম্পিউটার-দোকানে যায়, এবং তার সম্বোধন থেকে আমরা ধরতে পারি যে কম্পিউটারের দোকান-মালিক রুহুলের মামা। প্রায় আইনস্টাইন-মার্কা চেহারা নিয়ে (মামার চেয়ারের পেছনের দেয়ালে আইনস্টাইনের পোস্টারও সাঁটানো দেখা যায়!) মামা রুহুলকে বলেন ‘ইয়াংম্যান, ইউ আর সো লেট !’ তিনি রুহুলকে আরও বলেন, ‘টাইম-সেন্স ছাড়া কিছুই হবে না। বুঝলি, আরে বাবা এইটা সাইন্সের যুগ’। আমরা বুঝি রুহুলদের পরিবারে সম্ভবত এই মামা একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি। কেননা, তিনি কথায় কথায় ইংরেজি বলেন এবং আমরা পরবর্তীতে দেখব তিনি নানাবিষয়ে আধুনিক থাকার চেষ্টা করেন। ছবিতে এই সাইবারক্যাফেটি অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠবে। এখানে আরিফ নামের তরুণের সাথে রুহুলের বন্ধুত্ব হয় এবং রুহুল ধীরে-ধীরে চরমপন্থার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নেয়।

ছবিতে প্রথমদিনের মতোই দ্বিতীয় দিনের দৃশ্য শুরু হয় রুহুলের মা রহিমার বালতিহাতে গোয়ালঘরে যাওয়ার দৃশ্য দিয়ে। এর আগেরদিনের পুরো চক্রটিতে নির্মাতা আমাদের ছবির প্রায় সব চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এবং আমরা গল্পের পরবর্তী অংশে যাওয়ায় জন্য পথ খুঁজতে থাকি। দ্বিতীয় দিনের দৃশ্যমালায় নির্মাতা আরোও তথ্য এবং চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গল্পের

এইদিন রুহুল মাকে বলে তাদের সমিতি থেকে কিছু টাকা এনে দিতে যাতে সে কিছু ছোটখাট একটা ব্যবসা শুরু করতে পারে। রুহুলের এই মনোভাব জেনে রাখা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, পরবর্তীতে যখন রুহুল চরমপন্থায় চলতে শুরু করবে তখন এই রুহুলই তার মাকে বলবে ইসলামে 'সুদ' নেয়া এবং দেয়া হারাম। ফলে তার এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণ আমরা বুঝতে পারি। গল্পের এই পর্যায়ে যখন রুহুল মামার কম্পিউটারের দোকানে যাবে, আর আমরা দেখব একজন কাস্টমার দোকানের ফোন থেকে বিদেশে কারও সাথে কথা বলছে। আমরা দেখি ফোনে কথা বলা কাস্টমারটি বিদেশে তার ভাইকে বুঝাতে চেষ্টা করছে যে একখণ্ড জমি পাওয়া গেছে যা খুব ভালো। সে (বিদেশে-থাকা ভাই) টাকা পাঠালেই জমিটা কেনা সম্ভব। পরে ফোনের বিল পরিশোধ করে কাস্টমার চলে যাওয়ার পর রুহুলের মামা বেশ পরিহাসছলেই বলেন, 'ইটস ডিউ টু দ্য ল্যাক অব সাইন্টিফিক নলেজ। আরে বাবা, এ দ্যাশ আর মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে ডুইবা যাবে। বিদ্যাশের হার্ড আর্ন মানি দিয়া জমি কিনে টাকা নষ্ট কইরা কোনো লাভ আছে? যত সব ফুলিশ থিংকিং!' মামার এই মন্তব্যের পর দোকানে-থাকা একজন তরুণ (আরিফ) মামার দিতে তাকিয়ে বলে, 'এইটা আপনি ঠিক বললেন না আংকেল। এইগুলো সব পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র। ওরা আমাদের তেল, গ্যাস নেবার জন্য প্রপাগান্ডা ছড়াইতেছে। ওরা চায় আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না-করি।'

'রানওয়ে' ছবিতে আরিফ নামের এই তরুণের এটাই প্রথম সংলাপ। ছবির পরবর্তীতে আমরা তাকে আবিষ্কার করব একজন ধীর-স্থির এবং ঠাণ্ডা মাথার জঙ্গি হিসেবে। গল্পের এক পর্যায়ে আরিফের সঙ্গে তার স্ত্রী সেলিনা'র যে কথোপকথন হবে সেখান থেকে আমরা জানতে পারি, জঙ্গি হওয়ার পূর্বে আরিফ অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল। যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করে। আরিফ পরবর্তীতে সেই রাজনৈতিক দলের হঠকারিতা ধরতে পেরে সেই রাজনীতি ছেড়ে চরমপন্থার পথ বেছে নেয়। এবং এই চরমপন্থার মধ্যদিয়েই সে ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে। ছবির শেষ অংশে আমরা দেখি আরিফ আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে নিজেকে হত্যা করে। ফলে আরিফ এই ছবিরই নয় সম্ভবত আমাদের চেনা-জানা জগতে একটি আলাদা চরিত্র। আমরা জঙ্গি বলতে আসলে কী বুঝি বা আমাদের কী বোঝানো হয়? আমাদের বোঝানো হয়, জঙ্গি হল এমন একটি ভয়ংকর প্রাণী যারা ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের নামে যে কাউকে হত্যা করতে পারে, যে কোনো ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে। তাদের কোনো দেশ নেই, ফলে দেশপ্রেম নেই। তাদের কোনো জাতি নেই ফলে জাতীয় সংস্কৃতি নেই। তারা শুধুমাত্র ধর্মের অনুসারী এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যা হারাম বা খারাপ বা অনুচিত তা এড়িয়ে চলে। তাদের সবকিছু তারা ঈশ্বর বা আল্লাহ থেকে আসে বলে মনে করে। ফলে আল্লাহর দুনিয়ায় যা-ই ঘটে তার সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে বলে তারা বিশ্বাস করে। আমরা আরও জানি যে,

এইসব জঙ্গিরা হবে মূর্খ এবং তারা সবরকম আধুনিকতার বিরোধী। কিন্তু আরিফের চরিত্রটি আমাদের এমন জানা-শোনার জগৎকে একটি জোর থাপ্পড় দিয়ে যায়। আমাদের চেনা-জগৎকে অচেনা মনে হয়। জঙ্গিবাদ বিষয়ক রাজনৈতিক যেসব প্রকল্প আমাদের চারপাশে অহর্নিশ ঘুরতে দেখি তাদের ঠুনকো এবং হাওয়াই মিঠাই বলে মনে হয়। জঙ্গি আরিফ যখন বলে 'এইগুলা সব পশ্চিমাবাদের ষড়যন্ত্র'। তখন আমরা নতুন কোনো তথ্য জানতে তৈরি হই। আরিফ যখন বলে, 'ওরা আমাদের তেল, গ্যাস নেবার জন্য প্রপাগান্ডা ছড়াইতেছে। ওরা চায় আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না-করি'।

তখন আমাদের মনে হয় এই আরিফের 'আমাদের' আর আমরা যে বলি 'আমাদের' এর মাঝে পার্থক্য আদৌ কি আছে? আরিফের বক্তব্যে যে 'তেল, গ্যাস নেবার প্রপাগান্ডার' কথা শুনি তা কি আমরা আগেও শুনিনি অথবা প্রায়ই শুনি না? আমাদের বাম রাজনৈতিক দলগুলো কি একই ভাষায় কথা বলে না? তাহলে একজন জঙ্গি এভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখায় কোথা হতে? আমাদের চেনাজানা জঙ্গি-বিষয়ক ধারণা আর এ পর্যায়ে কাজ করে না। আমরা নতুন সংকটের সামনে এসে দাঁড়াই যেখানে একজন জঙ্গিও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে, যে ভাবনা আমাদের কাছে খুব সম্ভবত সুখকর নয়। এই চ্যালেঞ্জ তারেক মাসুদ তাঁর 'রানওয়ে'র মধ্য দিয়ে আমাদের দিকে ছুড়ে দেন।

আমরা 'রানওয়ে' ছবিতে একে একে আমাদের দেশের যে সকল বাস্তবতার মুখোমুখি হই, এর প্রত্যেকটিই অন্যটির সাথে এমনভাবে গাঁথা যে আমাদের বোধে একটি সামগ্রিক চেহারাই ফুটে ওঠে। আমরা একটি থেকে অন্যটিকে খুব বেশি আলাদা করতে পারি না। অন্তত আমরা যখন ছবিটা দেখি তখন! 'রানওয়ে' ছবিতে রহিমা মানে রুহুলের মা এনজিও থেকে টাকা নিয়ে গরু পালেন। আমরা রহিমার সংলাপ থেকেই জানতে পারি গরুর দুধ-বেচা টাকায় লোন নেয়া টাকার কিস্তিই শোধ করা যায় না, সেখানে পরিবারের ভরণ-পোষণ হবে কোথা থেকে? আমরা দেখি কিস্তিয়ালা যুবক নতুন মটরসাইকেলে ভাঙা পথে আসে রহিমা'র কাছ থেকে কিস্তি তুলে নেয়ার জন্য, এসে সে তার মটরসাইকেল থেকে নামে না ইঞ্জিনও বন্ধ করে না, এত তাড়া! রাজসিক ভঙ্গিতে সে টাকার জন্য অপেক্ষা করে। আর ধার বা লোন নেয়া রহিমা প্রজার ভঙ্গিতে কাঁচুমাচু হয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে রহিমার কন্যা ফাতেমা দুই মাস ধরে গার্মেন্টসে বেতন পায় না। ফলে রহিমা কেমন করে কিস্তি দেবে? তখন কিস্তিয়ালা যুবক মোক্ষম প্রশ্নটি করে। সে বলে 'গার্মেন্টসের সাথে কিস্তির কী সম্পর্ক?' এবং এখানেই তারেক মাসুদ আমাদের দেখান বাংলাদেশের এনজিওগুলো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে দায়িত্ব পালন করছে তাতে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠি আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে ! ছবির পরবর্তীতে আমরা দেখব বৃদ্ধ দাদু যখন মুঠোফোন ধরে 'বিশ্বস্ত ব্যাংক' শুনতে গিয়ে শুনবেন 'বিশ্বব্যাংক', তখন নির্মাতার রসবোধ এবং রাজনৈতিক জ্ঞান ও

লক্ষ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা ধরে নিতে বাধ্য হব যে, যদিও ছবিতে ভুল করেই আমরা ঘটতে দেখি 'বিশ্বস্ত ব্যাংকে'র কর্মকর্তা ফোন করেছে ঋণগ্রহণকারীর কাছে ঋণের কিস্তি শোধ করার বিষয়ে জানতে। কিন্তু যিনি ফোন ধরেছেন তিনি শুনলেন 'বিশ্বব্যাংক' থেকে ফোন এসেছে। ফলে আমরা বুঝে নেই আমাদের চারপাশের 'বিশ্বস্ত ব্যাংকে'র আড়ালে বিশ্বব্যাংকের চেহারাটা! আমরা এভাবেই আমাদের দেশের এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই তারেক মাসুদের 'রানওয়ে' চলচ্চিত্রে।

ছবিতে রুহুল যখন একের পর এক চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে তখন আমরা তাকে হতাশ হতে দেখি। কিন্তু রুহুলকে তখনও আমাদের অসহিষ্ণু কিংবা বেপরোয়া মনে হয় না। বরং একদিন রিক্সায় করে অন্যত্র যাওয়ার পথে যখন রুহুলের রিক্সাচালক সামনে থেকে হঠাৎ ব্রেক করা একটি গাড়ির কারণে ব্রেক করেও শেষরক্ষা করতে পারে না ফলে গাড়ির বাম্পারে রিক্সার চাকা ধাক্কা দেয়। তখন গাড়ির মালিক বেরিয়ে এসে অন্যায়ভাবে রিক্সাচালককে গালাগালি দিতে থাকে এবং মারতে উদ্যত হয়। এমন অবস্থায় রুহুল এর প্রতিবাদ করে। এসে গাড়ির মালিককে অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করে। ফলশ্রুতিতে গাড়ির মালিক রুহুলকে অশ্রাব্য গালাগালির সাথে উপর্যুপরি মারতে থাকে। অন্যায়ভাবে মার খাওয়া, চাকরি না-পাওয়াসহ নানা কারণেই রুহুল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দিনের রুহুলের ঘরে ফেরার সময়ে সে যেভাবে দানবীয় বিমানকে পেছনে ফেলে আসে এবং বিমানের বিশাল আকারের বিপরীতে তাকে রীতিমতো দুর্বল এবং অসহায় বলে মনে হয়। যা মিশুক মুনীরের ক্যামেরা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরে। ফেরার পথে রুহুল যখন দেখে সেই বিশাল বিমানকে সামান্য গুলতি দিয়ে গোলা তাক করছে একটি ৭-৮ বছরের একটি বাচ্চা তখন রুহুল তা দেখে স্মিত হাসে। যা এই ছবির একটি দুর্লভ মুহূর্ত বলে মনে হয়। রুহুলের এই হাসি এবং ঐ বাচ্চার যে অনমনীয় ভঙ্গি তা একটি বিশেষ বার্তা বহন করে। তা যেন অপরাজেয় মানবিক অহংকে মূর্ত করে তোলে। ছবির ধারাবাহিকতার জন্যও যা বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত। এবং রুহুলের মনোভাবে আগামীতে যে পরিবর্তন ঘটবে তার ইঙ্গিত তুলে ধরে। একজন রুহুলের আমাদের আধুনিকতম শহরে এবং কর্মক্ষেত্রে অনুপযোগী হয়ে যাওয়াকে আমরা রোধ করতে কিছুই করি না, কিছুতেই যেন আমাদের কিছু যায়-আসে না। ফলে পুরোমাত্রায় সচেতন থাকার পরও বরং আমরা দেখব পরবর্তীতে জঙ্গিনেতা 'উর্দুভাই' যখন 'আসমানে' থাকে তাদের 'পরমপিতা'র সাথে দেখা করতে যায় তখন সেই 'পরমপিতা' বলেন যে কওমি মাদ্রাসা বিলটি যে পাশ করিয়ে দিলাম তাতে আপনাদের মানে 'উর্দুভাই'দের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়েছে। ফলে যারা ক্ষমতায় থাকে পদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্য রুহুল, আরিফদের জিহাদি হতে হয়, তারা শহিদ হয়ে সোজা জান্নাতবাসী হয়ে যাবে এমন গল্পে আশ্বস্ত হয়ে ওঠে। আর এর মাধ্যমে রুহুল কিংবা আরিফরাও

ভাবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের গ্লানি কিংস্বা ক্ষোভ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথে শহিদ হয়ে সোজা জান্নাতবাসী হওয়াই একমাত্র 'আল্লাহর রাস্তা'। ফলে 'রানওয়ে' পরতে পরতে আমাদের সামনে তার গল্পের ঝাঁপি খুলে ধরে যা আমাদের মগজে আলোড়ন তোলে, আমরা ভাবতে বাধ্য হই।

'রানওয়ে' ছবিতে জঙ্গিদের নেতা উর্দুভাইয়ের বয়ান থেকে আমরা শুনি তাদের সিরিজ বোমা হামলার কারণে দেশের সব সিনেমাহল বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রা, বাউলগানের অনুমতি দিচ্ছে না সরকার, মাজারে বা দরগাগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। আবার ছবিতে উর্দুভাই যখন তাদের পরমপিতার সাক্ষাতে যেসব আলোচনা করে তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই উর্দুভাইদের মতো লোকজনের তৎপরতার নিরাপত্তা দেয় ক্ষমতায় আরোহণকারীরা। ফলে এসকল কর্মকাণ্ডের রাস্তা সহজ করার জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা বিপুলভাবে মজুদ আছে। আবার 'পরমপিতা' যখন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এই বলে যে বিচারকদের ওপর কোনো হামলা হলে তারা আর কোনো প্রটেকশন দেবে না, তখন আমরা দর্শকরা বুঝতে পারি উর্দুভাইদেরও আসলে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। তাদের দিয়ে যতটুকু কাজ ক্ষমতাকাঠামোর করিয়ে নেয়া দরকার ততটুকুই করানো হবে। এর বেশি কিছু করতে গেলে যদি পরমপিতাদের ক্ষমতায় কোনো কারণে সমস্যা হয় তাহলে তাদের ওপর 'অ্যাকশন' নেমে আসবে এবং নেমে আসেও। ফলে বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গীবাদ যে আসলে বাংলাদেশের ক্ষমতাকাঠামোতে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়ায় বেড়ে-ওঠা গোষ্ঠী তা তারেক মাসুদ আমাদের দেখান এবং বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতাও তাই। ফলে আমরা একই সাথে আনন্দিত হই চলচ্চিত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসাতে এবং নির্মাতার কলানৈপুণ্যে ও সাহসে আশ্বস্ত হই।

'রানওয়ে' ছবিতে সিনেমাহলে বোমা হামলার দৃশ্যটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। সিনেমাহলের প্রকৃত পরিবেশ তুলে ধরে নির্মাতা– আমরা যারা দাবি করি যে এখন আর আমরা সিনেমাহলে যাই না, তাদের সিনেমাহলে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন সিনেমার মধ্য দিয়ে। আমরা দেখি পোশাকশ্রমিকেরা দলে দলে সিনেমাহলে 'আমাদের' জন্য অসহনীয় পরিবেশে সাকিব খান, শাবনূর অভিনীত গানে ঠোঁট মিলিয়ে গাইছে 'কিছু কিছু মানুষের জীবনে ভালোবাসা চাওয়াটাই ভুল', যারা এই গানে ঠোঁট মিলিয়ে গাইছে তাদের জীবনে আরো অনেক কিছু চাওয়াকেই ভুল প্রমাণ করে রাখা হয়েছে– তা যেন চোখের সামনে এনে দেখান নির্মাতা। আমরা যারা সিনেমাহলে যাই না কিন্তু তারেক মাসুদের ছবি দেখি, তাদের জন্য তারেক মাসুদ 'রানওয়ে' ছবির গল্পে দেখান

ছবি-দেখাটা কত মানুষ কত আনন্দ নিয়েই দেখে। সিনেমাহলে যাওয়াটা তাদের জন্য এখনও উৎসব!

সেই সিনেমাহলে বোমা হামলা হয়। সাধারণ মানুষ হতাহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্র। যাত্রা, গান কিংবা বাউলদের আসরে কারা যায়? তারা তো সাধারণ মানুষই। ফলে 'রানওয়ে' ছবিতে আমরা দেখি সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত অলিখিত যুদ্ধ চলে। যারা যুদ্ধের নীলনকশা করে তারা থাকে 'আসমানে', তাদের বাহন উড়োজাহাজ। ফলে 'রানওয়ে' ছবিতে যখন বারবার বিমানের শব্দে চারপাশ কেঁপে ওঠে, তখন যেন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজছে বলে মনে হয়। এই সাধারণ মানুষই বাংলাদেশের প্রবাসীশ্রমিক, পোশাকশ্রমিক, এনজিওগুলোর ঋণগ্রহীতা এবং মাদ্রাসায় পড়া দরিদ্র ছাত্র। 'রানওয়ে' ছবিতে নির্মাতা সমকালীন মোবাইল ফোন বা মুঠোফোন সংস্কৃতিকেও পুরোমাত্রায় হাজির করেছেন। আমাদের দেশের আর কোনো মাধ্যমে অথবা দৃশ্যমাধ্যমে আমরা বলতে শুনিনি 'মোবাইলের ষাট সেকেন্ড মানে দুই মিনিট'! একটি দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের সময়জ্ঞান নিয়ে এমন পরিহাস এদেশের এই মোবাইল ফোন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দিনের পর দিন করে গেছে আর তা আমাদের অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে আসেনি। আমারাও আনন্দচিত্তে 'ষাট সেকেন্ড মানে দুই মিনিট' মেনে বিল দিয়েছি আর কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফা বাড়িয়েছে। 'রানওয়ে' ছবিতে এই প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। একজন তরুণ বলেন, 'ঠিক আছে রাখেন কিন্তু এইটা উচিত অইলনা'। 'ষাট সেকেন্ড মানে দুই মিনিট' এটা যে অনুচিত এ কথাটা আমরা আরো জোর গলায় বলতে পারিনি। আমাদের এমন অনেক দৈন্যতা এই ছবিতে সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে যাতে ছবিটা দেখতে দেখতে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। আমরা 'রানওয়ে' ছবিতে উর্দুভাইকে বলতে শুনি, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিভাগে তাদের লোক আছে। আমরা দেখি জঙ্গিরা প্রশিক্ষণ নেয় আফগানিস্থান এবং চেচনিয়ার জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ভিডিও দেখে। ফলে এইসব জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক কোনো যোগাযোগ আছে কি নেই তা পরিষ্কার হয় না। নির্মাতাও এই বিষয়ে সংযমী থাকেন। বিষয়টা আমাদের দর্শকের ভাবনায় চলতে থাকে। 'রানওয়ে' ছবির শেষ দৃশ্য– যেখানে রহিমা তার ফেরত-আসা ছেলে রুহুলের মুখ সদ্য-দোয়ানো গরুর দুধ দিয়ে ধুইয়ে দেন। এই দৃশ্য প্রথমবার 'রানওয়ে' দেখার পর কেমন যেন বাড়তি এবং আরোপিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু 'রানওয়ে' যখন দ্বিতীয়বার দেখি তখন দৃশ্যটি আর বাড়তি মনে হয় না।

আরোপিতও মনে হয় না। এর কারণ হয়তো হবে আমাদের নাগরিক চোখ মায়ের এমন স্নেহের প্রকাশ বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছিল। একজন মায়ের হারিয়ে যাওয়া কিংস্বা বিপথে যাওয়া পুত্রের ফিরে আসার এই উদ্‌যাপন 'নাগরিক মন' দিয়ে ধরা যায় না। যাবে না। এই আবেগ অনেক বেশি বিশুদ্ধ, অনেক বেশি নির্মল। যা প্রথম দেখায় বাড়তি, বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল!

'রানওয়ে' ছবিতে বিষয়বস্তু এত কেন? ভাবনাটা নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছি, উত্তর যা পেয়েছি তা-ও সরল নয়। 'রানওয়ে' সমকালীন বাংলাদেশ নিয়ে চলচ্চিত্র। সমকালীন বাংলাদেশে মানুষের জীবন অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি ব্যস্ত, অনেক বেশি সংগ্রামমুখর। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে একটু বয়স হলেই শিশুদের রোজগার করতে পাঠিয়ে দেয়ার কারণও তো এই-ই। জীবনযুদ্ধ অনেক নির্মম এবং নিষ্ঠুর। যদিও এত কঠিন এবং জটিল হওয়ার কথা নয় এদেশের মানুষের জীবন। এদেশের মানুষের আরও একটু ভালো, সহজ জীবন প্রাপ্য। কিন্তু দেশটি ১৬ কোটি মানুষের একটি বিশাল বাজার যা বিশ্বায়িত ভুবনে লোভনীয়। ফলে একে নিয়ে আন্তর্জাতিক কাড়াকাড়ি আছে, আছে স্থানীয় রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা এবং মানুষ-বিরোধী রাজনীতি। ফলে দেশটি একটি উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত হয়েছে। যার কোনো নিয়ন্ত্রণকারী নেই। কোনো কর্তা নেই। ফলে অহর্নিশ লুটপাট এদেশে, এ ময়দানে ঘটে চলেছে। ভুক্তভোগী সেইসব নিরীহ সাধারণ দরিদ্র মানুষ যারা নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর শত চেষ্টায় শতবার ব্যর্থ হয়, ব্যর্থতা তাদের নিয়তি বলেই মনে হয়! আর তাই এদেশের মেয়েরা হবেন 'বস্ত্রবালিকা', ছেলেরা হবে মাদ্রাসাছাত্র। সন্তানদের পিতা হবেন দেশান্তরী। আর সন্তানদের মা হবেন 'সর্বজয়া'। তিনিও নিরাপদ নন। এনজিও তাঁকেও খাবে। তারেক মাসুদ একটি পরিবারের গল্প বলতে চেয়ে বাংলাদেশের সকল প্রান্তিক পরিবারের গল্প বলেছেন। ছবির নাম 'বাংলাদেশ' রাখতে গিয়ে রূপকার্থে হয়তো 'রানওয়ে' রেখেছেন। নির্মাতাকে অভিনন্দন জানাই।.

নাটকের রবীন্দ্রনাথ: সৌন্দর্য ও রসবোধ

ফরীদুল আলম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র নাট্যব্যক্তিত্ব। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ অন্য নাট্যকারদের থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমকালীন নাট্যকারদের থেকে কোন প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র, সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেছেন, 'জনসাধারণের রুচি ও শিক্ষা সংস্কারাদির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে বড় লক্ষ্য করেন নাই... সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁহার নাটক বেশি অভিনীত হয় নাই, কারণ, তাঁহার অধিকাংশ নাটকই Closet-Drama বা বৈঠকী-নাটক জাতীয়। কাব্য ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাদির দিক দিয়া দেখিলে সেগুলি যে অপূর্ব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না কিন্থ সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে এক রূপ অসাধ্য... নাটকীয় ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নাটকগুলো লেখা হয় নাই, পরন্তু সেগুলি তাঁহার ভাবের বাহন স্বরূপই রচিত হইয়াছে।' [বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ– অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:১৯৫৯,পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭]

উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতীকী নাটকগুলোর কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের প্রতীক হচ্ছে 'অন্ধকার ঘর' এবং তার বক্তব্য: রূপ-বুদ্ধি-ঐশ্বর্য এসবের অহমিকা দূর হলেই দেখা দেয় পরম সুন্দর। তাঁর 'মুক্তধারা'-র প্রতীক 'যান্ত্রিক বাঁধ ও শিবমন্দিরের ত্রিশূলচূড়া', এবং বক্তব্য: যন্ত্রদানবের ওপর আত্মা ও কল্যাণশক্তির জয়। 'রক্তকরবী'-র প্রতীক 'জালের বেষ্টনী ও রক্তকরবীর গুচ্ছ', এবং বক্তব্য: যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ ক্রমে পরিণত হয়েছে যন্ত্রদাসে, তাই সে হারিয়েছে জীবনের সোনারঙ আনন্দকে। 'ডাকঘর' নাটকের প্রতীক 'অমলের ঘর ও বাতায়ন', এবং বক্তব্য হচ্ছে: এই পৃথিবীর দৃশ্য-গন্ধ-গান সবটুকু গ্রহণ করে প্রাণের রথ চলেছে রূপ থেকে অরূপে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাজীবনের পথযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক ও বক্তব্যভিত্তিক নাট্যকৃতির এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটক। ‘রক্তকরবী’-র বিষয়বস্তু সম্পর্কে খোদ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

‘যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আসছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল! প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর। প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বদ্ধ জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাহাই বর্ণিত আছে।’

যক্ষপুরের রাজা বস্তুত বর্তমান যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সভ্যতা ‘আকর্ষণজীবী’, কারণ, শোষণ ও আহরণ এ সভ্যতার ধর্ম। হিংসা-দ্বেষময় এই সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশের পুরনো প্রেমমাধুর্য আনন্দময় ‘কর্ষণজীবী’ সভ্যতাকে দলিত পর্যুদস্ত করে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেছে। ফলে, মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে এক দুঃসহ অবস্থা, যার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, ‘রক্তকরবী’-র নাট্যকারের মতে– নির্বাসিত মানবতাকে ফিরিয়ে এনে প্রেমরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ‘নন্দিনী’ এই প্রেমানন্দদাত্রী মানবতার প্রতীক।

দুই.

ভারতীয় উপমহাদেশে গীতিনাট্য বা নাট্যগীতি নামে বেশ কয়েকরকম নাটকের প্রচলন বহুকাল ধরে চলে আসছে। যে নাট্যে সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীতেরও অবতারণা থাকে এবং সঙ্গীত সংলাপেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেগুলো গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথের ‘শারদোৎসব’ (১৯০৯), ‘অচলায়তন’ (১৯১৫), ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৮)– এসব রূপক-সাংকেতিক নাটকের মূলভাব আরও বেশি স্পষ্ট ও তাৎপর্যময় করার প্রয়োজনে গানের সাহায্য নেয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ (১৮৮১), ‘কালমৃগয়া’ (১৮৮২), ‘মায়ার খেলা’ (১৮৮৩)–এসব গীতিনাট্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের কথাবার্তা সুরে রচিত। হৃদয়াবেগকে সাধারণ সংলাপে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সুন্দর করে অভিব্যক্ত করা যায়– কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায় কবিতার ছন্দে; সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় তখন তা হয়ে ওঠে অপূর্ব ও রসাত্মক। এ কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশে গীতিনাট্যের অংশ হিসেবে নাচ ও গানকে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬), ‘শাপমোচন’ (১৯৩১), ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৫) প্রভৃতি এ পর্যায়ের নৃত্যনাট্য।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, অথচ সঙ্গীতমুখর। এই নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হচ্ছে–

"আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটি অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোরম আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল– এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।... কাব্য হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানাবেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।" [জীবন-স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পীমানসে এই বিচিত্র জগৎ তার রূপ-রস, তার সৌন্দর্যময়তা, তার আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-দৈন্য, রহস্য এবং বাস্তবতা নিয়েই বার বার ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই গতিশীল জগতের বৈচিত্র্য সঞ্চয় করে বিচিত্র রূপকগুলোকে নানা রঙে-রসে সাজিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল ভাষায় রূপায়িত করেছেন। তাঁর প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মিকীপ্রতিভা' থেকে শুরু করে 'শ্যামা' পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে আমাদের উপলব্ধিতে আসে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলোতে রূপরস ও ছন্দের বৈচিত্র্য অভিনব বৈশিষ্ট্যে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং রূপক-সাংকেতিক নাট্য– সব ধরনের নাটকগুলোর বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে গান। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলো গীতিনাট্যগুলো রচনার বহুদিন পরে রচিত হলেও এ নাটকগুলোর মূল তাৎপর্য গানেই ব্যক্ত করা হয়েছে। বিবিধ অর্থগৌরবমণ্ডিত রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোর চিত্রধর্মিতা গানের ভাষায় রূপময় করে পরিবেশন করা হয়েছে। 'শারদোৎসব'-এ ১০টি, 'রাজা'-য় ২৫টি, 'অচলায়তন'-এ ২৩টি, 'মুক্তধারা'-য় ১৪টি, 'ফাল্গুনী'-তে ৩১টি, 'রক্তকরবী'-তে ৮টি এবং 'তাসের দেশ' নাটকে ৩০টি গান আছে। এ গানগুলো নাটকগুলোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোতে অধিকাংশ গান-ই নৃত্যকেন্দ্রিক। বিশেষত, 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ফাল্গুনী' এবং 'তাসের দেশ' নাটকগুলোর বেশ কিছু গান নৃত্যের আবেগময়তা ও ছন্দসুষমায় মণ্ডিত।

নাটকে গান ও নাচ সংযোজন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে– "আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু

ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে, দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখবার রস দেবার জন্যই অভিনয়।" [জাভাযাত্রীর পত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

তিন.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম এবং পরিচিত প্রথায় লেখা পঞ্চাঙ্ক নাটক হচ্ছে 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯)। প্রধানত পদ্যবন্ধে রচিত এ নাটকে হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়ে ধরে রাখার বাসনা এবং 'সমগ্র মানব'-কে পাওয়ার দুর্বাসনা ও দুঃসাহসকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশিত হবার এক বছরের মধ্যেই নাটকটি 'এমারেল্ড থিয়েটার'-এ অভিনীত হয়েছিল। এ অভিনয়ের পর নাট্যকার ও গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছিল। 'বিসর্জন' (১৮৯১) রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে বিশিষ্ট পরিচিত-ধরনের নাটক। অন্ধ সংস্কার, মূঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকারবোধের সঙ্গে গভীর হৃদয়বৃত্তি, উদার জ্ঞান ও নিরাসক্ত জীবনবোধের সংঘর্ষ এ নাটকের উপজীব্য রস। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে পরিচিত-ধরনের নাটকের সামগ্রিকতা নেই কিন্তু নাটকীয়তা ও গীতিকাব্যসুষমা পরিপূর্ণভাবে আছে। অর্জুনের ইমোশনাল অভিব্যক্তিকে অবলম্বন করে নায়িকা চিত্রাঙ্গদা এই নাট্যকাব্যটির পটভূমিকা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকার করে রেখেছে। কিশোরযোদ্ধার বেশধারিণী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন যখন প্রথমবারের মতো দেখে তখন তার মনে শুধু কৌতুকের তরঙ্গ খেলেছিল। চিত্রাঙ্গদা আগে থেকেই অর্জুনের বীরখ্যাতিতে মুগ্ধ ছিল– অর্জুনকে দেখার পর তার মনে বিস্মৃত নারীসংস্কার জেগে উঠল। রূপহীন কিশোরীর প্রণয়নিবেদন ব্যর্থ হলে চিত্রাঙ্গদা রূপের সাধনা করে যৌবনের দীপ্তির ফাঁদে অর্জুনকে জড়াতে সক্ষম হয়। এরপর শুরু হল চিত্রাঙ্গদার অন্তর্দ্বন্দ্ব– ক্ষণলব্ধ ভোগসুখের মধ্যে চিরন্তন প্রেমের পিপাসা জেগে উঠল। অর্জুনের কাছে তাই তার কুণ্ঠা ঘোচে না। ছলনার মাধ্যমে সাধিত মিলনে তৃপ্তি না পেয়ে তার নারীহৃদয় সত্যমিলনের জন্য উদ্যত হয়েছে– রূপের অভিশাপ চিত্রাঙ্গদা-কে পলে পলে দগ্ধ করে যায়। এক বছরের মধ্যেই দেহের ভোগে ক্লান্তি এসে অর্জুনের রূপতৃষ্ণা মিটে গেলে চিত্রাঙ্গদার সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে অর্জুনের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ও প্রেমের উদয় ঘটে। কোনরকম পিছুটান না রেখেই চিত্রাঙ্গদার প্রেম অর্জুনকে মহত্ত্বর কর্তব্যক্ষেত্রে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় তুলে ধরেছেন।

'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪) প্রধানত কাব্যরসপ্রধান নাট্যকবিতা, অমিত্রাক্ষরের পরিবর্তে মিত্রাক্ষর ছন্দে রবীন্দ্রনাথ এটি রচনা করেছেন এবং এই রীতিই পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলোতে অবলম্বন করেছেন। 'মালিনী' (১৮৯৬) একাধারে নাট্য এবং কাব্য, এ নাটকের উপসংহার গ্রিক ট্রাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে একটি গল্প-নাট্য। সাধারণ নাটকের মতো কাহিনী হলেও এটিতে কোনো বর্ণনা নেই, শুধুমাত্র

সংলাপ রয়েছে। দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ এটিকে সাধারণ নাট্যমঞ্চের উপযোগী রূপ দিয়ে 'চিরকুমার সভা' (১৯২৫) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

প্রথম রূপক-সাংকেতিক নাটক 'শারদোৎসব'-এ রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি মানুষের হৃদয়বৃত্তি অতিক্রম করে মানবসত্তার অনুভাবের সামর্থ্যের ওপর পড়েছে। 'শারদোৎসব' এবং পরবর্তী অধিকাংশ নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক রূপকের ঝলক ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির ঋতুচক্রের মতোই মানুষের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বেও সর্বদাই কান্নাহাসির পালাবদল চলছে। দুঃখবেদনাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা না করে দুঃখবেদনাকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করে নিলেই আনন্দের ক্ষেত্রে ছুটি পাওয়া যায়। সংসারবন্ধনকে অস্বীকার করে নয়– তাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে স্বীকার করে নিয়ে, দুঃখে-সুখে নির্দ্বন্দ্ব সাধনাই হচ্ছে মুক্তির পথ। শরৎকালে প্রকৃতির পটে এই সহজ আনন্দসাধনার রূপটি ফুটে উঠে। বর্ষার কালো মেঘ ধরণীর বুকে ধারা বর্ষণ করে দিয়ে ভারমুক্ত শ্বেত অভ্রের রূপ নিয়ে হিমালয়ের দিকে চলে যায়– এটাই 'শারদোৎসবের' বাণী। 'শারদোৎসবের' কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্ন্যাসী এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন ঠাকুরদাদাকে।

'শারদোৎসব'-এর সমধর্মী রচনা 'ফাল্গুনী-তে সংলাপের বদলে গানের প্রাধান্য রয়েছে। মানবজীবনের আরম্ভ তার জন্মমুহূর্তে নয়– অবসান তার মৃত্যুলগ্নে নয়– জীবন-মৃত্যু এই দুই তোরণের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রবহমান পথ প্রসারিত– এটাই 'ফাল্গুনী'-র বাণী। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় মঞ্চায়িত হয়েছিল এই নাটক, তার ঠিক আগে আগে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

"ফাল্গুনী-র ভিতরের কথাটি অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন।... ফাল্গুনী-তে গীতিনাট্যাংশটুকু হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যুগুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সেই বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা, শীতবসন্তে মানবপ্রকৃতিতে সেই লীলা জরাযৌবনে, জন্মমৃত্যুতে। এই কথাটিকেই গীতে এবং নাট্যের মাধ্যমে ফাল্গুনীতে প্রকাশ করা হয়েছে।"

১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'বসন্ত' এক হিসেবে 'ফাল্গুনী'-র উপসংহার। এই নাটকে বসন্তের দ্বিতীয় পালা– প্রকৃতির প্রৌঢ়যৌবনসমৃদ্ধির অভিনন্দন। এটিতে গানের প্রাধান্য রয়েছে। সমৃদ্ধির সার্থকতা শুধু প্রাচুর্যে নয়, সে-সঙ্গে চাই ত্যাগের নিরাসক্তি– এটাই 'বসন্ত' নাটকের মর্মকথা।

১৮৮২ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর কাহিনী অবলম্বনে পাঁচ অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটিতে ২৩টি গান রয়েছে। 'রাজা' (১৯১০) নাটকের সমস্যা হিসেবে প্রেমের দহন ও

দীপ্তি স্থান পেয়েছে। এ নাটকে কোনো অঙ্কবিভাগ নেই। বিশটি দৃশ্যে বিভক্ত। সংক্ষিপ্ত সময়ে অভিনয়ের উপযোগী করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'-কে নবরূপ দিয়েছিলেন 'অরূপরতন' (১৯১৯) নামে।

'অচলায়তন' নাটকে কাহিনী ও রূপক অবিচ্ছেদ্য। এই নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের মৌলিক ইতিহাসের যে কোনো বিশেষজ্ঞের রচনার তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন স্রোতোধারা, ১২০৬ সালে তুর্কি আক্রমণের পূর্ব হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত– যেভাবে বেগহীন মজা জলধারায় পরিণত হয়েছে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে 'অচলায়তন'-এ। সাধনার নামে বাইরের দিককে অস্বীকার করে নিজেকে কল্পিত বাধানিষেধের বেড়িতে বেঁধে রেখে আত্মাকে পীড়িত করলে পরিণামে সর্বগ্রাসী জড়ত্ব আসবেই এবং উপেক্ষিত বাইরের দিককে চিরকাল ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয় ধর্মসাধনার ভালো এবং মন্দ-দুই পরিণতিকেই রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন। ভালোর মধ্যেও দুর্বলতার পদক্ষেপ 'অচলায়তন'-এর উদারতম চরিত্র আচার্য-র মধ্যে লক্ষ করা যায়। মন্দের মধ্যে ভালোর নির্দেশ রয়েছে কঠিনতম চরিত্র মহাপঞ্চক-এর চরিত্রে। এ নাটকটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'গুরু' নামে ১৯১৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।"

'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকে আমরা দেখতে পাই ডাক-হরকরার কড়ানাড়া মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অকস্মাতের আশা, অপ্রত্যাশিতের আনন্দ। চিঠির মধ্যে আছে না-জানি কার নিমন্ত্রণ, কার আগমনী! এটাই তো অন্তরের চকিত আনন্দ-উপলব্ধির উপযুক্ত রূপক। অমল চরিত্রটির সুদূরের পিয়াসী শিশুচিত্তটিকে আমাদের সংসারখাঁচায় আটকে রাখতে চায়। অমল অপেক্ষা করে আছে রাজার চিঠির জন্য। বিচ্ছেদ মাত্রেরই বেদনা আছে, সে বেদনা লুপ্ত হয় তখনই যখন আনন্দের নিমন্ত্রণ আসে। সে আনন্দটুকু বন্ধনচ্ছেদ সহজ করে দেয়। তাই রাজার চিঠি যখন এসে পড়ল তখন অমল অজানার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর দুয়ারটুকু নিঃসংশয়ে অতিক্রম করে গেল। এ নাটকে দৃশ্যবিভাগ আছে, তবে কোনো গান নেই।

'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে ভারতীয় উপমহাদেশসহ ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকার ভবিষ্যতের মানুষের জীবনমরণের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত ভাবনাট্যের উপস্থাপনে তুলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধিকে চণ্ড রূপ দিয়েছে। সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বেনিয়াবৃত্তি পৃথিবীর বুকে যে পীড়ন চালিয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণপ্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হবেই। মানুষ যন্ত্রের দাস না হয়ে বরং যন্ত্র মানুষের দাস হবে– এটাই 'মুক্তধারা'-র মূল কথা।

'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকের কাহিনীতে রূপক ও গল্প অবিচ্ছেদ্যভাবে জমাট বেঁধেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী-র সাজ রক্তকরবী ফুলে এবং এই ফুল দিয়ে অথবা না-দিয়ে তার প্রেম ও প্রীতির গতি সূচিত। আধুনিক কালে সভ্য মানুষের বুদ্ধিচর্চা তাকে প্রকৃতির নিগূঢ় শক্তির অধিকারী করে তুলেছে। এই শক্তিমদমত্ততায় ও সে-সূত্রে আগত লুব্ধতার ফলে মানুষের হৃদয়বৃত্তি সংকীর্ণতর হয়ে পড়ছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে জীবনধারায় মানুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। নিখিল-জীবনপ্রবাহবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিজীবন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হলে হৃদয়ের শুষ্কতা ও শূন্যতাই বেড়ে যায়। আনন্দের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে আসে। মৃত্যু জীবন হতে নবজীবনে উত্তীর্ণ হবার তোরণদ্বার। নিখিল-জীবধাত্রী প্রকৃতি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ব্যষ্টিজীবনকে প্রবহমান রাখে। মৃত্যুকে ভয় করে তাকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা আত্মহত্যারই নামান্তর। জীবনের সহজ ও সরল আনন্দ অনায়াসে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাকে ধরে রাখা যায় না। জীবনের আনন্দ জীবনের বেদনারই আরেকটি রূপ। দুঃখবেদনা অনুভব না করলে, অনেক কিছু ত্যাগ না করলে, সহজ-আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের অন্তরবাণী এই যে তত্ত্বকথা– এটিই 'রক্তকরবী' নাটকের রূপকে প্রমূর্ত।

১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ছোট নাটকের মতো নাট্যদৃশ্য লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'রথযাত্রা'। পরবর্তী সময়ে কবি এইটিকে পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত করে 'রথের রশি' নাম প্রদান করেন এবং আর একটি অতিক্ষুদ্র দ্বি-সংলাপ রচনা যোগ করে 'কালের যাত্রা' নাম দিয়ে ১৯২৩ সালে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর '৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে কবির সস্নেহ উপহার' হিসেবে প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালের পরে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন যে, তাঁর কিছু নাটক নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে নতুন করে প্রয়োগ করা প্রয়োজন– এই উপলব্ধি থেকে তিনি তাঁর পুরনো নাটক 'রাজা ও রানী'-কে নতুন রূপ দিয়ে 'তপতী' (১৯২৯) নামে প্রকাশ করেছিলেন। এটি পুরোপুরি গদ্যে লেখা হলেও কয়েকটি গান রয়েছে।

সাধারণ মঞ্চাভিনয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯০৩ সালে লেখা ছোটগল্প 'কর্মফল' অবলম্বনে নাটক 'শোধবোধ' (১৯২৫) রচনা করলেন; ১৯১৪ সালে লিখিত 'শেষের রাত্রি' ছোটগল্প অবলম্বনে রচিত হল নাটক 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫); ১৮৯২ সালে লিখিত 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-কে অবলম্বন করে লিখলেন 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নামের নাটকটি।

গল্পকে অবলম্বন করে নাটক রচনার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের কবিতা অবলম্বন করে নাটক রচনায় ব্রতী হলেন। বহুকাল আগে লেখা 'পূজারিণী' কবিতা অবলম্বনে লিখলেন চার অঙ্কের নাটক 'নটীর পূজা' (১৯২৬)। এই নাটকে অঙ্কবিভাগ থাকলেও দৃশ্যপরিবর্তন রয়েছে একবার মাত্র– একেবারে শেষ অঙ্কে। ১২টি গান এবং ২টি দৃশ্যসম্বলিত 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। 'নটীর পূজা'য় নৃত্যের প্রয়োগে অভাবিত ফল পাওয়ায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনটি

গীতিনৃত্যনাট্য লিখলেন– নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৫), ‘চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য’ (১৯৩৮) এবং ‘শ্যামা নৃত্যনাট্য’ (১৯৩৯)। এই তিনটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়াবহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তিনি এসব রচনায় গানের ছন্দে মিল পরিত্যাগ করে মুক্তবন্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ৪টি দৃশ্যে গঠিত নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’র কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে ‘পরিশোধ’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

চার.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘নটীর পূজা’ নাটকটি নিয়ে কিছু কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। এই নাটক অবলম্বনে বিখ্যাত ‘নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড’ চলচ্চিত্র কোম্পানি ১৯৩২ সালে ‘নটীর পূজা’ নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে এবং মুক্তি প্রদান করে। ‘নটীর পূজা’ নামে চলচ্চিত্র পরিচালনা উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকদিন নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর কলকাতার স্টুডিওতে এসেছিলেন। তারপর আর কোনো উপলক্ষে কবির স্টুডিওপাড়ায় আসার সংবাদ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথের এই আগমনের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-তে বর্মী ধাঁচে নির্মাণ করা হয় বিখ্যাত ‘গোলঘর’– পরিচালনা দেখার অবকাশে কবি এখানে এসে বসতেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, চলচ্চিত্রটির ভূমিকাস্বরূপ পর্দায় রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠ আবৃত্তি পাঠসম্বলিত এই ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রটি দেখার সৌভাগ্য থেকে বর্তমানের দর্শক বঞ্চিত– ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আগুন লাগলে
অনেক চলচ্চিত্রের নিগেটিভের সঙ্গে এই চলচ্চিত্রের নেগেটিভও ধ্বংস হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ‘নটীর পূজা’ লিখেছিলেন প্রতিমা দেবীর অনুরোধে। ১৩৩৩ বাংলা সনের ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে উৎসবের পরে প্রতিমা দেবী কবিকে এই বলে অনুরোধ করেন যে, তিনি ২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিনে শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয় করাতে চান। কবি যদি ‘পূজারিণী’ কবিতাটা নাটকে রূপান্তরিত করে দেন, তাহলে সহজেই হয়ে যায় কাজটা। কবির এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হল, শুরু হল নাটক লেখা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নাটক লেখা শেষ করতে হয়েছে, ফলে কবি সময়মতো নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত করতে পারেননি। ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩ বাংলা সালে প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছেন–

‘সম্প্রতি একটা দুর্যোগের মধ্যে আছি। একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেচে। আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্চে ফরমাস।... তার ফল হয়েছে সময়মতো নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।’ [চিঠিপত্র- ৫ম খণ্ড; ৯৯-সংখ্যক পত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩ বাংলা সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে ‘নটীর পূজা’ প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় স্থান– উত্তরায়ণ-কোণার্ক, শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে

'নটীর পূজা'-র অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পরবর্তী অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। এই অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ছিল 'বিশ্বভারতী'-র জন্য অর্থসংগ্রহ। বাংলা ১৩৩৩ সনের মাঘোৎসবের পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'নটীর পূজা'-র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপালি-র ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' অভিনীত হয় মোট চার দিন [১৪, ১৫, ১৭, ১৮ মাঘ, ১৩৩৩]। এই চারদিনের অভিনয়কে কেন্দ্র করেই 'নটীর পূজা'-র প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি।

২১ মাঘ, ১৩৩৩ বাংলা সনে 'নাচঘর' পত্রিকায় 'নটীর পূজা'-র অভিনয় নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি–

"...শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে কবি নিজে নামেননি। এখানে (জোড়াসাঁকো-তে) ভিক্ষু উপালি-র নূতন ভূমিকা নাটকে সংযোগ করে, কবি স্বয়ং সেই ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা সেই আবির্ভাবের সম্মুখে প্রণত হচ্ছি।... অভিনয়ের কি পরিচয় দেব জানি না। ভাষায় তা বর্ণনা করার মত কথা নেই, ভাবে তার বিবরণ দেবার শক্তি নেই। রঙ্গপীঠের রূপ থেকে আরম্ভ করে তার ভারতীয় সাজসজ্জা, তার পরিকল্পনা, তার বর্ণবৈচিত্র্য, শুধু অপূর্ব নয়, অদৃষ্টপূর্ব।... যাঁকে দেখলে মাথা প্রেমে ও ভক্তিকে আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, তাঁর আবির্ভাবের প্রভাব ও আকর্ষণ যে এর জন্য অনেকখানি দায়ী তা অস্বীকার করা যায় না।"

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ সালে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় এই অভিনয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে– "ভিক্ষু উপালি বেশে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের পরিচয় নিস্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠরূপদক্ষ আর কোনো দেশে আছে কি না জানি না। ... কবিগৃহে 'নটীর পূজা' অভিনয়ে যে রঙ্গপীঠ প্রস্তুত হয়েছিল তার পরিকল্পনা ও সজ্জা এক অপূর্ব সুন্দর ব্যাপার। ... বহির্সজ্জায় গৈরিকবর্ণ ও ভারতীয় সূচীকার্যের যবনিকা প্রান্ত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ত্যাগ ও সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। আর ভিতরকার পশ্চাৎ ও পার্শ্বপটের কৃষ্ণনীল বিশ্বের অসীমতার মাঝে নাটকের করুণ ট্রাজেডির ব্যথাম্লান পরিণতির সূচনা করেছিল। ...'নটীর পূজা' অভিনয়ের আর এক বিশেষত তার গানের অপূর্ব Melody ও Symphony। কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে এবং মাত্র কয়েকটি গানে শুধু বেহালার একটি তারের মৃদু কম্পনের সঙ্গে সুরের যে এতরূপ জাল বোনা যায় তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। ... 'নটীর পূজা'র অভিনয় বাংলার রঙ্গজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অভিনয়ের প্রতি খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে এর অনিন্দনীয় প্রযোজনা জগতের যে কোন রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ।"

১৯২৭-এর পর প্রায় চার বছর রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় আর 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়নি। পরের অভিনয় হল কবির ৭০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকো-য়, ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩১ এবং ১, ২ জানুয়ারি ১৯৩২ তারিখে।

২৯ জানুয়ারি, ১৯২৯ তারিখে 'দি স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের আলোচনায় বলা হয়েছে- "Drama was affectively acted by women members of Visa-Bharati. The poet was in one of his supreme moods in this play. The setting was affective and brilliant. It was neat and powerful in its sombre and simple grandeur and harmonised with the inner spirit of the play to a considerable degree."

বাংলা সাহিত্যে রূপক সাংকেতিক নাট্যরচনা রবীন্দ্রনাথের এক অতুলনীয় কীর্তি। বিশ্বসাহিত্যেও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক-সাংকেতিক নাটক রচয়িতা হিসেবে কালজয়ী কৃতিত্বের আসনে সমাসীন থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের আজন্মের চিন্তা, দর্শন, অসামান্য মনন ও মনস্বিতার ঐশ্বর্য তাঁকে নতুন আঙ্গিকে শব্দচিত্রের নবতর ব্যঞ্জনার সাহায্যে নাটক লিখবার শক্তি ও মৌলিকতা দান করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যচেতনা এবং অরূপের অনুভূতি তাঁর নাটকগুলোর সঙ্গীতে শব্দমাধুর্যে ও ধ্বনিঝংকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা স্মরণ করতে পারি–

'রবীন্দ্রনাথ এই যুগের নাটক রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন ও থাকিবেন। তাহা তাঁহার প্রতীকসাহিত্যের জন্যে নয়, কিংবা তাঁহার এই নব নাট্যরূপের জন্যেও নয়। তাঁহার নাটকের শিল্পসৌন্দর্য, কথার অপূর্ব ভঙ্গিমা, ভাষার সরল সৌন্দর্য– এগুলিও তাঁহাকে প্রতীক নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অমরত্ব দিবে না। তিনি স্মরণীয় থাকিবেন নাটকের মধ্যে; তিনি আমাদের জীবনকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য, যে অরূপ অতীন্দ্রিয় সংকেত-রহস্যময় অনুভূতির আভাষ দিয়াছেন, তাহার জন্য। ... এই সত্যের ইঙ্গিত, এই পরিণতির আভাসই রবীন্দ্র-প্রতীক-নাট্যের অন্তর-রহস্য।'

[রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা–নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৩৬৯]

বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি যখন কবির মনকে তাঁর প্রার্থিত আনন্দরসে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি, তখনই তিনি ইন্দ্রিয়াতীতলোকের রূপ রস সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তাঁর ঈপ্সিত ভাবমাধুর্যের সন্ধান পেতে চেয়েছেন নাটকের মাধ্যমে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম.এ., দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৯ বাংলা।

২. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৬।

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭০।

৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, অশোক সেন, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৪ বাংলা।

৫. রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৬২।

৬. রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্য, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, কনটেমপোরারি পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৪।

৭. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯ বাংলা

৮. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ২য় খণ্ড, সাধন কুমার ভট্টাচার্য, পুঁথিঘর, কলিকাতা, ১৩৫৭ বাংলা।

৯. সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৫৮ বাংলা।

১০. শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা, সুধীর চন্দ্র কর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৭০ বাংলা।

১১. বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, আসকার ইবনে শাইখ, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬।

১২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীসুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৬ বাংলা।

১৩. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংস্কৃতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

কাইজার চৌধুরীর কিশোরসাহিত্য

চঞ্চল আশরাফ

'গল্পের পটভূমির একটা ব্যাপার আছে। গদ্যরীতির ব্যাপার-স্যাপারও আছে। আরো আছে গল্পের মান নিয়ে কতগুলো মানানসই প্রশ্ন।' এই সব কথা কাইজার চৌধুরী বলেছেন তাঁর কিশোরসমগ্র প্রথম খন্ডের 'আমার লেখালেখির গল্প' শীর্ষক মুখবন্ধে; কিন্তু পটভূমি, গদ্যরীতি, গল্পের মানসংক্রান্ত প্রশ্ন– এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কিছুই বলেননি, কেবল চকিত প্রসঙ্গ উত্থাপনের সীমায় তা বেঁধে দিয়েছেন। নিজের গল্প সম্পর্কে তাঁর এই যে পরিমিতিবোধ, তা উল্লেখের দাবি যত জোরালো হোক, সত্য এই যে, এর চেয়ে বেশি বলতে যাওয়া একজন পরিণত সাহিত্যিকের জন্য অন্তত শোভনতার মানদণ্ডে সমীচীন নয়। এসব অন্য বিতর্ক। কথা হল, নিজের রচনা পড়ার আগে কাইজার চৌধুরী পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গল্পের এবং গল্পবিচারের বিষয়আশয়।

তাঁর গল্পের পটভূমি কী? এর জবাব হতে পারে একটাই– সময়; যাতে প্রাধান্য পেয়েছে, খুব ভালো করে প্রাধান্য পেয়েছে উনিশ শো একাত্তর। মানে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। প্রথম খণ্ডের সেই মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'একাত্তরের প্রতি আমার বরাবরের দুর্বলতা। প্রয়োজন আছে বলেই, কিশোরদের কাছে আমি একাত্তরের গল্প, আমাদের অহঙ্কারের গল্প, বলেই যাব। বলেই যাব। বলেই যাব।' একদিকে তাঁর 'দুর্বলতা', অন্যদিকে 'প্রয়োজন'। এই দুয়ের মেলবন্ধনে জন্ম নেয় প্রতিজ্ঞামনস্ক উচ্চারণ, যা প্রতিধ্বনি দাবি করছে। 'দুর্বলতা' নিশ্চিতভাবেই লেখকের আবেগ থেকে উৎসারিত, এবং 'প্রয়োজন' তাঁর দায়; দুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতিসত্তা ও ইতিহাসের দায়, যা বহন করছে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো। *মুক্তিযুদ্ধে হে কিশোর, শোভনের একাত্তর, একাত্তরের রূপকথা* , *আমাদের একাত্তর* ইত্যাদি গ্রন্থ ও রচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন, নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও সময়ের অন্য চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর গল্পগুলো। তাতে অস্থির এক জীবন যেমন দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে, তেমনি পরিস্থিতির চাপে মানুষের আচরণ কেমন হতে পারে, সেই বার্তারও প্রকাশ ঘটে। যেসব ক্যারিকেচার বা হাস্যরসাত্মক দৃশ্যরাশি আমরা তাতে দেখি,

সেগুলো অ্যাবসার্ডিটির প্রকাশ বলে অনেকের মনে হতে পারে; কিন্তু এসবের মর্ম এই যে, অবরুদ্ধ সময় থেকে চরিত্রের মুক্তি বা উত্তরণের এটা একটা সংগ্রাম, স্বাভাবিক অনেক কিছুই এতে অদ্ভুত ও অপরিচিত হয়ে ওঠে। প্রসারিত অর্থে, এটা হল সময়ের সেই রূপকধর্ম, যা চরিত্রের আচরণ ও কথাবার্তায় প্রামাণ্যতা ও বিশেষ তাৎপর্যে বোধগম্যতা অর্জন করে। উদাহরণত উল্লেখ্য, *ছিনতাই ছিনতাই* গল্পে যে ঘটনার বিবরণ এবং চরিত্রগুলোর যে চেহারা আমরা পাই, তা সেই সময়েরই রূপকচারিত্র্যে স্পন্দমান। এই স্পন্দন সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রকেও স্পর্শ করেছে। কাইজার চৌধুরীর প্রায় সব গল্পে এটা কেবল অনুসন্ধানের ব্যাপার নয়, লক্ষ করার মতো একটা দিক বটে। কোনো পূর্বনির্ধারিত ইশারা বা ইঙ্গিত-সঙ্কেতে গল্প বলা তাঁর বৈশিষ্ট্য বা অভিপ্রায় নয়; চেষ্টাহীনভাবে এমনটি ঘটে গেছে। এমনকি কিশোরসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ঘটনা-চরিত্রে অপ্রাপ্তমনস্ক এক আবহ আরোপের যে সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, তার ধার আলোচ্য লেখক ধারেননি বা এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো টেনশন কাজ করেনি।

তিন খণ্ডে প্রকাশিত কাইজার চৌধুরীর কিশোরসমগ্রে রয়েছে সতেরোটি গ্রন্থ। হিসাবটা নির্ভুল না-ও হতে পারে। এই সংশয়ের কারণ দ্বিতীয় খণ্ডে যে সাতটি শিরোনামে সূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো গ্রন্থনাম কি-না, বুঝতে পারা যায় না। তা পারা যেত, যদি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো, গ্রন্থনামের সঙ্গে অন্যান্য তথ্য উপস্থাপন করা হত। এই হিসাব গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে যে, কালানুক্রমিক বিবেচনায় ও লেখকের রচনার বিবর্তন বুঝতে এই ধরনের তথ্য যথেষ্ট কাজে লাগে। যা-ই হোক, কিশোরদের জন্য 'ছেলেভুলানো গল্প' তিনি এই সমগ্রের কোনো খণ্ডেই রাখেননি; হয়তো সে-রকম কিছু তিনি লেখেনওনি কখনো। এই দিক থেকে বলা যায়, প্রচলিত কিশোরপাঠ্য রচনা থেকে তাঁর গল্প আলাদা। এই পৃথকত্ব প্রমাণ করে কিশোরসাহিত্য সম্পর্কে কাইজার চৌধুরীর এক রকম সিলেকশন রয়েছে; দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয় রয়েছে; এমনকি, কিশোর পাঠক সম্পর্কেও রয়েছে নিজস্ব ধারণা ও মনোভাব। এটা চটজলদি কোনো ব্যাপার নয়। যে-কোনো লেখকের পক্ষে এই সিদ্ধি সম্ভবও নয়। এ নিয়ে পরে বলার চেষ্টা করব।

আলোচ্য লেখকের রচনাগুলো 'ছেলেভুলানো গল্প' নয় কেন? জবাব এই, কিশোর বয়সের অপরিণত মন, বিশ্বাস-সংস্কার, আবেগ ও ভাবালুতাকে কাজে লাগানোর ব্যবসায়িক চালাকি তাঁর গল্পে নেই। কিন্তু কিশোরেরা আছে; তাদের অনুভূতি আছে, কৌতূহল আছে। তারা কম কথা বলে, দেখে আর শোনে বেশি, ভাবে আরও বেশি। ভাবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সিদ্ধান্ত নেয়া ব্যক্তির ধর্ম; বাংলাসাহিত্যে ব্যক্তির উপস্থিতি কম, তার বিকাশ আরও কম। কেননা, বাঙালির সমাজে ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ বলতে গেলে, নেই।

যা-ই হোক, ছেলেভুলানো গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য অপরিণত মন, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার, ফ্যান্টাসি বা উৎকল্পনাকে ব্যবহার করে একটা আচ্ছন্নতার জগৎ তৈরি

করা। কাইজার চৌধুরীর কিশোরসাহিত্য সেই পথ বর্জন করেছে। ভূতের গল্পও তিনি যখন লেখেন, তখনও দেখতে পাই, লেখক সমাজে প্রচলিত অপবিশ্বাস ও ভিত্তিহীন কল্পনা সম্পর্কে লক্ষণীয় রকমের সচেতন। *ভূতের নাম সদাশিব* গল্পের শুরুই তেমন পরামর্শ দিয়ে : 'ভূতে বিশ্বাস কর, ক্ষতি নেই। কিন্তু ভূতদের বিশ্বাস করতে নেই। অস্থিহীনদের ওপর আস্থা রাখতে যেও না। রেখেছ কি, ডুবেছ।' প্রথমে লেখক জানিয়ে দেন এটা একটা বিশ্বাস এবং তাতে আত্মসমর্পণ করতে গেলে ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেল ও অন্যান্য সংশয়ীরা যেমন বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতে যেও না। সহজ ও প্রায়োগিক দর্শনটি কাইজার কিশোরদের সামনে হাজির করছেন। এর মধ্য দিয়ে যে অনুতথ্যটি আমরা পাই, কাইজারের পাঠকরা বিজ্ঞানমনস্ক। কিন্তু এ-ধরনের পাঠকরা তো আর ভূতের গল্প পড়বে না। তা হলে কেন এই গল্প? পাঠের সময়েই এ-জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে। এই গল্পে ভূতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইহকাল-পরকাল সম্পর্কিত ধারণা, সমাজবাস্তবতা ইত্যাদি। এসবের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যয়টি আমরা পাই, তা হল, ভূত একটা প্রপঞ্চ বা বিভ্রম মাত্র। এর ফাঁদে-পড়াদের ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে।

কাইজার চৌধুরীর গল্পে ফ্যান্টাসি যে নেই, তা নয়। তবে তা অর্থহীন কল্পনা থেকে উৎসারিত নয়; তাতে তথ্যের অন্যতর ব্যবহার আছে, সময়ের ছবি আছে, প্রত্যাশিত জীবনের রূপরেখা আছে যা কখনো-কখনো অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ বলে মনে হতে পারে। *নূরনগরের নূর হোসেন* তেমন একটি গল্প। এতে একটি গ্রামের কল্পনা হাজির করা হয়েছে, যেখানে গোটা বাংলাদেশ অপরাধমুক্ত, তার একটি গ্রাম নূরনগর। সেখানে ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে সৌরশক্তিচালিত যানবাহন চলে, বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোনোর পর কর্ডলেস ফোনে ভুলে যাওয়া কাজের নির্দেশ দেয়া যায় গৃহকর্মীকে; সেখানে সব সড়ক ইতিহাসের সময়কে ধারণ করে। এটা স্পষ্ট, গল্পটির অনুপ্রেরণা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ-দেয়া নূর হোসেন; কিন্তু রচনাটির মর্ম তাতে শেষ হয়ে যায়নি, যে-স্বপ্ন নিয়ে তিনি শহিদ হয়েছিলেন, তা এতে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গল্পটিতে পরিহাসও করা হয়েছে। তা হল, এত আধুনিক নগরব্যবস্থায় একজন ডাক্তার সর্দির ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেননি। তিনি নিজেও সর্দিতে ভুগছেন। ফলে হাঁচির অসুখ নিয়ে নূর হোসেনকে তিন দিন পর গোলকিপারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তার মনে হয়, দেশটা অনেক পিছিয়ে আছে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই গল্প। এটি হয়ে উঠেছে আমাদের নগরজীবনের অর্থহীনতার রূপক; জাতির ভবিষ্যতের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মর্মান্তিক ব্যবধানের রূপক।

সাহিত্যের কাজ বাস্তবতাকে ধারণ করে তা অতিক্রম করা; একটি বিশ্বস্ত প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে রূপকের মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া। *টুকরি* সেরকম একটি গল্প, আপাতদৃষ্টিতে যা একটা সাংলাপিক প্রতিবেদনই; কিন্তু আসলে এটা গল্পের

বহিরঙ্গ বা খোলস, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের নিম্নবর্গের ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও পরিণতি। উল্লেখ বাহুল্য নয়, কাইজার চৌধুরীর অনেক গল্পই অপরাধ নিয়ে; কিন্তু এই রচনায় লেখকের আগ্রহের কারণটি যথেষ্ট উন্মোচিত। *টুকরি* গল্পটিতে দেখা যায়, ছিন্নমূল কিশোরটি বোঝা বয়ে নেয়ার কাজ করতে গিয়ে একটি টুকরিই তার শেষ পর্যন্ত কেনা হয় না। ভাড়ায় সে টুকরি নেয় এবং টাকা জমিয়ে যতবার তা কিনতে যায়, ততোবার দাম বাড়তে থাকে। এক সময় ভাড়ার টুকরিটি হারিয়ে ফেলে সে এবং টুকরির মালিক তাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর অপরাধজগতে সে জড়িয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ইত্যাদি নিয়ে যেসব গল্প আমরা পড়ি, তাতে বিনোদনই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের অভিপ্রায় হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই গল্পে সেরকম কিছু নেই। বার্তা আছে। শিক্ষা আছে। তবে একটা কথা না-বললেই নয়, এর সংলাপে বিশ্বস্ততার অভাব রয়েছে। একটা অংশ তুলে ধরলেই তা বোঝানো সম্ভব:

'টুকরির দাম বেড়ে গেছে যে! এখন দশ টাকার কমে ছাড়ছি না।
তা হলে তো মুশকিল।
কি রে, কোন মুশকিলের কথা বলছিস?

টুকরির দাম বেড়ে গেছে। তাই কপাল চাপড়াচ্ছি। নিজেরটা হয়ে উঠছে না।'
এরকম শুদ্ধ মান-বাংলায় বাংলাদেশের কোনো ছিন্নমূল কথা বলে না। তাদের একটা ভাষা রয়েছে, যার অনুপস্থিতি, একটু আগেই বলা হয়েছে, গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এই ব্যাঘাত অন্য রচনায়ও লক্ষ করা যায়। বলা দরকার, কাইজার চৌধুরীর গল্প কম-বেশি চরিত্রপ্রধান। চরিত্রের বিশ্বস্ততা সৃষ্টিতে পেশা, শ্রেণী, বয়স ইত্যাদি মেনে সংলাপ ব্যবহার করতে হয়, যা তিনি করেননি। অন্যদিকে বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পর অপরাধজগতের প্রতি রয়েছে তাঁর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু অপরাধজগতের নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রচনায় সেই ভাষা উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁর গল্পে এটা একটা, সম্ভবত একমাত্র দুর্বলতা।

তবে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে লেখক যথেষ্ট সপ্রতিভ ও বিশ্বস্ত। তথ্যের অবতারণা, পরিস্থিতির বর্ণনা এই গল্পগুলোর সময়টিকে বেশ প্রামাণ্য করে তুলেছে। উল্লেখ্য, তাঁর তথ্যপ্রীতি খুব বেশি। এত যে, তা পুনর্বার মনে করিয়ে দেয়– সাহিত্য জ্ঞানের একটা শাখা; কাণ্ডজ্ঞান ও কল্পনা একে গ্রহণযোগ্য ও সৃষ্টিশীল করে তোলে। যা-ই হোক, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালির আবেগ, যন্ত্রণা, ক্ষোভ কোনো কিছুই লেখক এড়িয়ে যাননি; বরং কিশোরমনে এর ছাপ ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্বস্ত এক ছবি আঁকার প্রয়াস করেছেন। *চুরি যাওয়া হাসি* সহ প্রায় সব গল্পে এই সাধনার প্রকাশচিহ্ন আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর বিপুল অধিকাংশ গল্পে কিশোররা নিম্নকণ্ঠ; তাদের সক্রিয়তার

বড় অংশ শোনা ও দেখার মধ্যে আবর্তিত। আলোচ্য গল্পে হেলাল নামের কিশোরটি শোনে, বলে, দেখে, যন্ত্রণা অনুভব করে, বিক্ষুব্ধ হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়; সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্ত ও সক্রিয়তার সঙ্গে রয়েছে কিশোরমনে সঞ্চারিত বিশেষ এক নৈতিকতা, যার মূলে আছে আবেগ; এটা সে পেয়েছে পরিবার ও সমাজ থেকে, পরিস্থিতি তাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। কিশোররা আসলে তা-ই, তাদের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে। 'চুরি হয়ে যাওয়া হাসি' পুনরুদ্ধারের জন্য রাজাকারের বিরুদ্ধে হেলালের লড়াইয়ে নামার মধ্য দিয়ে লেখক কারো সাহায্য ছাড়াই বিশেষ পরিস্থিতিতে কিশোরের সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্য ও সাহসের দিকে আঙুল তুলেছেন। অর্থাৎ সময়ের প্রয়োজনে কিশোরও যে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে, সেই বার্তা হাজির করেছেন। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কাইজার চৌধুরীর গল্পভাষা সৃষ্টিশীল, শব্দপ্রয়োগে তাঁর সচেতনতা লক্ষণীয়। বিশেষত অনুপ্রাস, বাগধারা, অলঙ্কার, পূর্বসূরির রচনাংশের ব্যবহার, ধনাত্মক ও সমিল শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে গদ্যভাষায় তিনি প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছেন। এই চেষ্টায় যোগ হয়েছে হাস্যরস, ফলে তাঁর গদ্য বিনোদনময় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ :

১. আমি তখন আমার পড়ার ঘরে বসে দু'চারটে ঐকিক নিয়ম রপ্ত করতে ব্যর্থ হয়ে বাজার থেকে নিয়ে আসা চিনিচাঁপা কলা মুখস্ত করতে ব্যস্ত। পনেরটা কলা গলার ভেতর পাচার করতে না করতেই দেখি বিল্‌টু মামা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। বিলটু মামাকে বেগতিক অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমার যাকে বলে ষোলকলা পূর্ণ হওয়া– তা আর হয়ে উঠল না।

বিলটু মামা কাঁপছে রীতিমতো। তার হাড়সর্বস্ব হাঁটু দুটো ঠকাস ঠকাস শব্দ করে উঠছে থেকে থেকে, যেন কামারবাড়িতে হাতুরিপেটা হচ্ছে।

(ছিনতাই ছিনতাই)

২. গাবলু চলল জাহাজের খালাসি হওয়ার খায়েশ মেটাতে। কিন্তু গুলিস্তানের মোড়ে গিয়ে ঠকাস-পটাং-কড়াত।... সবার বেলায় শুধু ঠকাসেই সেরে যেত।...

(গাবলু)

৩. গরুটা উল্টো আমাকে শিককাবাব বানিয়ে চিবোয় আর কি! সে কি বাস্ করলে তাড়া। বলি থাম একটু দাঁড়া। আমিও বাগিয়ে থাপড়, দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়।

(বজা-ডাকাতের রাগ-দুঃখ)

গল্পের উদ্দিষ্ট সেই জীবন, যেখানে সংগ্রামশীল সমাজের অন্তর্গত মানুষ অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মুক্তি চাইছে নিজের সীমাবদ্ধতা থেকে। কাইজার চৌধুরীর গল্পে এই সত্য কম-বেশি মান্য হতে দেখি। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা,

অর্থনীতি, মানুষের আবেগ তাতে অনপনেয় হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আগেই বলা হয়েছে, আলোচ্য লেখক 'ছেলেভুলানো গল্প ফাঁদেননি, কিশোরগল্পে যা করা হয়ে থাকে। এতে বোঝা যায়, কী ধরনের পাঠক তাঁর লক্ষ্য। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তারা মানসিক দিক থেকে পরিণত, তারা যাপন করে স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত জীবন; কোনো অপবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণায় তারা সমর্পিত নয়; তাদের রয়েছে বিশেষ এক নৈতিক মূল্যবোধ, যার মর্মে কাজ করে মানবতা ও দেশপ্রেম। এই পাঠকশ্রেণী মনে করিয়ে দেয়, আমরা একটা আধুনিক সমাজে রয়েছি। কাইজার চৌধুরী সেই সমাজের লেখক।

ক বি ত

....

একুশ জন কবির একুশটি কবিতা

এক.

শি ব না রা য় ণ রা য়

....

ছড়িয়ে দেবে ধুলো দিগ্‌বিদিকে

আমি যখন ধুলো হয়ে যাব
থাকব পড়ে পথের ধারে মাঠে
শিশুর হাতে হব খেলার জিনিস
কচি মুঠোয় পড়ব ঝরে ঝরে

জল মিশিয়ে করবে কাদামাটি
ছেনে টিপে গড়বে হাবিজাবি
খেলা শেষে ফেলে যাবে মাঠে
চুমো খাবে বুনো ঘাসের ডগা

ভাঙাচোড়ায় পড়বে ঝরে শিশির
নির্বিকল্প ছোঁবে ভোরের আলো

[কবিতাটির শেষের দুই লাইন অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় লাইন দু'টো বাদ দিয়ে কবিতাটি প্রকাশ করা হল। –সম্পাদক]

দুই.

নু রু ন্না হা র শি রী ন

....

শ্যাওলায় রেখেছি পা

মাঝে মাঝে রক্তের ভিতরে শুনি
ছিন্ন গোমতীর ডাক...
মাঝে মাঝে কুয়াশার চিৎকারে শূন্য জুড়ে নেমে আসে
আবছা শৈশবগন্ধ... কৈশোরের বালিয়াড়ি পদধ্বনি।

এখন কতটা মানুষ কতটা ফানুস জানি না।
শুধু অন্তহীন লোনায়, দেনায় শ্যাওলায় রেখেছি পা...
অবিরাম টের পাচ্ছি পিছল বেলার অভিরতি...
সম্ভাবনার শিশুরা স্নেহত্তম ছেড়ে শিকারির নখে।
ফুলেল শরীরময় দাগ...
আমার চাতাল জুড়ে খাদ্যের ভয়ঙ্কর খাদ।

আমার খামার কাঁপা আকাশ-ইস্কুল মেঘ চুরচুর–
শাখানদীগুলোর ভেতরে হুহু কান্না–
স্বপ্নগুলি ছুঁয়ে অন্ধকারকে ধাক্কায় খুব–
ঝনাৎ, ঝনাৎ।

তিন.

আ মি নু ল ই স লা ম

....

তসলিমা নাসরিন

তোমার আমার আমাদের এই তৃষ্ণার্ত স্বপ্নের ভূগোলে
যেখানে পিপাসা
বহু ও বিবিধ,
প্রাণের স্রোতে
রোদের তরঙ্গে
তুমি এক স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী– নাসরিন ।
পাত্রভরে জল নিয়ে যায় লোক
তোমাকে নিতে পারে না ।
তোমার বুকে সাঁতরাতে গিয়ে
আমি জানি–
ডুবে মরেছে বহু লোভী নক্ষত্র
তুমি রয়ে গেছো অতল স্রোতের ঈশ্বরী ।
জোছনার দড়ি বেঁধে
কোনো একবার
তোমাকে নিতে চেয়েছিল এক চাঁদ
সেখানেও যুগবাহিত যন্ত্রণা
সুবোধ স্বপ্নের রঙিন মরীচিকা;
তাই তো বাতিল করেছো তুমি যাবতীয় নকল জোছনার মোহনা ।

জলের আত্মায় আগুনের বসবাস
বৈষম্যের তুষানলে ধূমায়িত আত্মা
আজ ধূ ধূ অগ্নি
তার চারপাশে উত্তাপ ও আলো
সে আলোয় উদ্ভাসিত অসংখ্য মহৎ মুখোশ ।

মিথ্যা গৌরবে তুমি কোনো শাস্ত্রকন্যা নও
তোমাকে বাঁধতে পারে না কোনো ঊরুসন্ধি ;

নৈসর্গিক প্রাণের ভূগোলে তুমি
গঙ্গা-সিন্ধু-মিসিসিপি-নীল-আমাজন
তোমার সামনে মহিমান্বিত জীবনের অতল মোহনা;
আন্তঃমহাদেশীয় হাওয়া– জল নিয়ে তোমার
বৃষ্টি ঝরায়–
উম্মে কুলসুমের স্মৃতির সড়কে
মানবিকতার আকাশছোঁয়া সাম্যবাদী কবির ভাবনার মিনারে।

চার.

না সি মা সু ল তা না

....

তুই বললি মানচিত্র আমার হবে

তুই বললি ওই বাড়িটা আমার হবে
কালো রাস্তা হলুদ বাড়ি, ঘরে ঘরে নীল পর্দা, নিয়ন আলো
ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা গোলাপ আমার হবে
তুই বললি ওই জমিটা খেত খামারটা পানাপুকুর আমার আমার
দাওয়ার পাশে লাউয়ের মাচা দুধেল গাভী
শিউলিতলায় ঘুমিয়ে থাকা রাত্রিবেলা শুধুই আমার
কেন বললি?
কেন বললি নোনা হাওয়ায় চুল উড়বে?
ভুবনডাঙার ছলচ্ছল নদীর পাড়ে
বসে থাকবো পা ঝুলিয়ে, স্মৃতিবদ্ধ, কথা কবো না
কেন তবে কালো রাস্তা হলুদ বাড়ি হয় না আমার
কেন হয় না

কেন তবে চুল ওড়ে না ভুবনডাঙার পিছল হাওয়ায়
চুল ওড়ে না
গোলার ধানে হাত ডুবিয়ে মুখ ডুবিয়ে বালকবেলা খেলা করে না
আপন মনে...
আমার এখন ক্ষিধে পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে
ঘাম রক্তে মুঠোর ভেতর ভিজে যাচ্ছে মানচিত্র
তুই বললি মানচিত্র আমার হবে
কেন বললি?

পাঁচ.

র হি মা আ খ তা র ক ল্প না

....

নগররাত্রি

ক. রাতের শরীর থেকে মুছে গেলে শব্দমালা
এ নগরী শান্ত যেন শব
মুখরা নারীটি যেন সুখরা সঙ্গম শেষে হঠাৎ নীরব ।

খ. দিনশেষে নগরীর ধুলোমাখা দলিত পথের গায়ে
কুয়াশা-কুটুম যেন বুলিয়েছে সোহাগের হাত,
এ নগর সাহসী জননী একা গৃহহীন
চোখ তার নিদ্রামগ্ন, বুকে তার অজস্র অনাথ শিশু
চারপাশে নিমীলিত রাত ।

গ. ঝিকমিক তারার নকশা আঁকা রুপালি আকাশ যেন
রুপালি পারদ-লেপা কাঁচ,
থেমে গেছে কোলাহল, মানুষ ও বাহনের ক্ষিপ্রগতি
মুখরিত মঞ্চে যেন
ইশারায় থেমে গেছে পৌরাণিক নর্তকের নাচ

ছয়.

সু হি তা সু ল তা না

....

ভেতরে অনবরত সংজ্ঞাহীন ঢেউ

আমাদের বিরুদ্ধ পথে তৃষ্ণার মাদক
ঝুলে থাকে
চুন ও লবণের সাথে উঠে আসে
বিষাক্ত ছোবল
এত রক্তপাত। এত গহ্বর! এত ঘৃণা।
জীর্ণ করে তোলে আদিগন্ত ভূমি

জীবন কোটরে অস্থির উল্লাস আজ
পশুদের বাকলে জ্বলছে ক্ষোভ
পৃথক শয্যায় তীব্র নেশার ঝাঁঝ
ভেতরে অনবরত সংজ্ঞাহীন ঢেউ

চতুর্থ নায়ক ছিল অগ্নিভুক
তৃষ্ণার্ত হয়ে শূন্যতায় অবাধ্য কড়া নাড়ে
সব অপরিশোধ্য জেনেও
নিংড়ে নিয়েছে থুথু

বারংবার হু হু করে বৃক্ষের মৃত্যু হয়ঃ
অরণ্যনাশ
জন্মের ভেতরে সহস্র বিষযোগঃ
শবের গন্ধ
রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকে পঞ্চম নায়কঃ
স্বপ্নভুক
অবশেষে সব গেলঃ
বায়ু অগ্নিজল বৃক্ষ
নক্ষত্র জীবন

সাত.

ত প ন বা গ চী

....

অন্যগাথা

মন যেতে চায় অন্য পথে
দিনকে চাড়িয়ে অন্য দিনে
অন্য পাত্রে পেতে চায় অন্য সোমরস।
পোড়া মন কতো পোষ মানে?
পোড়া কনে কতো আর সতীত্ব-সাধনা?

এবার মনকে বলি–
অন্য সুরে গলা সাধো
গাও আজ অন্য সা-রে-গা-মা

এখানেই আছে নাকি বাঁচার পৃথিবী!
এইখানে হয় নাকি কালের বিচার!
এই মন কতো আর অপেক্ষাপ্রবণ

অন্য চোখে ধরা দিলে অন্য মতিগতি
মন চায় অন্য সোমরস–
অন্য সুখে, অন্য ছন্দে অন্যগাথা।

আট.

খ লি ল ম জি দ

....

বায়ুবন্ধ

যদিও সকল কথাই থাকে বাতাসের মনে
আকাশের অন্যপিঠে সত্তাময় বয়ে চলে বায়ু
তবু সেই বায়ু বায়ু হলে খেলা করে খেলা করে
জন্মময় সামান্য সময় । যেন সে ঈশ্বরিত
আগুনের কন্যা মধুগন্ধী অনন্যা আমার
মুখের ভিতর দিয়ে ভরে ওঠে সে আমার আয়ু
অমোঘ পানীয় কল্প ভোগমগ্ন তার নাম প্রাণ
তবু সেই বায়ু বর্জ্য হয়ে বয়ে যায় অব্যক্ত অপান
আমার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ক্রমাগত দূরের প্রবাস
যেন সে নির্ধারিত ভাগ্য আমার সর্বস্তরগামী
রক্তের ভিতর দিয়ে স্রোতমান সে আমার রব
মাংসের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে তার নাম ব্যান
তবু সেই বায়ু সমতা বিধান করে হয়েছে সমান
আর যে উদান, সুখে ও দুঃখে ভরা হৃদয়ের
সে আমার সকল গান; যেন সে মহাবায়ুর দূত
একটি জীবন থেকে অনায়াসে বয়ে চলে অন্য জীবনে
নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে চলে যায় সে আমার মৃত্যু ।

নয়.

শা মী মু ল হ ক শা মী ম

....

দূরাগত পাহাড়ের গান

আজও পাহাড় দেখার তীব্র বাসনার কথা মনে হলে
চুপিচুপি তোমাদের গ্রামে যাই । আজ হাটবার...
প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে থাকি–
বড় রাস্তা থেকে আলপথ
আলপথ থেকে ক্ষেতের কোনাকুনি...

শস্য কাটা হয়ে গেলে পড়ে থাকে হাহাকার

বিরান মাঠে আমাদের প্রেম-পর্ব
গোল্লাছুট দাড়িয়াবান্ধা
দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে পড়ে থাকে শূন্য মাঠ...

সেই তালগাছ বরাবর হাঁটতে থাকি
যতই নিকটে যাই পাহাড় ততটা সরে সরে যায়
এভাবে কতোটা সময় জমা হয় জীবনের খাতায়?
বরং হাটের ভিড়ে মিশে যাওয়া ভালো
হাট মানেই অনন্ত শৈশব, জাগ দেয়া পাটের গন্ধ...

উজান বাতাসে ধূসর নস্টালজিয়া
দূরে কোথাও বাঁশি থেমে গেছে
নিরন্তর প্রবহমান তার রেশ হঠাৎ হঠাৎ
থমকে দাঁড়ায় রাখালিয়া বোহেমিয়ান...

শৈশবের আরেক নাম হাহাকার– হারিয়ে যাওয়া প্রবেশপথ...

দশ.

প্র ত্য য় জ সী ম

....

শব্দকন্যার গান

কোলাহল-মঞ্চ-মিলনায়তন-মিছিল-মনিটর-মুদ্রার মোহ
সবই উপেক্ষা করেছি প্রিয়তমা তোমার জন্য শুধু
তুমি আসো গভীর রাতে সঙ্গোপনে
পৃথিবীর মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে
এই নিঝুম বাড়িটা ঘুমায় যখন
তখন তুমি আসো খুব নীরবে নীরবে
কলমের ঠোঁটে চুমু খাও অবিরাম
হাত রাখো কামুক শব্দের স্তনে
কিশোরী আর শব্দকন্যাদের নৃত্যে ভরে ওঠে
ছোট্ট ঘর কাগজের দেহ
হাত রাখি শাদা কাগজের নরম নিষ্পাপ দেহে
শব্দকন্যারা নাচে মুক্তক-স্বর-মাত্রা-অক্ষর
ভৈরবী-কাহারবা-দাদরা-ঝুমুর-আর আরো
শব্দকন্যাদের সব নৃত্য বুঝি না
তবুও তাদের নৃত্য ছন্দের কুহকি মায়ায়
কত রাত নির্ঘুম কেটে যায়।

এগার.

শা হা না শৈ লী

....

আসতে না-বলেই প্রতীক্ষায় থাকি

আমি কাউকেই আসতে বলি না,
কেউ কখনও পথ ভুলে এলে
অখুশি হই না, ভালো লাগে–

অযাচিত আগমন আশা করি না; আবার
তাতেই খুব খুশি হই,

চলে গেলে আপ্যায়নের ত্রুটি ভেবে ভেবে
লজ্জিত হই।

আসতে না-বলেই আগমন প্রত্যাশা করি,
কারণ, আমি বুদ্ধিহীন এক দ্বীপে নির্বাসিত।

আমি কোনো দিনও ওদের আসতে বলি না
তবু কেন পথ চেয়ে থাকি!

আমার কোনো উৎসবে
ওদের আমন্ত্রণ জানাই না, তবুও
ওরা না-এলে অকারণে দুঃখ পাই।

যাদের আসার কথা নেই
তাদের জন্যই তবু কেন
প্রতীক্ষায় থাকি!...

বার.

শা ন্তা মা রি য়া

....

পিতামহের প্রতি

জনশ্রুতি পিতামহ ঋদ্ধক পুরুষ
আমি তবু আজনম কৌরব্য অনার্যা ।
তার প্রতিকৃতি নিয়ত বিদ্রূপে ঢাকে
অপব্যাপ্ত সফল সংগীত ।
অভিখ্যার কুয়াশায় প্রচ্ছায়া সন্ধানে
            মৃত
নিমগ্ন সকাল ।
ধূসর উদ্ভিদ খোঁজে সুভিক্ষ সময় ।
অসবুজ বৃন্ত অন্ধকারে
ভাঙমান কেটে গেছে দিন
অর্ভক এখন
পিতামহ তোমার সন্ধানে
নিনেভার স্তোত্রে অন্তরীণ ।

তের.

কা জী জে সি ন

....

কোন সে নদী তরঙ্গমতী

বহু পথ হেঁটে হেঁটে এতকাল পর জানা হলো,
পথেরা আসলে পথহীন, ভিন্ন গোলার্ধে ধাবিত ।

দীর্ঘতর এই চক্রে চরকির ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে
যদি-বা কোথাও যাওয়া নাই হয়, যদি-বা শুধুই

সুতাছেঁড়া ঘুড়ির মতন দিশাহারা
বৃত্তের বিগত দিনে ওড়াওড়ি শুধু...
কিংবা ঝুলে থাকা...উঁচু ডালে,
বিভ্রমে, ম্যাজিকে...

ভেতরে বিভিন্ন সিরিজের
কুচকাওয়াজ সঙ্গে নিয়ে যেখানে যাওয়ার কথা ছিল
সেখানে অপেক্ষা করে কোন সে তরঙ্গমতী নদী?

নোঙর-হারানো নৌকা তবু ভেসে থাক
প্লাবনে প্লাবনে।

নদীশাস্ত্রে, চন্দ্রমগ্ন উজান জাগুক দুই পারে
রূপে-বর্ণে ফিরে, বারে বারে।

চৌদ্দ.

স ম র চ ক্র ব র্তী

....

অনঙ্গ সহবাস

বৃথাই তুমি সাজিয়েছো বৃত্ত ফুটপাতের মশাল ঘিরে
ভ্রমণের অনন্ত গৃহে বৃথাই ব্যয় হয়েছে শূন্য তোমার
ঝুলে আছে প্রশ্ন তরুপ ছোঁয়া আঙুলের উপর!

তুমিই শুধু সাক্ষী থেকে গেলে– অদ্ভুত আলোর এ অন্ধকারে

আর ওই যে দিক্ চলে গেছে পরিধিহীন গন্তব্যের লাল চোরাগলি–
যেখানে পরম তৃষ্ণার পর উপভোগ্য পতন আসে; কাতর নদী
মলিন মায়াজালে আটকে রাখে আলেয়ার শরীর
ঠিক সেই দিকে ফাঁদ পেতে আছে অথর্ব প্রাচীন শব্দের ওঙ্কার...

শীতার্ত জলকণা আমি, উড়ে-উড়ে ভেসে যাই বর্ণিল কামনার উষ্ণদেশে
পূর্ণ জীবন চূর্ণ করে তুমি সারারাত ভালোবাসো

স্মৃতির ফসিলে লেগে থাক শুধু মায়ার বিষাদ...

পনের.

মো হ ন্ত কা বে রী

....

বিশ্বগ্রামের মাতাল

মাতালের অসংখ্য দোষ মেনে বলা যায়
নিজস্ব ভূমি মেনে

পায়ের মাপে অসংখ্য ভূমি আমার
চিৎকার করো না রেজিস্টার অফিস
তুমি ভূয়া
জননীভাগে শূন্যভর্তি হতাশা একতারা ভেঙে শাঁখের করাত
ইচ্ছার করাত চালিয়ে সার্বভৌমত্বের শর্তটি
পূরণ করবে কীভাবে কাঁটাতার
চলো ভালোবাসার তারে আত্মা বেঁধে
আমাজানের বালকটিকে হিজল-অক্সিজেনের আমন্ত্রণ জানাই
পৃথিবীর কোনো গাছই পরের মনে হয় না

মদের কাঁপা কাঁপা পা নিজের ভূমিতে
চোখ সোজা করুন

ষোল.

যা কি য়া সু মি সে তু

....

মৃত্যুময় ঘুম

তোমার ভেতর গন্ধ অরণ্যের বসবাস...
জলের ছোবলে, বীজধান, বীজতলা
ভেসে গেছে সেই কবে–জলপাই জীবনে।

মনে কি পড়ে প্রতারক ঘুমঘোরে
বটফল, আমরুল, কাটারঙ মাঠ?

অনুভবের ভেতর অনুভব,
স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন,
অর্ধেক নিস্তব্ধতা...

প্রমত্ত ঝড়ে যে উড়ে এসেছিল
জ্যোৎস্নাময় সাদা হাঁস,
তার নয় বাদামি অসুখ,
চাঁদের বোতাম খুলতেই
নীল আকাশ, ভেঙে পড়েছিলো প্রণয়সুখে।
প্রবাহ আবেগ প্রপাতে শিখিয়েছিলো
নিপুণ সঙ্গম।
তারপর হৃদের তীরে ফেলে চলে গেছে
পলাতক অচেনা সুদূর!
আহারে প্রপঞ্চ ভালোবাসা জীবন!
যদি দেখা হয় আর কোন জন্মে
চোখ প্রদক্ষিণ করে চোখ
তবে দেখো–
নিভৃত শিল্পের বড় মর্মভেদী টান,
পাথরের বুকে কঠিন মৃত্যুময় ঘুম!

সতের.

র নি অ ধি কা রী

....

একটি উজ্জ্বল ঘোড়া

পায়ে হেঁটে ক্রমাগত রাতের আকাশে
সবুজ মেঘের সিঁড়ি বেয়ে
একটি উজ্জ্বল ঘোড়া নেমে এলো বুঝি!
ক্রমশ ঘোড়াটি নাচে চোখের গুহায় ।
ভীষণ প্রলুব্ধ ক'রে অশুভ আত্মারা
অন্ধকার অক্টোপাসে মৃত্যু বাসা বাঁধে...

মধ্যরাতে অশ্বক্ষুর দ্বন্দ্বে নিরন্তর
জলন্ত চিতায় দেখি মৃত্যুর নোঙর ।

আঠার.

রি সি দ লা ই

....

নাচঘর

নিজেকে কেবলই অচেনা ঠেকে? আত্মগ্লানি বধির হলে আমরা এসে দাঁড়াই কতিপয় নট আয়নায়, নিজস্ব বোধ এবং বোধিতে । চোখের ক্লে'-তে কে যে নেচে যায় বেধড়ক পণ্যদুনিয়া । পরাজিত একক আত্মা কালের দ্রষ্টা রমণে মেতেছে । কুরে কুরে খায় মগ্ন কান্নাঘর । নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া পাখি ক্রমান্বয়ে

আহত-খোয়ানো। খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানায় শুধু তোমাকেই। অবশেষে তুমিও মেতেছো হুল্লোড়ে, চলছে জম্পেস আয়োজন, বিলি করা নগ্নতা। নগ্ন করে দিলেই সব শেষ, আত্মদহন কে কবে শিখেছে? পৃথিবী বিশাল সীমন্তিনী, তবু কেন যে একই বৃত্তে ফিরে আসো, একি মোহ না অন্য কিছু?

নাচঘরে সবকটি দরোজা খুলে দিলে পাথরের কয়েকটি মূর্তি কেবলই নেচে যায়।

উনিশ.

অ র বি ন্দ চ ক্র ব র্তী

....

বিমূর্ত নকশার নৃমিতি ছিঁড়ে

যতটুকু জন্মাচ্ছি– তার অধিক ক্ষয়
রক্তের ভেতরে উজান
চিনচিন বয়ে যায়।
আমার আছে এক আঁতেল মাঝি
তার ঘটে প্রতিক্ষণে
দিনবদলের স্বপ্নপাত।

নিয়তই উদ্দেশরহিত সে
ক্রন্দনের ভাষা তার জানা নাই, ফলে
এই বিকলাঙ্গ সাপ করোটিতে পুষে
মেধা ও মননে
শ্রীতব ভেষজ ঘষে
তৃতীয় কেউ দেখে যায় জুবন্দী বিলাপ।
যদিও
অতএব সংবিধান বোঝে না সে

অথচ অদৃশ্য পুরোহিত এক
কপটতা খুলে
দিয়ে যায় মাৎস্যায়ন অপলাপ ।
এসব বিমূর্ত নকশার নৃমিতি ছিঁড়ে, স্ত্রীত্বের মানচিত্রে
বমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে– সশ্রদ্ধ গেয়ে যাই মানুষ ও মানবতার বিজয় কোরাস ।

বিশ.

ম নি র ই উ সু ফ

....

অনন্ত-সমুদ্রে

বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলো বাসনার কাম ও কামনায় সময়ের স্তন হয়ে ওঠছে
আমি সময়ের দীর্ঘশ্বাস ছুঁতে গিয়ে সে স্তনই ছুঁয়ে ফেললাম
আর কোথাও যাইনি, সময়ের অনেক পূর্বে নারী ও সমুদ্রের মোহনায়
নৌকা ভাসিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগলো আমার
নাফ ও বাঁকখালীতে জেলেদের নৌকা ভাসানো শিল্প আয়ত্ত
করতে করতে কেটে গেল অনেক দিন, আমি এখন পরিপূর্ণ জেলে
জালের সুতায় গিট্টুর রহস্য আয়ত্ত করতে পারেনি কখনো,
তবুও জালই আমার বেঁচে থাকার উছিলা, সাগর ভাতঘর,
এ সাগরকে গিরেই আমার জীবন যৌবন
গভীর সাগরে মাছ ধরার গহীন কষ্ট ও ঘাম, শংকা ও ভীতি, নিয়ত যুদ্ধ,
স্রোতের টান আমার রক্তের শিরায় তুলে কাঁপন, হায়! বেঁচে থাকা...
ডাঙায় যেমন তেমন, জলে উঠে গতির নাচন!

একুশ.

আ লী ই দ্রি স

....

অগ্রহায়ণের ল্যান্ডস্কেপ

অগ্রহায়ণ এসেছে চরের মাঝে জেগেছে পথ
বর্ষার জলের তলে ডুবেছিল যে চর হেথায়
বিকেলের রং লেপ্টে আছে রূপসীর মেকাপের মতো ।
স্তূপীকৃত খড়ের গাদা, ধনচের গোলা, লাউয়ের ঝাঁকায়
লাউ দুলছে প্রথম সন্তানসম্ভবা মায়েদের স্বপ্নের মতো
আউলা বাতাস বেসুরো বেহালা বাদকের মতো সুর তোলে
কলাপাতায়, ইরিধানের বীজতলায় ছন্দময় চলাচল করে
নদীর বাতাস ।

বহুদিন পর আজ এসে এই পথে দেখেছি প্রাণ ভরে
রূপসী বাংলার একাংশ যেন চিত্রীর আঁকা ল্যান্ডস্কেপ ।

প্র কা শি ত ক বি তা র দু' টি আ লো চনা

....

র হ মা ন হে ন রী : এ ক / সা কি রা পা র ভী ন : দু ই

[এ সংখ্যায়ও প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম এই সময়ের দুই কবি রহমান হেনরী ও সাকিরা পারভীনকে । অনেক ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা দু'টি সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন । এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচক দুজন কবির নাম উল্লেখ না-করে শুধু কবিতার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা দু'টি সম্পন্ন করেছেন।

এতে আলোচনা দু'টি কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। দুই কবি-আলোচকের মূল্যায়নে নিশ্চয়ই ভিন্নতা থাকবে; এটি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা দু'টি কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়। –সম্পাদক]

রহমান হেনরী: এক

এক.

সুন্দর। সাবলীলও। ভালো লেগেছে।

দুই.

কবিতা যে-মায়াবী যন্ত্রণার ডাক, সেই ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দর বোধ ও উপস্থাপন; তবে কিছু ধ্বনি অনুরণনের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাত বা ঝোঁক কবিতাটির রস ব্যাহত করেছে। মানুষ> ফানুষ, লোনায়>দেনায়, খাদ্যের>খাদ... এগুলো যতটা-না ধ্বনি-ব্যঞ্জনা আনে, তারও চে' বেশি ব্যাহত করে সেই ভ্রমণকেই, যা কবিতার মূলে নিয়ে যায় পাঠককে।

তিন.

কতিপয় বিষয়ে কবিরা কবিতা রচনা করতে চান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, এ ধরনের কবিতাকে আমি, ব্যক্তিগতভাবে, বলে থাকি খায়েশি কবিতা। এগুলো কবিতা হিসেবে আমাকে কখনই টানেনি। অদরকারি নয় হয়তো, দরকারি অনেকের চোখে। নান্দনিকতায় নজর রাখা বেশ মুশকিল এ ধরনের কবিতায়। এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

চার.

পড়তে ভালো লাগছে। রসাস্বাদনেও কোনও বিঘ্ন ঘটছে না। স্বরবৃত্তের ঝংকার কোমল যন্ত্রণার সাথে ভালো যায়।

পাঁচ.

সুন্দর অনুভব, ভালো কবিতা। উপস্থাপন ভঙ্গিমা ও ছন্দ-সচেতনতায় পরিচর্যা লক্ষণীয় ও প্রশংসার্হ। মনে হল, বেশ আগে, শক্তি ও অলোকরঞ্জনের কবিতার পাঠ নিতে, মস্তিষ্কের যে আরাম ও আনন্দবোধ হত, এ-ও তেমনি কবিতা।

ছয়.

বেশ দুর্বোধ্যতা আছে। একাধিকবার পাঠের পর বুঝতে পারা যায় কবিতার ভেতরের কষ্টগুলো। বেশ উপভোগ্য কবিতা।

সাত.

ভালো লেগেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার ব্যাকুলতা। কবিতাটি অনায়াসেই স্মরণীয় হতে পারত, যদি সেই 'অন্য'র কিছুটা স্বরূপগত আভাস থাকত। আভাসটুকু নেই, জানি না, এটা কোনও সিরিজ কবিতার অংশবিশেষ কিনা; তেমন হলে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সেই 'অন্য'টা কেমন, সে আভাস পাঠকও পেতে পারবে, কবিতাটির অন্যান্য অংশে!

আট.

ভালো। কবিতার বোধ, অনুভব ও উপলব্ধি সুন্দর। উপস্থাপন আরেকটু সাবলীল হতে পারত। সে যাই হোক। উপভোগ্যতা আনে।

নয়.

স্মৃতিগন্ধী, শৈশব-জাগানিয়া, সুন্দর ও আর্দ্র কবিতা। এত নদী স্রোত ও ঢেউ-কবলিত শৈশব-ভ্রমণে যান কবি, পাহাড়ের কথা বলতে বলতে; কিম্বা পাহাড় তো কেবলই অজুহাত; পাহাড়ের বহুবিধ প্রতীকের কোনওটিই শেষ পর্যন্ত থাকে না কবিতার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে; কেবল ওই শিরোনামটুকুতে ছাড়া। এটাই পর্যাপ্ত প্রমাণ যে, কবির বোধ কিংবা সত্যিকারের শৈশব বা যাপিত জীবন পাহাড়-ঘনিষ্ঠ নয়। পাহাড়ের অনুষঙ্গ বানোয়াট বটে। কবিতাটাও অনেকটাই বানানো কবিতা। তা হতে কোনও দোষ নেই। হতেই পারে, নদীবর্তী জীবনে পাহাড় নেই তো কী হয়েছে; হৃদয় যদি বহন করতে পারে পাহাড়! অসুবিধা কোথায়?

দশ.

প্রেমের কবিতা মাত্রই বিরহের কবিতা নয়; তবু বিরহের কবিতা মাত্রই চমৎকার সব প্রেমের কবিতা– বহু ভাষার অজস্র কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে, পাঠক হিসেবে, এটা আমার নিজস্ব উপলব্ধি। ভালো লেগেছে, এ কবিতাটিও। এর বেশি কী আর বলা যেতে পারে?

এগার.

কবিতাটি খুবই কবিতা। নির্বাসনের যে রোদন, সেটুকুনও মনছোঁয়া; কিম্বা সেটা কি কবিরই স্বেচ্ছানির্বাসন নয়। কী জানি!

বার.

কবিতাকে এত কষ্টকল্পনায় নেবার মধ্যে, কবি বা কবিতা কারুই পরিত্রাণ নেই। বেশ ক'টি শব্দকে জবরদস্তিমূলক মনে হল। অনেক সুন্দর একটি উপলব্ধি, এভাবেই, মার খেয়ে গেল, কেবলই শব্দ-কসরতের কারণে!

তের.

সুন্দর। অনেক নৈর্ব্যক্তিকতায় ছুঁয়ে যায় কবিতার ভেতরে সঞ্চালিত বোধ ও অনুভব। 'বতী' আর 'মতী' একই অর্থবোধক। 'তরঙ্গমতী' তৎসম থেকে যায়, 'তরঙ্গবতী' করলে কিছুটা বাঙলায়িত হয় শব্দটি। খুবই সামান্য বিষয়; তবু ব্যাপারগুলো ভেবে দেখতে অনুরোধ করি, এই কবিকে।

চৌদ্দ.

অনেক শব্দ-চাতুর্যে বোনা, সুন্দর কবিতা। যেটুকু বিশেষণ মোহ, ওটুকুই কবিতার দুর্বলতা। তা সত্ত্বেও, উপভোগ্য কবিতা।

পনের.

হুম...। চিন্তার উল্লম্ফনটি টানল। ভালো কবিতা। প্রচেষ্টাটিও ভালো, ভেতরে দুয়েকটি অসহিত্য ঘটেছে, প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের; এসবও কবিতার রসাস্বাদনে তেমন বাধা নয়।

ষোল.

ভালো লাগল। মিহিন কষ্ট। স্বাদুভঙ্গিমার কবিতা। শব্দালঙ্কারের চেয়ে ভাবনালঙ্কারে মনোযোগী হলে, এ হাতেই কবিতার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যেতে পারে।

সতের.

ভালো। প্রথম পাঠে মনে হল, বোধ, অনুভব ও চিন্তাটিতে অন্যান্য ভাষার কবিতার ভাবনা-ভঙ্গির রসায়ন ঘটেছে। বাঙলাভাষার কবিতা ভাবতে মন সায় দেয় না। তবু, ভাবনার আর ভাষা কী, ভৌগোলিকতাই-বা কী! অতএব, হতেই পারে! কবিতা।

আঠার.

বেশ সেয়ানা বোধ। যুবক কবিতা। বোধের ও বুননের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক ও ফাঁকি, কবির অন্তর্জ্বালাময়তা নিশ্চয় একদিন পেরিয়ে যাবে সেই বৈতরণী!

উনিশ.

বেশ কবিতা। অহেতু শব্দকাঠিন্য, পাঠক হিসেবে, আমাকে, পাঠের আরাম পেতে দেয়নি। আমি, যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবার কালেও, আরামের সাথে নিহত হবার পক্ষপাতী। কীর্তনখোলার ঢেউয়েও যে এত কঠিন শব্দসমবায় বয়ে যাচ্ছে, এতদিন লক্ষই করিনি!

বিশ.

সুন্দর কবিতা। বোধের রসায়নে সংক্রমণ আছে। কবিতার গৃহে প্রবেশের জন্য, পাঠকের সামনেও খোলা আছে বেশ কিছু দরজা-জানালা। তবু একজন কবির কাছে, শব্দের বিশুদ্ধতা এবং বানান ও শব্দরূপের নিখুঁত ধারণা প্রত্যাশা করি আমি। এই কবিতায়, শব্দরূপের অন্যায্য প্রয়োগ আছে।

একুশ.

গ্রামীণ নিসর্গ সত্যি প্লুত করতে পারে পাঠককে। এখানেও ব্যতিক্রম হবে না হয় তো; কিম্বা কী কারণে, এই বিবরণটুকু কবিতা মর্মে আখ্যায়িত হবে; আমার ক্ষুদ্র পাঠক-মন, সেটা বুঝতে সক্ষম নয়।

সাকিরা পারভীন : দুই

অন্য সকল স্রোত থেকে গা ভাসিয়ে কেবল সাহিত্যের স্রোতে নিজেদেরকে ডোবানোর জন্য শওকত ভাই ও নিশাত আপাকে যারপরনাই তিরস্কার করছি। আর আমাকে দিয়ে কবিতার পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখানোর যে উদ্যোগ তারা নিয়েছেন তার জন্য তীব্র মনোকষ্টে আছি। কবি তো ঈশ্বরতুল্য, তার তুলির আঁচড়ে আমি কেন নাক গলাব ভাই? এ তো রীতিমতো অত্যাচার। তবে নাছোড়বান্দা বলতে যা বোঝায় এই সম্পাদক-দম্পতির ক্ষেত্রে তা শতভাগ প্রযোজ্য। আমি কবিতা পড়তে ভালোবাসি, একটি কবিতা লিখতে পারলে সেটা আমার অপার আনন্দের বিষয়। তবে এ বিষয়ক আলোচনা লেখা বড়ই বেদনার, আর তার জন্য আমি কোনো ভাবেই প্রস্তুত নই। আমি বিশ্বাস করি আমার কাছে যে কবিতাটি একেবারেই ভালো লাগেনি; সেটি নিশ্চই অন্য কোনো পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কবিতার গুরুত্বশক্তিতে সব কবিতা যে সমান হৃদয়গ্রাহী এ-কথা নিশ্চয়ই কেউ স্বীকার করবেন না। এত কথার শানেনুযূল হল নাম না-জানা যেসকল কবির কবিতা নিয়ে কথা বলছি তারা দয়া করে আমার কথাকে কোনো রকম গুরুত্ব দেবেন না।

এক.

ছেনে টিপে...এরকম ভাষা কবিতায় ব্যবহৃত না-হওয়াই বোধ করি ভালো।

দুই.

ভালো কবিতা বলতে আমি বুঝি পাঠের প্রশান্তি, হৃদয়ের অলিতে-গলিতে সংঘটিত হওয়া আন্দোলনকে পাঠকের অন্তরে ছড়িয়ে দেয়া। সেই অর্থে আমিও কবির শ্যাওলায় পা রেখেছি। তবে সেই শ্যাওলার সবুজ নরম গালিচা থেকে পিছলে পড়েছি ভয়ঙ্কর স্বাদের কাছে। আমার খামার কাঁপা আকাশ স্কুল মেঘ চুর চুর-এর মতো লাইনের দারুণ মাত্রাবৃত্তের পরের শব্দ সংযোজনে শাখা 'নদীগুলির' প্রশাখা বিস্তার পাঠককে আক্রান্ত করেছে।

তিন.

কবিতা বহু রকম; ইহাও এক রকম, এ ধরনের কবিতাও প্রয়োজনীয় কবিতা।

চার.

এতক্ষণ ধরে তোমাকে চাওয়ার পর হঠাৎ করেই না-পাওয়ার প্রশ্নবাণ বিধ্বস্ত করেছে পাঠককে, এর বেশি আর কী বলতে পারি আমি। কেননা এমন বিধ্বস্ত অনুভবেই তো কবিতার পরিত্রাণ। আর সবশেষে 'কেন বললি'-র মাঝেই যেন প্রস্ফুটিত হল সকল কাব্যময়তা।

পাঁচ.

নগর রাত্রির ক কবিতাটির মুখরা রমণীর সুখরা সঙ্গম শেষে নীরব হওয়ার দৃশ্যটি বেদনার্ত ভালো লাগায় আবিষ্ট করেছে আমাকে।

ছয়.

প্রথম দুটি স্তবকের মধ্যেই কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। পরের অংশগুলো ছন্নছাড়া পথিকের মতো।

সাত.

এটি কবিতা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনো কবিতা ছন্দের অন্তর্বর্তী না-হলেও তার নিজস্ব একটা গতি থাকে। সোমরসের প্রাধান্য যতটা কবির মনে ততটা পাঠকের রসবোধে আসতে পারেনি।

আট.

বিষয় ও বোধের সাথে বাক্যবিন্যাসের সামঞ্জস্য থাকলে কবিতাটির টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। কবিতায় ঘোর ছিল। যেন সে ঈশ্বরীত.. .. এর মতো অনেকগুলো ভালো পঙক্তি আছে; তবে অসংলগ্নতা আছে ছত্রে ছত্রে।

নয়.

দূরাগত পাহাড়ের গান-এর নাম ও নস্টালজিয়াকে কোথাও কোথাও খাপছাড়া মনে হয়েছে। তবে শস্য কাটা হয়ে গেলে শূন্য মাঠ দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে পড়ে থাকে . . .কবির সাথে আমিও একমত। সেই হাহাকারের আল ধরে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে বহুদূর।

দশ.

.... [এই কবিতাটি সম্পর্কে আলোচক সচেতনভাবেই কোনো মন্তব্য করেননি। –সম্পাদক]

এগার.

সাধারণ হয়েও অসাধারণ কবিতা ।

বার.

ভাবনার সঞ্চালন পুঞ্জিভূত না হলে জোরপূর্বক লেখা কবিতা মনে হয় । নামের সাথে বিষয় ও কাব্যদ্যোতনার সংস্পর্শ অপ্রতুল ।

তের.

'কোন সে তরঙ্গমতী' নাম হলে কেমন হত? আর 'ভিন্ন গোলার্ধে ধাবিত–' এটুকু না-থাকলে কি খুব ক্ষতি হত? কবিই ভালো জানেন । কবিতাটা আরও জুতসই হত হয়তো-বা ।

চৌদ্দ.

দুর্বল কবিতা ।

পনের.

মাতাল কবি জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক, তা না হলে এমন ভাবনায় লেখা হয় কেমন করে? প্রকৃতপক্ষে আমরা একই বিশ্বের মানুষ, আবার এই মানুষই সকল ভৌগোলিক সীমারেখা তৈরি করেছে ।

ষোল.

মৃত্যুময় ঘুম আমাকে স্পর্শ করেনি । চাঁদের বোতাম উপমা সৃষ্টির বেলায় কতটা সার্থক সে প্রশ্ন আমার না-করাই ভালো । আমি তো পাঠক কবিতার কী বুঝি?

সতের.

কবিতাটি সম্পর্কে কিছু লিখতে পারলাম না বলে দুঃখিত ।

আঠার.

বর্তমান পণ্য ও পর্নোসভ্যতার পৃথিবীতে বসবাস করা সত্যিই দুরূহ । নাচঘরের কবিকে অভিনন্দন ।

উনিশ.

অথচ অদৃশ্য পুরোহিত এক কপটতা খুলে . . . খুব সুন্দর লাইন, আমাকে টেনে ধরেছে। বমির বদলে অন্য কিছু ছুড়ে ঘৃণা প্রকাশ করলে যে কম ঘৃণা প্রকাশ করত তা হয়তো নয়।

বিশ.
কামনা, বাসনা, প্রেম কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা কবি ও পাঠকমাত্রই জানেন। তবে আবেগের উন্মত্ত প্রবাহমানতাকে সুরে-শব্দে-ছন্দে পরিপূর্ণতা দানে পারঙ্গম না-হলে তেমন কবিতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ না-ও করতে পারে।

একুশ.
শব্দ সাজানোর অভিপ্রায় গোলমেলে ঠেকেছ। ল্যান্ডস্কেপের রঙ লাগাতে আর একটু যত্নশীল হলে আপনার ছবিটি গ্যালারিতে চড়া দামে বিক্রি হবে।

চি ত্র শি ল্প / প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে নারীর অবদান

....

র বি উ ল হু সা ই ন

শিল্পকলা সৃষ্টির ইতিহাস এদেশে ঐতিহাসিক সেই প্রাচীন আমল থেকেই শুরু হয়েছে। বগুড়ায় মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্থাপত্যশৈলী যা সেই আমলের বৌদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে, তা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ ও অহঙ্কার। সেইখানে ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির যে নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তাতে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের শিল্পকলার গৌরবময় অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য। আমরা সেই ঐতিহ্যের অংশীদার এবং এটাকেই বহন করে নিয়ে যাওয়ায় ধারাবাহিকতা ও পরম্পরায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদেশি অনুপ্রবেশকারী রাজনৈতিক

ক্ষমতাধরেরা এই দেশকে বিভিন্ন সময়ে শাসন করেছেন বলে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি ঠিকই, তবে সেগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাগুক্ত নিদর্শন সবই আমাদের ঐতিহ্যের গৌরবময় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য যা-ই হোক না কেন। রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার কারণে এক-এক যুগে এক-এক শাসকের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায় হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, পরে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক কারণে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে শিল্পচর্চার ধারাবহিকতা ব্যাহত হয়– যেহেতু ইসলাম ধর্মে শিল্পচর্চার মধ্যে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ ইত্যাদি অপরাধ ও অধর্মীয় কার্যক্রম বলে বিবেচিত হত। পাকিস্তান সৃষ্টির সময়েও এই আবহাওয়া বিরাজমান ছিল।

এই বৈরী সময়ে সেই ১৯৪৮ সালে সরকারি কলা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছিল দুঃসাহসী এবং একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যার গুরুভার বহন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। কলকাতা আর্ট স্কুলের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও শিল্পী দেশভাগের পর সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে যে অসমসাহসী পদক্ষেপে 'গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অব আর্টস' নামে শিল্পকলা চর্চার বিদ্যালয় পুরনো ঢাকার একটি ভবনের দুই কামরায় স্থাপন করেন যে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরে সেই স্কুল সেগুনবাগিচার মিউজিক কলেজে স্থানান্তরিত হয় ১৯৫১ সালে এবং এখনকার জায়গায় ১৯৫৪ সালে চারুশিল্পের নিজস্ব ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সেটি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। ভবনটির নক্সা করেন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। চারুশিল্পের সার্বিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ বিবেচনায় রেখে স্থপতি একটি অনুপম স্থাপত্যশৈলী উপহার দেন যা আমাদের দেশের আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে প্রথম ভবন বলে বিবেচিত। ঘটনাটি চমকপ্রদ ও একইসঙ্গে কাকতালীয় এই বিবেচনায় যে এদেশে আধুনিক চিত্রশিল্প এবং আধুনিক স্থাপত্যশিল্প প্রায় প্রায় একই সময়ে সেই আর্ট স্কুলের ভবন থেকে শুরু হয়।

শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকভাবে প্রাচীন ব্রিটিশ ভিকটোরিয়ান আদর্শের অনুসরণ করা হয়। হ্যাভেল কর্তৃক প্রচলিত শুধুমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতিই চর্চা করতে হবে এই ধারণায় বিপরীতে অবন ঠাকুর দ্বারা প্রবর্তিত বহমান প্রাচীন শিল্পধারার সঙ্গে আধুনিক শিল্পশৈলী মিলিত হয়ে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় শিল্পচর্চায় যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় সেটিই এখন পর্যন্ত বহমান। এর সঙ্গে পাশাপাশি বহমান রাজনৈতিক স্বাধীন চেতনা, সামাজিক অনাচার-অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানসগঠন ও পরিবেশ এই দেশে একটি নতুন শিল্পশৈলীর জন্ম দেয় যা একান্তভাবে এই দেশের এবং এই সমাজ-প্রতিবেশের। বিগত প্রায় ষাট বছর যাবত এই পৃথক ও ভিন্ন দৈশিক শিল্প-পরিচয়ে চিহ্নিত হচ্ছে বর্তমান শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতা। এই শিল্পমানস গঠনে অন্যান্যের পাশাপাশি যশস্বী বহু নারীশিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য এবং প্রশংসনীয়।

এই স্বল্প পরিসরে প্রতিটি নারীশিল্পীর সৃষ্টকর্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় অবকাশ না থাকলেও হয়তো এই প্রথম তাদের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার শুভারম্ভ হল যা পরে আরও সবার সহযোগিতায় বিস্তার লাভ করবে এই আশা করা যায়। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি সব নারীশিল্পী মিলে একটি পৃথক নারীশিল্পী সংগঠন স্থাপন করে তার কার্যক্রম শুরু করেন। যদিও নিম্নোক্ত তালিকাটি অসম্পূর্ণ ও বয়স অনুযায়ী সাজানো যায়নি এবং কারো নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে তাই আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব নিম্নলিখিত নবীণ ও প্রবীন নারীশিল্পীদের নাম বলা যায়, এরা হলেন– তাহেরা খানম, রওশন আরা আমিন, সৈয়দা মইনা আহসান, মোহসীনা আলী, জোবেদা ইসলাম, হাসিনা জামান, রুমী ইসলাম, এডলিন মালাকার, নভেরা আহমেদ, আসমা কিবরিয়া, শামীম শিকদার, ফরিদা জামান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, নাসরিন বেগম, নাইমা হক, সেলিনা চৌধুরী মিলি, রোকেয়া সুলতানা, আইভি জামান, কনকচাঁপা চাকমা, সাইদা কামাল, লালারুখ সেলিম, নীলুফার জামান, দিলারা বেগম জলি, নাজলী লায়লা মনসুর, নাহিদা শারমিন, ফারেহা জেবা, এ্যানি ইসলাম, রেবেকা সুলতানা, কুহু, গুলশান হোসেন, রোখসানা সাইদা, লায়লা শারমীন, সিতারা এলিন, তৈয়বা বেগম লিপি, ইফফাত আরা, নাসিমা হক মিতু, সুলেখা চৌধুরী, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, জাকিয়া খান চন্দনা, মনিরা সুলতানা মুক্তা, তারানা হালিম প্রমুখসহ অনেকে। উল্লেখযোগ্য যে এর ভেতরে অনেকেই শিল্পচর্চায় ততোটা হয়তো নিবেদিত থাকতে পারেননি সংসার আর স্বামী-সন্তানদের কারণে তবুও বলা যায় এরাই দেশের অন্যান্য শিল্পীদের পাশাপাশি এদেশের মূল শিল্পচর্চায় নিজস্ব দেশীয় ধারাবাহিকতা সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন।

যে কোনো শিল্পকর্মে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন পুরুষ কিংবা নারীভুক্তি সঠিক নয় যেহেতু ব্যক্তি নয় সৃষ্টিকর্মই একমাত্র বিবেচ্য হয়। তবু বিশেষ আলোচনা, ধারাবাহিকতা ও সরাসরি চিহ্নিত করার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র নারীশিল্পী বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে যেহেতু নারীশিল্পীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী তাদের সৃষ্টকর্ম রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্রশিল্পকে ঋদ্ধ করে চলেছেন।

প্রথমেই ভাস্কর নভেরা আহমেদের কথা বলতে হয়। তিনি আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী উভয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম আধুনিক ভাস্কর হিসেবে পরিচিত। বিদেশের মাটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে সিমেন্ট আর লোহা দিয়ে যেসব ভাস্কর্য
আধা-বাস্তব আধা-বিমূর্ত ধারায় মানুষ, প্রাণী ইত্যাদির অবয়ব হেনরি মুর, ব্রাঁকুসি প্রমুখ কালজয়ী ভাস্করদের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিক শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য।

নারীদের মধ্যে এর পরে শামীম শিকদার তার শিল্পকর্ম দিয়ে ভাস্কর্যশিল্পের প্রসার ঘটিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে তার বিভিন্ন বাস্তবধারার নিদর্শন দেখা যায়। তিনি ম্যুরাল বা দেয়ালচিত্রেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী তার স্থাপনা ও কাটুম-কুটুম ভাস্কর্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। বিভিন্ন গাছ-গাছালির আপাত-অপ্রয়োজনীয় শুকনো ডাল-পালা আর শেকড় দিয়ে তিনি তার শিল্পকর্ম সাজান ঘরের ভেতরে কিংবা দেয়ালে একটি নিজস্ব শৈলীর দেশজ পরিচয়ে।

ভাস্কর্যে আইভি জামানের জ্যামিতিক গঠনপ্রণালীসমৃদ্ধ আধুনিক ধারার মাটি ও মেটাল দিয়ে বিভিন্ন আকার– বিশেষ করে ত্রিভুজ, বৃত্ত, বর্গ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ কাজগুলো খুব উল্লেখযোগ্য। বিদেশের কোরিয়াতে তার ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে যা খুব গর্বের বিষয় এবং নভেরা আহমেদের পরে তিনিই এই বিষয়ে অগ্রগামী বলে বিবেচিত। ভাস্কর্যশিল্পের ধারাবাহিকতার অনেক নবীন ভাস্কর এগিয়ে আসছেন। এই ধারাবাহিকতায় নাসিমা হক মিতু ও তারানা হলিমসহ অনেকের নাম করা যায় যারা বর্তমানে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখছেন যা খুবই আশার কথা।

চিত্রশিল্প বা পেইন্টিং-এ সর্বপ্রথম নাম করা যায় তদানীন্তন আর্ট স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী শিল্পী তাহেরা খানমের। তারা পাঁচজন চিত্রশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্নাতক হয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। এরা হলেন তাহেরা খানম, রওশন আরা আমীন, সৈয়দা মইনা আহসান, জোবেদা ইসলাম এবং হাসিনা জামান। এদের মধ্যে একমাত্র তাহেরা খানমই এখনও কিছুটা সক্রিয় আছেন। কিছুদিন আগেও তিনি চিত্রক গ্যালারিতে একটি একক চিত্র প্রদর্শনী করেছেন। তার ছবি সহজ-সরল আঙ্গিকে আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান প্রকৃতি ও মানুষদেরকে নিয়ে অনায়াসে কাছে টানে। তার ব্যাচের অন্যরা চর্চার অভাবে হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন কিন্তু চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিশেষ করে নারীশিল্পীদের ক্ষেত্রে তাদের নাম বিশেষায়িত হয়ে আছে।

শিল্পী রুমী ইসলাম ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রী। তিনি বহুদিন ধরে রিয়াদে অবস্থান করছেন। তার বিমূর্ত ও মূর্ত ধারার ছবি একসময়ে এদেশে সাড়া জাগিয়েছিল।

শিল্পী আসমা কিবরিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত রং-এর বিভিন্ন আয়োজন সবাইকে আকৃষ্ট করে তোলে। তার শৈলী বিমূর্ত আবার কিছুটা আধা-বাস্তবতাসমৃদ্ধ।

এরপরে শিল্পী ফরিদা জামানের নাম করতে হয়। নারীশিল্পীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম চিত্রশিল্পে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। তার আধা-বাস্তবতাসমৃদ্ধ মাছ, নদী, জাল, পাখি, বিড়াল ইত্যাদি বিষয়ে চিত্ররচনার মধ্য দিয়ে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপনার উৎকর্ষে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন।

শিল্পী সেলিনা চৌধুরীর গ্রাফিক্সধর্মী কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী রোকেয়া সুলতানার শিশুসুলভ বাল্যবেলার বিমূর্ত বা আধা-বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টি বিশেষ করে বিমূর্তধারার ছবিগুলো খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বোধহয় সবচেয়ে বহুপ্রজ শিল্পী এবং নিয়মিত ছবি এঁকে চলেছেন এবং এইভাবে অন্যতম অগ্রণী শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নাঈমা হক বিমূর্তরীতি এবং রেখা ও প্রেক্ষাপটে বুনুনিসমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টিতে পারদর্শী।

নাসরিন বেগম তার শিল্পসৃষ্টিতে প্রাচ্যরীতি অনুসরণ করেন। এই রীতি লোকজধর্মী যা নিয়ে ছবি রচনা এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে চলেছে।

কনকচাঁপা উপজাতীয়দের বিশেষ আকর্ষণীয় জীবনযাপনরীতির দক্ষ ও সৃজনশীল শিল্পী। তাদের সহজ-সরল কিন্তু বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য তার ছবির মধ্যে বিমূর্ত বর্ণবহুল প্রেক্ষাপটে মূর্তরীতির প্রকাশে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেয় যা তাকে বিশিষ্ট স্থান ও মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।

সাইদা কামাল মূলত জলরং-এর শিল্পী। তার বিষয় ও ছবি আমাদের চেনা-জানা আশেপাশের আটপৌরে প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নিসর্গ, ফুল, পাখি, বারান্দা, গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে স্নিগ্ধ-সুন্দরের প্রতিচ্ছবি।

নীলুফার চামানের ছবি বাস্তবতাসমৃদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ ও সামাজিক অবিচার-অসংগতির প্রতিবাদে ব্যঙ্গাত্মকধর্মী যা সরাসরি দর্শকদের সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। নারী অধিকার সম্বন্ধেও তিনি সোচ্চার।

পুরুষশাসিত সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অধিকারবঞ্চিত, ধর্ষিত ও নিষ্ঠুর এ্যাসিড নিক্ষেপ দ্বারা যন্ত্রণাকারী বিকৃতির শিকার অসহায় নারীসমাজ আমাদের। এর প্রতিবাদে নারী অধিকার বিষয়ে অনেক শিল্পী কাজ করে যাচ্ছেন। এইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাজন, নিপীড়ন ও বঞ্চনা বা অসঙ্গতিও এরা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমাদের চিত্রশিল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যেমন পৃথকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-বিষয়ক চিত্রধারার জন্ম হয়েছে তেমনি শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে নারীশিল্পীদের মধ্যে পৃথকভাবে তাদের শিল্পসৃষ্টি দ্বারা নারী-অধিকার বিষয়ে একটি প্রতিবাদী স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে যা খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নীলুফার চামানসহ নাজলী নায়লা মনসুর, দিলারা বেগম জলি, ফারেহা জেবা, এ্যানি ইসলাম, সিতারা এলিন, তৈয়বা বেগম লিপি, সুলেখা চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নাজলীর বাস্তবতাসমৃদ্ধ ছবির মধ্য দিয়ে শহরের নাগরিক জীবন, মধ্যবিত্তের সামাজিক সঙ্কট, নারীদের প্রতি নির্যাতন, অবিচার– সব সরাসরি সাবলীলভাবে প্রস্ফুটিত যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা বিশেষ স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছে।

ফারেহা জেবা একজন সচেতন শিল্পী। নারী-মনীষীবৃন্দ যারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সবাইকে সোচ্চার ও প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন সেই বেগম রোকেয়া,

সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমামদের প্রতিকৃতি ও অন্যঅন্য অনুষঙ্গ নিয়ে নিজস্ব এক শৈলী সৃষ্টি করে তিনি ছবি সৃষ্টি করেন ।

এ্যানি ইসলাম এ্যাসিড-পীড়িত ও অত্যাচারিত হতভাগা নারী বিষয়ে ছবি এঁকে চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখাতে বাধ্য করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এইসব নিষ্ঠুর ও হৃদয়-বিদারক ঘটনা না ঘটে সেই সম্বন্ধে সবাইকে জানাতে চেয়েছেন ।

শিল্পী কুহু'র কালো বিশাল বাস্তবধর্মী মানুষের মুখ বা অবয়ব বিষয়ে চারকোল বা কালির ড্রইং রচনা তার চিত্রসৃজনীশক্তির দৃঢ় ক্ষমতার পরিচয় দেয় যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।

গুলশান হোসেনের অধিকাংশ বিমূর্ত ধাঁচের মাঝে-মধ্যে কিছু বিষয়ের অবতারণা, বর্ণাঢ্য এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছবি রচনা তার শক্তিমত্তার পরিচয় দেয় ।

তৈয়বা বেগম লিপিও উল্লেখযোগ্য শিল্পী । নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রবণতা, বাল্যস্মৃতি, নারীজীবনের নানান বিষয় মূর্ত-বিমূর্ততায় তার ছবিতে সাবলীলভাবে জায়গা পায় ।

ইফফাত আরা স্বশিক্ষিত শিল্পী । সহজিয়া, নাঈভসুলভ ড্রইং, বেশিরভাগ ফুল, পাখি, ফুলদানিবিষয়ক প্যাস্টেল রং-এর সরাসরি লেপনে একটি সরলতার পরিচয়ে বিম্বিত তার ছবি ।

নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা একজন শক্তিশালী শিল্পী । সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত অভিব্যক্তিশৈলী দিয়ে তিনি তার আকর্ষণীয় ছবি সৃষ্টি করতে পছন্দ করেন । গঠনের কাব্যিকধর্মী, রং-এর বহুধারায় বর্ণিল প্রস্ফুটিত, প্রেক্ষাপট এবং বুনুনিপ্রধান তার ছবিগুলো চিন্তা ও অবচেতনার স্নিগ্ধ-স্ফটিক ।

সুলেখা চৌধুরীর ছবি নির্মাণ ও বিষয়ে নাটকীয়তা এবং গঠনশৈলী চমকপ্রদ । ছবিতে মানুষের ঝুলন্ত মাধ্যাকর্ষণহীন অবয়ব, উল্টো করে বা পাশে স্থাপন, মূলত নারীর পীড়িত, নির্যাতিত ও যন্ত্রণাময় জীবনের আলেখ্য প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় যা ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়ছে ।

আরও অনেক শিল্পী তাদের সার্বিক চিত্রশিল্পের নিয়ন্ত্রণ চর্চার মাধ্যমে আমাদের চিত্রশিল্পকে বেগবান করে তুলে চলেছেন । সবার নাম ও তাদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় তবে সব মিলে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে । নারীশিল্পীদের নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা অবতারণার প্রেক্ষিতে আশাকরি সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী শিল্পী, শিল্প-সমালোচক, গবেষক বা শিক্ষক এই বিষয়ে আরো কাজ করতে এগিয়ে আসবেন ।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব-অপ্রভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিল্পচেতনা, শৈলী, প্রকরণ ও উপস্থাপনার বিচিত্র এই শিল্পযাত্রার ধারাবাহিকতা । বিগত বছরগুলির চাওয়া-পাওয়া, অর্জন-বর্জন সবই এই শিল্পমিছিলের সঙ্গী যা এগিয়েই চলেছে । নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের ক্রমাগত শিল্পকর্মের চর্চা বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন জলরং,

তেলরং, পোড়ামাটি, কাঠ, পাথর, সিমেন্ট, ধাতব এবং ছাপচিত্রসহ স্থাপনাশিল্পের বিভিন্নতা যেমন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি বাস্তব, বিমূর্ত, আধা-বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ থেকে শুরু করে শিল্পচর্চার প্রায় সব শৈলী ও মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন দেখা যায়। একজন শিল্পীর পৃথক শিল্পচেতনা থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে সামাজিক ও দৈশিক শিল্পচেতনার প্রবণতা এবং তা কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে প্রাগুক্ত সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তা অনুধাবন ও লক্ষ করা যায়। সবকিছু মিলিয়ে দেশে তাদের অবদানে যে একটি পরিপূর্ণ শিল্প-অবস্থা পৃথক পরিচয়ে সার্বিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং সেটিই আমাদের জন্য ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী একটি বিরাট অর্জন।

নারী / প্রবন্ধ

সমাজতান্ত্রিক দেশে নারী

....

রেহনুমা আহমেদ

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্ক্সবাদী নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশে নারীর অবস্থানের ওপর আলোকপাত করা। প্রবন্ধের বক্তব্য কোনো অর্থে মৌলিক (Original) নয়; এর ভিত্তি হচ্ছে প্রাপ্ত বইপুস্তকের একটি নির্বাচিত পাঠ। নারী বিষয়ে বাংলাদেশের বামপন্থীদের অবস্থান পৃথিবীর আর অন্যান্য দেশের গতানুগতিক মার্ক্সবাদীদের মতন। সেই দৃষ্টিতে, নারী আন্দোলন বুর্জোয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ব্যক্তিবাদী এবং সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের নারীদের অবসর যাপনের উপায়। বামপন্থীদের কাছে 'প্রধান' ইস্যু, যা ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে এবং যার নিরসন মানব-ইতিহাসের সবচাইতে চূড়ান্ত ঘটনা, হচ্ছে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম। তার অর্থ এই নয় যে মার্ক্সবাদ একটি সমাজের মধ্যে (অথবা বিভিন্ন সমাজের মাঝে) অন্যান্য দ্বন্দ্বের: জাতিগত, আঞ্চলিক, জাতীয়– কথা অস্বীকার করে। কিন্তু মার্ক্সীয় মতে, এ সকল দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের থেকে উৎসারিত অথবা তার

সাথে সম্পৃক্ত। এবং এ কারণেই ধরে নেয়া হয় যে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরসন হলে আর-সকল সামাজিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হবে। এর পাশাপাশি অবস্থান করছে একটি দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেই আন্দোলন অথবা তত্ত্ব শ্রেণীকে প্রাধান্য দেয় না সেটি শ্রেণীসংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও হঠকারী। বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি বাম নারী ও পুরুষের মনোভাব একই।

এই প্রবন্ধ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমি নারীবাদী অবস্থানের প্রকাশ-প্রত্যয়গত দিক আলোচনা করব এবং এই আলোচনার মাধ্যমে মার্ক্সবাদের অসম্পূর্ণতা তুলে ধরার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় অংশে আমি বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করব।

এক.

নারী-নিপীড়নের অধিকাংশ বিশ্লেষণ, এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদও ভিন্ন নয়, জীব-ঘেঁষা (biologically-biased)। এ ধরনের তত্ত্বের সমস্যা হচ্ছে যে জীবন-নির্ধারণবাদের (biological determination) কারণে মনে পড়ে যায় ফ্রয়েডের সেই বিখ্যাত ও বহুল উদ্ধৃত বাক্য 'লিঙ্গদেহই নিয়তি' (anatomy is destiny)| এটা ধরে নেয়া হয় যে নারীর অবস্থানে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। জীবগত (biological) ধারণার পেছনে যে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মতাদর্শগত উপাদান ক্রিয়াশীলতা অস্বীকৃত অথবা প্রত্যাখাত। আমি মারিয়া মিজ-কে অনুসরণ করে কিছু প্রধান প্রত্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীবাদী প্রকল্প উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

প্রকৃতি/প্রাকৃতিক (nature/ natural): জীবনধারণ ও পুনরুৎপাদনের কাজে নিয়োজিত নারীশ্রমকে তাদের কিংবা জীবক্রিয়া (biological function অথবা প্রাকৃতিক/ প্রকৃতি নির্ধারিত) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ অনুযায়ী নারী যা কিছু করে সবকিছু দেহ প্রসারিত (extension of physiology) বলে ধরে নেয়া হয়– গৃহ ও সন্ত ান লালন পালনের কাজ, সন্তানপ্রসবের কাজ, 'প্রকৃতি'প্রদত্ত গর্ভ ইত্যাদি। প্রাণী উৎপাদনে যে শ্রম ব্যয় করা হয় এবং এর মধ্যে সন্তান জন্মদানের শ্রম ও অন্তর্গত সেই শ্রমকে মানুষ ও প্রকৃতির সচেতন আন্তঃক্রিয়া (conscious interaction of a human being with nature) অন্য কথায়, সত্যিকার অর্থে মনুষ্য ধর্ম, (human activity) হিসেবে না দেখে একে প্রকৃতির কাজ হিসেবে দেখা হয়। এবং প্রচ্ছন্ন ধারণা হচ্ছে যে একই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগতের উদ্ভিদ ও পশু উৎপাদিত হয়; এই প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত।

গেইল রুবিনের মতে, ক্ষুধা ক্ষুধাই– তবে কোন জিনিষটা খাদ্য-উপযোগী তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত। প্রতিটি সমাজে, সেই সমাজ যত ক্ষুদ্র আকারের হোক না কেন, সংগঠিতভাবে অর্থনৈতিক কাজ সম্পন্ন করা হয়। যৌনক্রিয়া যৌনক্রিয়াই, তবে (যৌনক্রিয়া উপযোগী তা একই অর্থে সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত। প্রতিটি সমাজে আরো

আছে একটি যৌন/লিঙ্গ ব্যবস্থা (sex/ gender system)−এর মধ্যে রয়েছে বিবিধ নিয়মাবলি যার মাধ্যমে মানুষি যৌনতা ও পুনরুৎপাদনের জৈব কাঁচামাল মানুষি ও সামাজিক হস্তক্ষেপের ফলে গতানুগতিক আকৃতি ধারণ করে। এই নিয়মাবলি অপর সমাজে অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু সেই বিশেষ সমাজের জন্য গতানুগতিক। যৌনতা বলতে আমরা যা জানি ও বুঝি তা সমাজে উৎপন্ন− লিঙ্গীয় পরিচয়, যৌন কামনা ও কল্পনা (fantasy), বাল্যকালের ধারণা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে যৌনতার সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে লিঙ্গ, বাধ্যতামূলক বিপরীতকামিতা (hetero-sexuality) এবং নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ। যৌনতার সমাজ কর্তৃক বিভাজন হচ্ছে লিঙ্গ। লিঙ্গ, যৌনতার সামাজিক সম্পর্কপ্রসূত। নারী ও পুরুষ অবশ্যই ভিন্ন তবে এই ভিন্নতা দিন ও রাত্রির ভিন্নতা নয় অথবা পৃথিবী ও আকাশের ভিন্নতা নয়। কিছু সংখ্যক পুরুষের চাইতে লম্বা কিছু নারী সব সময়ই পাওয়া যাবে− তবে হ্যাঁ, গড়ে পুরুষেরা নারীর চাইতে লম্বা। নারী ও পুরুষ একেবারে ভিন্ন, পৃথক এবং এই পার্থক্য ও বৈপরীত্য প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত, এই ধারণা কিন্তু সামাজিক।

শ্রম

আধিপত্য ও শোষণের সম্পর্ককে রহস্যাবৃত করা হয় প্রকৃতির জীবধারণা দ্বারা− প্রকৃতির (নারী) ওপর মানুষের (পুরুষ) আধিপত্য। নারীর প্রকৃতির সাথে অন্তঃক্রিয়ার জীবতান্ত্রিক সংজ্ঞায়নের (biologistic definition) মাধ্যমে সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন পালন এবং বাকি গৃহকর্ম 'শ্রম' বা 'কাজ' বলে মনে হয় না। ধরে নেয়া হয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুরুষ যে উৎপাদনশীল কাজ করে থাকে তাই শ্রম, অন্য কথায় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য যে শ্রম দেয়া হয়। নারীও উদ্বৃত্ত-মূল্য শ্রম দিয়ে থাকে কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারীকে গৃহিণী বা হাউস-ওয়াইফ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যার অর্থ দাঁড়ায়, সে শ্রমিক নয়।

যৌন শ্রম বিভাজন (sexual division of labor):

শুনলে মনে হয় নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে যে শ্রম ভাগ করে নিয়েছে তার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তাতে সত্য আবৃত থাকে যথা, পুরুষের কাজ মানুষসুলভ− সচেতন, যৌক্তিক, পরিকল্পিত, উৎপাদনশীল ইত্যাদি আর নারীর কাজ তার 'প্রকৃতি' দ্বারা নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত। এই সংজ্ঞা অনুসারে যৌন শ্রম বিভাজন 'মানুষের শ্রম' এবং 'প্রাকৃতিক কাজ'-এর মধ্যকার বিভাজন। আরো গুরুত্বপূর্ণ এই প্রত্যয়ের মাঝে যেই কথাটা অন্তর্নিহিত থাকে তা হচ্ছে, পুরুষ (মানুষ) এবং নারী (প্রাকৃতিক) শ্রমিকের সম্পর্ক আধিপত্য এবং শোষণের সম্পর্ক। এখানে শোষণ বলতে মিজ বোঝাতে চাচ্ছেন, উৎপাদক এবং ভোক্তার মাঝে সৃষ্ট মোটামুটি স্থায়ী ব্যবধান আর স্তরবিন্যস্ততা

এবং ভোক্তা দ্বারা উৎপাদকের উৎপাদিত শ্রম এবং সেবামূলক কাজের (goods and services) আত্মসাৎকরণ।

গেইল রুবিনের দৃষ্টিতে পুনরুৎপাদিত প্রক্রিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গৃহকাজ এবং নারী যেহেতু গৃহকাজ সম্পাদন করে থাকে, শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বন্ধনে (অন্য কথায়, পুঁজিবাদ) নারী পুঁজিবাদের অংশ। কিন্তু, তাঁর মতে, নারী পুঁজিবাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেটা এক জিনিষ আর এই প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নারী- নিপীড়নের সূত্রপাত লুকিয়ে আছে, তা দাবি করা আরেক জিনিষ। বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে পৌঁছুলে পুঁজিবাদ নারী ও নারী-নিপীড়নের সম্বন্ধে অর্থবহ কিছু বলতে ব্যর্থ হয়ে যায়।

নারী এমন সব সমাজে নির্যাতিত ও নিপীড়িত যেগুলোকে কোনো অর্থেই পুঁজিবাদী বলা যায় না। এমাজন উপত্যকা এবং নিউ গিনিতে প্রায়শই দলীয় ধর্ষণের মাধ্যমে নারীদের 'যথাযথ' স্থানে রাখা হয়। একজন মুণ্ডরুকু পুরুষের ভাষায়, 'আমরা আমাদের নারীদের কলা দ্বারা শৃঙ্খলিত করি' (we tame our women with the banana')। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ ধরনের উদাহরণের অভাব নেই। প্রাক-পুঁজিবাদী, পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক– সব ধরনের সমাজব্যবস্থায় নারীকে তার নির্ধারিত স্থানে রাখার বিভিন্ন উপায় সৃষ্টি করা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে, শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে এসবের ব্যাখ্যা মেলে না। এবং শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণ কেনই-বা ধরে নেবে নারীই গৃহকাজ করবে, পুরুষ করবে না। এঙ্গেলস বিশ্ব-ইতিহাসের যে ক্রমবিবর্তমান ধারা উপস্থাপন করেছিলেন, বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক তথ্য, উপাত্ত এর সত্যতা প্রমাণ করে না।

দুই.

পৃথিবীর প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেই দেশে সংঘটিত হয় এবং সেই কারণে সে-দেশের নারীদের অভিজ্ঞতা, অবস্থান ও মর্যাদা পর্যবেক্ষণ করার গুরুত্ব অসীম। গতানুগতিক মার্ক্সবাদীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির ফলে নারী -মুক্তি ও স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে। নারীদের শিক্ষা, কাজ, প্রসবকালীন ছুটি, বিবাহবিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, এক বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন ও নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সমাজে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পরপরই শ্রমআইন প্রয়োগ করা হয়। এই আইন ৮ ঘণ্টা শ্রম, সামাজিক বীমা, সন্তানপ্রসবের পূর্বে দুই মাস ও পরে দুই মাস প্রসবকালীন ছুটি, স্তন্যদানের জন্য কর্মক্ষেত্রে সময় প্রদান, শিশুশ্রম ও নারীদের রাত্রিতে কাজ করা নিষিদ্ধকরণ, নিশ্চিত করা হয়। লিঙ্গীয় সমতা ও সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক

আইনত প্রদান করা হয়। বিয়ের পর একজন মহিলা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার স্বামীর সাথে থাকতে বাধ্য ছিল এবং স্বামীর কর্মস্থল পরিবর্তিত হলে সেই নতুন শহরে/ স্থানে যেতে বাধ্য ছিল– এ-ধরনের আইন পাল্টে দেয়া হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পদ্ধতি সহজ করা হয় এবং বিয়েকে একটি সিভিল চুক্তিতে করা হয়। একক (single) মহিলাদের সন্তানদের বিবাহিত মহিলাদের সন্তানের মতন সমান অধিকার দেয়া হয়। গর্ভপাত বৈধ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জেনোতদেল (কমিউনিস্ট পার্টির নারী দপ্তর)-এর কর্মীরা সারা দেশে পতিতাবৃত্তি রোধের অভিযান পরিচালনা করে, মধ্য এশিয়ায় মুসলমান মহিলাদের বোরখা ছাড়ো (unveiling) আন্দোলন সংগঠিত করে এবং অক্ষরদান ক্লাস শুরু করে।

কমিউনিস্ট চীনে ১৯৫০ সালে প্রথম জাতীয় বিবাহ আইন গ্রহণ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামোতে সংস্কার এনে নারীমুক্তির ভিত্তি স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা নিহিত ছিল। কনফুসিয়াসের পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতাবিরোধী এই আইন ছিল সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী। বহুবিবাহ, উপপত্নীত্ব (concubinage), বাল্যবিবাহ, পণবিবাহ, নারীশিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদ, পুনঃবিবাহ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার– নারীদের এসকল অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যখন কমিউন প্রতিষ্ঠিত করা হয়, পারিশ্রমিক পরিবারের পরিবর্তে সরাসরি নারীকে দিতে হবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উৎপাদনমূলক শ্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন– ক্যান্টিন, নার্সারি) স্থাপন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে নারীদের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বের সামাজিক নিয়ম ভেঙে নতুন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে যার আলোকে নারী সক্ষম, উৎপাদনশীল ও কর্মঠ। এই নতুন সমাজ সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সুযোগের পরিসর তৈরি করে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাকে কোনো অর্থে খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা সত্য যে এই অভিজ্ঞতা নারীবাদীদের নারী নিপীড়নের ব্যাপকতা ও গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজতন্ত্র নারী-অধস্তনতার বিষয়টিকে শ্রেণীবিশ্লেষণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে সক্ষম হয়নি এবং এ কারণেই নারী-নিপীড়নের নির্দিষ্টতা (specificity) অস্বীকৃত থেকে গেছে। নারী- নিপীড়নের নির্দিষ্টতার বিভিন্ন দিক আমি নিচে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মার্কসবাদের প্রধান প্রত্যয়– শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রমপ্রক্রিয়া, রাষ্ট্রে–নারী অধস্তনতাকে তাত্ত্বিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ এবং এক্ষেত্রে একটি সুপ্ত ধারণা বিদ্যমান যে, মুক্তি– সে নারী হোক আর পুরুষ হোক এর পথ হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ। পুঁজিবাদের স্থলে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারলে সকল মানুষের চাহিদা (লিঙ্গ নির্বিশেষে) পূরণ করা সম্ভব হবে। লিঙ্গ নির্বিশেষে যে নারী-

নিপীড়নের উৎসস্থল উপলব্ধি করা সম্ভব না, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাই প্রমাণ করে। জুডিশ স্টেসির ভাষায়, ‘নারী-নিপীড়নের সূত্রপাত গৃহে। নারী নিপীড়নের কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর হচ্ছে পরিবার যা সর্ব ঐতিহাসিক, সর্ব সাংস্কৃতিক’ (Woman’s oppression starts right at home. The family is the central, institutional context for the transhistorical transcultural oppression of woman’) বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর পাবলিক কিংবা গৃহের বাইরের ভূমিকা পূর্বেকার তুলনায় অনেক উন্নত। সে দেশের নারীরা ইঞ্জিনিয়ার পদের ৪০% অধিষ্ঠিত, ৫৯% টেকনিকাল পদে এবং ৫০% উচ্চশিক্ষায়। কিন্তু একই সাথে ১৯৩০ দশকে নারীরা গৃহকর্মে যতখানি সময় ব্যয় করত ঠিক একই পরিমাণ সময় তাদের এখনো গৃহকর্মে দিতে হয়। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে এক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য দেয়া হল। কর্মরত নারী ও পুরুষের সময় ব্যয়ের (time budget) হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে গৃহকর্মের প্রধান দায়িত্ব নারীরা পালন করে। আরেক গবেষণায় ৩ ও ৪ বছরের শিশুরা প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেছিল, ‘মা কাপড় ধোয়, রান্না করে, ও হাঁড়ি বাসন ধোয়। বাবা খায়, টিভি-তে ছবি দেখে ও খবরের কাগজ পড়ে’ (‘Mumary does the laundry, cooks and washes dishes. Daddy eats, watches films on TV and reads the paper’)। পর্যাপ্ত সংখ্যক সামাজিক ভোজশালায় ও শিশু লালনাগার প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে তোলা হচ্ছিল কিন্তু (ক) সীমিত সম্পদের কারণে এবং (খ) গৃহকাজকে অনুৎপাদনশীল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা কমিয়ে দেয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে চাকরিরত নারী ও পুরুষের টাইম-বাজেট

(প্রধান পদে ব্যবহৃত সময় গড়ে প্রতিদিনের কত মিনিট)

	পাজভ,	**সোভিয়েত ইউনিয়ন**
	নারী	**পুরুষ**
মোট চাকরীতে	৪৭৮	৫০৬
মোট গৃহকর্মে	১৭০	২৮
গৃহের অন্যান্য দায়িত্বে	২৭	৩৯
মোট সন্তান পালনে	৩০	৩০
মোট ব্যক্তিক চাহিদা (নিদ্রাসহ)	৫৪৬	৫৭৩
পড়াশুনা ও অংশগ্রহণ	২৭	৫২
মোট গণমাধ্যম	৭৩	১২৫
মোট অবসর	৪৮	৫৫
মোট যাতায়াত	৮১	২০
মোট মিনিট	**১৪৮০**	**১৪২৮**

সূত্রঃ এ-স্জালাই, The use of Time mouton, the Hague, 1972 Ann Oakley-র Subject women-এ উল্লিখিত

চীনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পাওয়া যায়। গৃহকর্ম যে নারীর একার দায়িত্ব এই সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধ পরিবর্তন করা সহজ নয়। উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিতে নারী পুরুষের মতন অন্তর্ভুক্ত নয়। সালাফের হিসাবানুসারে কৃষি শ্রম বিগেডের ৪০% নারী, কিন্তু পুরুষের তুলনায় তাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বিক্ষিপ্ত (ংঢ়ড়ৎধফরপ) গৃহকর্ম ও সন্তান লালন পালনের চাপ অতি প্রকট। চীনের শহরাঞ্চলে পুরুষেরা যদিও গৃহকর্মে অধিক সাহায্য করে থাকে সমাজে কাজের চাকরি (employment) কমে গেলে নারীদের প্রথম ছাঁটাই করা হয় এবং স্বল্প বেতনে, পাড়ার অবস্থিত 'গৃহিণী' শিল্পে (local neighborhood 'housewife' industries) তাদের নিয়োগ করা হয়।

'মা' হিসেবে নারীর যে গতানুগতিক চিত্র রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে তা বিদ্যমান। সন্তান লালন পালন করা মা'র দায়িত্ব। শুধু দায়িত্ব নয় তার গৌরবও। মাতৃত্বকে রোমাঞ্চিত করা এবং নারীসুলভ গুণ' (Feminine quality) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই নীতির বস্তুগত কারণ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক; ৬০ ও ৭০-এর দশকে জন্মহার কমে যাবার কারণে নারীর সন্তান পুনরুৎপাদনের ক্ষমতার ওপর অধিক জোর দেয়া হচ্ছে। বহুসন্তানেরে জন্মযাত্রীকে সেই কারণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অপর দিকে চীনে ডেমোগ্রাফিক কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণ ও একসন্তান পরিবার আবশ্যক। পিতৃতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য patrilocality (বিয়ের পর স্বামীর পৈতৃক গ্রামে/ বাড়িতে গিয়ে থাকা), এখনো স্বাভাবিক। জুডিথ স্টেসির মতে, patrilocality-র কারণে চীনে অনেক নারী সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে অসুবিধের সম্মুখীন হয়। এবং এর ফলে, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাশালী পদাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় কারণ এই নতুন গ্রামে বা স্থানে তাকে কেউ চেনে না; জানে না, তাকে নিজের অভিজ্ঞতা ও সুনাম আবার করে গড়ে তুলতে হয় এবং চেষ্টায় নিয়োজিত সমবয়সী পুরুষের থেকে সবসময় পিছিয়ে থাকে। এই স্থানান্তরের ফলে সে কর্মক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাও হারায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশে যে ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় অপ্রতিনিধিত্ব একেবারে চোখে পড়ে তা হল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭৫-এর তথ্যানুসারে, সুপ্রিম সোভিয়েতের ৩৫%, কেন্দ্রীয় কমিটির ২% ও পলিটব্যুরোর ০% নারী। চীনের সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি তবে অন্যতম নেত্রীরা– চিং সুং লিং, তেং য়িং চাও, চিয়াঙ চিঙ এবং ইয়েহ চুন– যে পুরুষ-নেতাদের বর্তমান অথবা বিধবা স্ত্রী তা বেশি আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয় না।

কাজের ক্ষেত্রে স্টিরিও টাইপ– নারীকে বিশেষ কাজে মানায়, অন্য কাজে মানায় না। পারবে না– সমাজতান্ত্রিক দেশেও আছে। চীনের ক্ষেত্রে নারীরা গতানুগতিকভাবে প্রচলিত 'নারীর কাজ'ই করে থাকে। সকল শিশু স্কুলের (নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন) শিক্ষক মহিলা। তা চাইয়েল বস্ত্র কারখানায় তাঁতের কাজ করে মহিলারা, আর তত্ত্বাবধান ও মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে পুরুষ। পিপলস লিবারেশন আর্মির পৃথক নারী ব্যাটালিয়ন সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। যদিও সচেতনভাবে পুরুষ-সংজ্ঞায়িত কার্যস্থল নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে এর বিপরীতে। তার মানে সামাজিকভাবে স্বীকৃত নারী-সংজ্ঞায়িত কাজ পুরুষও ধীরে ধীরে করছে, এ ধরনের কোনো প্রবণতার এখনো সূত্রপাত করা হয়নি। শ্রমের ক্ষেত্রে লিঙ্গীয়করণ (এবং তার মাধ্যমে গতানুগতিক ধারণা পুনর্বহাল করা)-এর আর একটি উদাহরণ কিউবা। ১৯৬৮ সনে শ্রম মন্ত্রণালয় ৪৭ ও ৪৮ ধারা মাত্র পাঁচ শত চাকরিক্ষেত্র বিশেষভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়; একই সাথে সমসংখ্যক চাকরিক্ষেত্র নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। এই ধারার একটি ফলাফল ছিল 'প্রাকৃতিক' লিঙ্গীয় বিভাজন (যা আসলে প্রাকৃতিক না সামাজিক) কে শক্তিশালী করা।

লিঙ্গীয় শোষণ ও নিপীড়নের নির্দিষ্টতা অস্বীকারের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখা যায় নারী পুরুষের তুলনায় দ্বিগুণ খাটছে– সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছে (এঙ্গেলসের মতে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ নারীমুক্তির পূর্বশর্ত) আবার একক পরিবারে 'প্রাকৃতিক'ভাবে নির্ধারিত গৃহকাজ সম্পাদন করছে (পূর্বে উল্লিখিত যে স্টালিনের শাসনামলে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহকাজ অনুৎপাদক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর ফলে গৃহকাজের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সামাজিকীকরণ– ভোজনালয়, শিমু লালনাগার– এর পরিকল্পনা ব্যাহত হয় ও এই দায়িত্বগুলো নারীর ওপর বর্তায়। ৬০-এর দশকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল কিন্তু সেই আশা তাড়াতাড়ি নিভে যায় সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীদের সুপারিশমালার ফলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যা হ্রাস, বিবাহবিচ্ছেদের হার এবং মদ্যপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় তাদের মতে, পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ ও নারীর মা ও গৃহিণী হিসেবে ভূমিকা দৃঢ় করা। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নে বিবাহবিচ্ছেদ খুব অর্থসাপেক্ষ ব্যাপার। এসবের ফলে মতাদর্শাগতভাবে পরিবর্তন লক্ষণীয়; নারীর রক্ষণশীল চিত্র– নারী মাত্রই জননী হতে ভালোবাসে, মায়ের সন্তান লালন পালন করার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, পরিবারের সবাইকে সেবার মাধ্যমে নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা আসে– এই কারণে গণমাধ্যমগুলোতে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

শোষণভিত্তিক শ্রেণীসমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন এবং এর নিরসন অন্যসব বিভাজন ও অসমতাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর করবে; এই ধারণা যে অনেকাংশে ভ্রান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা তাই প্রমাণ করে। উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের সাথে লিঙ্গীয় সম্পর্কের যুক্ততা এবং বিযুক্ততা, অনুসন্ধান করাই হচ্ছে

মার্কসবাদী নারীবাদীদের লক্ষ্য। সমাজে যৌনতা (sexuality), গৃহ উৎপাদন, পিতৃতন্ত্র, পুনরুৎপাদন পারিবারিক কাঠামো, মতাদর্শ– এ সকল বিষয় মার্কসবাদী নারীবাদীদের বিচরণক্ষেত্র। শুধুমাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এর নিরীক্ষণের মাধ্যমেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব যার সাহায্যে অর্থনৈতিক শ্রেণীর চাইতে পুরানতম, আদিমতর লিঙ্গীয় শ্রেণী বিলুপ্তি ঘটবে।

তথ্যপঞ্জী

১. শামীম আখতার, 'নারীমুক্তি আন্দোলন' চিন্তায় বিভ্রান্তি একটি সামাজিক প্রেক্ষিত: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সংখ্যা ১, এপ্রিল (বৈশাখ) ১৯৮৫।

2. Michele Barnett, Women's Oppression Today, Problems in Marxist Feminist Analysis, verso Editions and NLB, London, 3rd impression, 1984.

৩. আয়শা খানম, 'আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নারীসমাজ', নারীজাগরণ ও মুক্তি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৬।

4. Carofee Bertgeldorf এবং Alice Hageman, Emerging from underdevelopment "Women and work in Cuba," Lillah R. Eisenstein. Capitalist Patriarchy and the case for socialist feminism. Monthly Review Press, New York 1979.

5. Mary Buckley, "Soviet interpretations of the Woman question," Barbara Holland সম্পাদিত Soviet sisterhood. British feminists on the USSR. Fourth Estate, London, 1985.

6. Annette Luha এবং Ann Marie Wolpe, "Feminism and Materialism", তাদের সম্পাদিত Feminism and Materialism, Women and modes of production গ্রন্থে RKP, London (reprinted) 1980.

*Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a world scale. Women in the international Division of labor, Zed Books Ltd, London, 1986.

7. Maxine Motyneu, "Family Refort in Socialist states: The Hidden Agenda" Feminist Review, No. 21 Winter: 1985.

8. Ann Oakley, Subject Women, Fontana Presa, London (2nd impression). 1985.

*.Gayle Rubin-এর The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy of
Sex", Rayna Reiter-এর সম্পাদিত Toward an Anthropology of women. Monthly
Review Press, N. Y, 1975.

10. Judith Stocey, "When Patriarchy kowtows: The significance of the Chinese Family Revolution for feminist Theory, Eisenstein সম্পাদিত গ্রন্থে।

11. Berye Williams, "Lollpntai and After: Women in the Russian Revolution, "Sian Reynolds সম্পাদিত Women, state and Revolution, Essays on Power aud Gender in Europe since 1978, Wheats Leaf Books, London 1986.

ছ ড়া / প্র ব ন্ধ

ছড়া ভাবনা

....

আ মী রু ল ই স লা ম

ছড়া ও কবিতার পার্থক্য

সর্ব অর্থে কবিতার ভুবন ব্যাপক ও বিশাল। কবিতার জগৎ বিমূর্ত। শব্দ ও বাক্যের গ্রন্থনায় ভাব ও মনীষার অনুভূতিময় প্রকাশই হয়তো কবিতা। কবিতা কাকে বলে? কবিতার বিষয় কী? কবিতা কেন কবিতা হয়ে ওঠে? এসব প্রশ্নের মীমাংসিত উত্তর সমালোচকদের জানা নেই। কবিতা আদতে অমীমাংসিত রমণীর মতো। রহস্যময়,

কলানিপুণা এবং অধরা-মাধুরী। কবিতাকে আমরা সহজবোধ্য করে তোলার জন্য নানা শ্রেণীবিন্যাস করি। কবিতাকে বুঝে ওঠার জন্য নানা প্রকোষ্ঠ গড়ে তুলি। খোলা জানালা দিয়ে কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে চাই আমরা।

কবিতা একান্তই কবিতাই। তবে কবিতার বিভাজন প্রয়োজন এই কারণে যে তাতে বিমূর্ত কবিতা হয়তো বোধগম্য পর্যায়ে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। কবিতার জগৎ দুর্বোধ্য, রহস্যময়। কবিতা সত্যদ্রষ্টা। কবিতা আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জীবন যাপনের প্রতীক। আমাদের প্রবহমান চিন্তা-ভাবনার প্রতীক।

কবিতার অগ্রগাত্রা বহু-বিচিত্রগামী। নক্ষত্রের পথে-প্রান্তরে কবিতার অভিসার। ছন্দ ও শব্দের মাধ্যমে কবিতা গীতল, স্নিগ্ধ ও শৃঙ্খলিত। কবিতা নিয়ে বহু মতবাদ। কাকে বলে কবিতা? এ নিয়ে অনেক মতভেদ, অনেক মতপার্থক্য।

কেবল সুরেলা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দই কবিতার আত্মা? জীবনের গভীরতম ভাব, উচ্চতম অনুভূতি কি কবিতার জন্ম দেয়? কবিতার বিষয়ভাবনায় কি দার্শনিক তত্ত্বের কোনো ভিত্তি আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত। আর মীমাংসিত নয় বলেই কবিতা শিল্প। প্রতি মুহূর্তে কবিতায় সঞ্চারিত হয় অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

কবিতা বহু রকমের বলেই অনেক বিভাজন– গীতিকবিতা, লিরিক, রাজনৈতিক কবিতা, প্রেমের কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, নীতিকবিতা, মহাকাব্য, লঘু কবিতা, চটুল কবিতা, হাজারও রকমফের রয়েছে কবিতার।

কবিতার সেই বিশাল জগতের একটা অনতি-উজ্জ্বল জগৎকে ধারণ করে আছে ছড়া। ছড়া কবিতারই আরেক রূপ। কিছুটা চপল, ঝরনার মতো চঞ্চল, লঘু ও ক্ষিপ্রতায় কবিতার ভারী পৃথিবীকে ছড়া নাড়া দেয়।

ছড়া যে ভাব ও কল্পনাকে ধারণ করে কবিতা তা থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকে। ছড়া কবিতার মতো কিন্তু কবিতা কখনই ছড়ার মতো নয়। ছড়ায় কাব্যিকতা থাকতে পারে। কিন্তু নিটোল কবিতার মধ্যে ছড়াত্ব পরিত্যাজ্য। টলটল করে এগিয়ে যাওয়া একটি কবিতা হঠাৎ করে ছড়ায় রূপান্তরিত হতে পারে। এমন একটি চটুল বিষয়ের অবতারণা কবিতাকে নিমেষে ছড়ায় রূপ দিতে পারে। কিন্তু সূচনালগ্নেই একটি ছড়া চটুলতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কবিতায় পর্যবসিত হয় না। বাংলা ছড়া কবিতা থেকে এ রকম অসংখ্য উদাহরণ নিয়ে কণ্টকিত করা যায় এই সামান্য রচনা। কিন্তু কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি ছড়া নিটোল ও স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী হয়ে ওঠে। প্রকৃত ছড়াকার ছড়ার সে মেজাজকে ধারণ করতে পারেন। তিনি জানেন, ছড়া ও কবিতার বিভাজনরেখাটি কত সুন্দর ও সাবলীল। তিনি জানেন, কিভাবে একটি ছড়া প্রকৃত ছড়া হয়ে ওঠে।

ছড়া কবিতার বিভাজনরেখাটি একটি ম্যাজিক লাইন। বাংলা ভাষায় অসংখ্য রচনা হালকা পদ্য হয়েছে। ছড়া বা সার্থক কবিতার শর্তপূরণ তারা পূরণ করতে

পারেননি। বর্ণনাত্মক পদ্য বা সার্থক ছড়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। ছড়া তার কোন গুণাবলি নিয়ে 'ছড়া' চারিত্র্য অর্জন করে তা নিয়ে এখনও অনেক বিতর্ক হতে পারে।

তবে যারা ছড়াকে হালকা ও অর্থহীন মনে করেন সেই উন্নাসিকদের বলতে চাই– ছড়া লেখা সহজ কর্ম নয়। যে কোনো কবিতাকে কবিতার বরলক্ষ্মী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। কিন্তু ছড়া বড় আত্মসচেতন মাধ্যম। ছড়া বড় বর্ণচোরা। মায়ের আঁচলে সে লুকিয়ে থাকে– ছড়াকে তাই সনাক্ত করা কঠিন। কখনও সে অর্থহীন। কখনও সে অর্থদ্যোতনায় উজ্জ্বল। কখনও সে ধ্বনিপ্রধান। কখনও সে ছন্দ-মিলে উজ্জ্বল। কখনও সে কাব্যমধুর। পদ্যের লালিত্যমাখা রাগে সে আচ্ছন্ন। কখনও মায়ের মুখের বুলি। কখনও ছড়া সামাজিক অসংগতির প্রতীক। কখনও কশাঘাত। কখনও মধুর– কখনও তিক্ত। ছড়া কখনও ইতিহাস-চেতনার দর্পণ। কখনও গভীর বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপনের চপলতায় মুখর। ছড়াকে তাই কবিতার ভুবনে একই পঙ্‌ক্তি-আসনে উপবেশন করানো বড় মুশকিল। ছড়া ও ছড়াকারকে যারা উপেক্ষা করেন, সাহিত্যিক মর্যাদা দেন না, তারা জানেন না যে ছড়া সাহিত্যের আধুনিকতম মাধ্যম এবং অনেক শক্তিশালী ।

ছড়া কবিতারই রূপ। ছড়া কবিতারই অংশ। ছড়া কবিতা ফরমের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ছড়ার শক্তিমত্তা অনেক। তাই একজন ছড়াকার আসলে মুখোশ-পরা কেউ নন। তিনিও বড় অর্থে কবি। অনুরোধ করি, যারা ছড়া লেখেন তারা সত্যিকারের ছড়া লিখুন। কারণ ছড়াকারকরাও আসলে বড় কবি।

কবিদের আসনে তারাও সভাসদ। যদি কবিতা সাহিত্যে টিকে থাকে, ছড়া টিকবে তার চেয়ে বেশি কাল। কারণ কবিতার চেয়ে ছড়া অনেক লক্ষ্যভেদী। অনেক বেশি যোগসূত্র স্থাপনকারী। অনেক ক্ষেত্রে কবিদের চেয়ে ছড়া শক্তিশালী তাই কবিদের চেয়ে ছড়াকাররাও বড়। ছড়া ও ছড়াকার নিয়ে তাই উপেক্ষা ও অনাদর নয়– সাহিত্যের অনেক শক্তিশালী মাধ্যম ছড়ার জয়যাত্রা হবেই। আমরা সেই পথের অভিযাত্রী।

দুই.
আমাদের ছড়া

সাহিত্যে আদিমাতার বরপুত্র ছড়া। আমাদের সুদীর্ঘ উজ্জ্বল ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় ছড়া অর্জন করেছে তার নিজস্বতা। ছেলেভুলানো ছড়া বা লোকছড়ার বিশাল মধুভাণ্ডে বাঙালির নিজের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ছড়া আধুনিক যুগে ঋদ্ধ হয়েছে সমকালকে উপজীব্য করে। চিরকাল বাঙালির জীবনযাপন, সহজ সরলতা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার সহজ প্রকাশ ছড়ার মাধ্যমে। ছাড়া তাই নিতান্তই ধ্বনিপ্রধান আড়ম্বরহীন কিছু শব্দগুচ্ছ নয়, ছড়া আমাদের জাতীয় জীবনের চালচিত্র।

আমাদের ছড়া এখন নিজস্বতা ও আধুনিকতায় অনেক সরব ও উচ্চকণ্ঠ। সারাদেশে ছড়াচর্চা নিয়মিতভাবে চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ছড়া নিয়ে উৎকৃষ্টমানের কোনো গবেষণা হয়নি। ছড়াকারদের পরিচিতিমূলক কোনো প্রামাণ্যগ্রন্থ নেই। ছড়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণসম্বন্ধ নিয়ে প্রয়োজন আছে ব্যাপক গবেষণার।

আজ আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি যে, ছড়া এখন বহুচর্চিত মাধ্যম। আমাদের আধুনিক ছড়া এখন স্বাধীনতার সমান বয়সি। ছড়া এখন বহু বিস্তৃত বিষয়কে ধারণ করতে পারে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে।

গণমানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গীত হয়ে থাকে ছড়া। রাজনৈতিক হতাশার দিকে তির্যক চোখে তাকায় আমাদের ছড়া। রাজনৈতিক ভণ্ড নেতাদের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়ায় আমাদের ছড়া। রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে আমাদের ছড়া। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের পক্ষে আমাদের ছড়া। সামাজিক অসঙ্গতি, অনাচার, মিথ্যাচার, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের ছড়া। আমাদের ছড়া শক্তিমত্তায়, সৌকর্যে, প্রকরণে অনেক বেশি সাহসী।

আমাদের ছড়া তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অসহিষ্ণু উপেক্ষার বিরুদ্ধে। অথর্ব সাহিত্য সমালোচকদের বিরুদ্ধে। আমাদের ছড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতাকে মান্য করে না।

ছড়ার সাফল্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ছড়া। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হতে পারে– কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছড়ায় সেই বিকৃতি নেই। ছড়ার এই সত্য-ইতিহাস উচ্চারণের অকুণ্ঠ শক্তিকে আবিষ্কার করার মধ্যেই সার্থক হবে আগামী দিনের ছড়া রচনা। সারাদেশে ছড়া নিয়ে অনেক ধরনের কাজ হচ্ছে। ছড়াকে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড় সংগঠনের জন্ম হয়েছে। ছড়ার সুমুদ্রিত গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে বহু বর্ণিলভাবে। এসবই ছড়ার জয়যাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। ছড়াকাররাও আজ সমাজে অনেক বড় আসনে অধিষ্ঠিত। অনাদর উপেক্ষা করে ছড়া তার নিজস্ব শক্তিতে সাহিত্যে আপন স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে। ছড়া শুধু ছোটদের নয়, সকলের। এ কথার অনিবার্য প্রমাণ পাওয়া যাবে ছড়া-রচনার ব্যাপকতায়। সর্বমহলে ছড়ার গ্রহণযোগ্যতায়।

বাংলাদেশের ছড়ার অগ্রগামী মিছিলে আমরা প্রত্যেকেই সক্রিয় অংশ নিয়েছি। নতুন প্রজন্মের হাতে ছড়া আরও আলোকিত হবে- বিস্তৃত হবে। ছড়ার আলো ছড়িয়ে পড়বে সবখানে।

তিন.

ছড়া কি শুধুই হাস্য-পরিহাস?

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' কিংবা সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বা 'খাই খাই'-এর মজারু-পথ বেয়ে ছড়া আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত বইগুলো হাস্যরস ধারার ছড়ার রসে পরিপূর্ণ। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সুকুমার রায়কে হাসির কবিতা রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ছড়াকার হিসেবে সুকুমার রায়কে মানতে রাজি নন– তার তীক্ষ্ণ যুক্তি অনুযায়ী সুকুমার রায় কবি এবং ব্যাপক অর্থে তার কবিতা কাব্যরসসমৃদ্ধ, কবিতার শর্ত পালন করেছে যথাযথভাবে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে– সুকুমার রায়ের কবিতা ফ্যান্টাসি-নির্ভর। হাস্যরস-নির্ভর। শব্দ ও বাক্যবন্ধে কৌতুকপ্রবণতা আছে। আর ছন্দ সহজ-সরল– স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে দোলায়িত। লোকছন্দের মধুরতাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। বিষয়-ভাবনা কেবলই স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায় আকণ্ঠ মগ্ন।

হাসির কবিতা রচনার এই ধারাটিকে লঘুচালের পদ্য হিসেবে সমালোচকেরা বিবেচনা করেছেন। আরও লঘুভাবে বলতে গেলে– পরবর্তীকালে 'ছড়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলা ছড়ার অনেক ট্রাজেডির মতো এটাও একটা বড় ট্রাজেডি। হাসির কবিতার লাইনে আমাদের ছড়া চলা শুরু করল। তাতে ছড়া কতটা সফল হল কিংবা চারিত্র্যগুণ অক্ষুণ্ন রাখল সে আলোচনা অনেক বিস্তৃত। তবে বাংলা ছড়া (বিশদভাবে পদ্য বা কবিতা) প্রাণ পেল হাস্যরসের ধারায়– এই সত্য অনিবার্য। সুনির্মল বসু, কাজী নজরুল ইসলামের হাত ধরে সুকুমার বড়ুয়া থেকে লুৎফর রহমান রিটন পর্যন্ত সেই হাস্যরস ধারার প্রাবল্য দেখতে পাই। এঁদের সকলের ছড়াই চরিত্র বিচারে প্রায় সমধর্মী। বিষয়-ভাবনায় পার্থক্য থাকলেও, যুগ ধর্মের কারণে সুস্পষ্ট ভিন্নতা থাকলেও ছড়ার সুর ও রচনা-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। এই জনপ্রিয় ও হাস্যরস ধারার মধ্যে গত একশো বছর ধরে বাংলা ছড়া আবর্তিত হচ্ছে। ব্যঙ্গ, কৌতুক, পরিহাস, উপহাস, কশাঘাত– ফ্যান্টাসির মাধ্যমে, ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে ছড়া অনর্গল রচিত হচ্ছে। সব যে সফল ছড়া এমনটা বলা যাবে না। হামেশাই তা রূপান্তরিত হয় হাসির পদ্য বা কবিতায়। আমরা ছড়াকে সরলীকরণ করি। তাই ভেদরেখা টানি না। ছড়া যেহেতু শিল্প-মাধ্যম, সাহিত্যমাধ্যম– তাই এর গড়পরতা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টাও একধরনের বাতুলতা। তবে হাস্যরসই কি ছড়ার মূল গন্তব্য? হাস্যরসের মাধ্যমেই কি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার রূপায়ণ হবে ছড়ায়? তাই কি এখন ছড়া সহজ ও চটুল ও স্থূল হয়ে উঠেছে? কার্টুনের পাশে স্থান পাচ্ছে ছড়া। মিল দিয়ে কয়েকটা লাইন লিখলেই ছড়া হয়ে যাচ্ছে এই সব? ব্যঙ্গাত্মক এইসব ছড়া জীবনবিচ্ছিন্ন নয়? উপহাসই কি ছড়ার প্রাণ? এই সরল পথে যাত্রা শুরু করে ছড়া কি সফল হয়েছে?

কিন্তু বাংলা লোকছড়ার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পথ বেয়ে ছড়া আধুনিক যুগে বেশি চর্চিত হয়নি। একমাত্র অন্নদাশংকর রায় সেই ঐতিহ্যধারায় সফল ও সার্থক ছড়া-রচয়িতা। বাংলা লোকছড়ার সব রকম বৈশিষ্ট্যের চিহ্নকে ধারণ করে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছড়া লিখেছেন। তাঁর ছড়া বুদ্ধিবৃত্তিক সরলতায় আচ্ছন্ন। সে কারণে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া দিয়ে সহজে প্রভাবিত হয়ে ছড়া রচনা করা সহজ কাজ নয়। কঠিন বিষয়কে নিয়ে শিশুহৃদয়ের মধুরতায় শব্দ-ধ্বনি ও বাক্যে তিনি সজীব ও প্রাণবন্ত ছড়া লিখেছেন। তিনি বলেছেন– ছড়া হচ্ছে অশিক্ষিতের পটুত্ব। ছড়ায় কাঠিন্য ও বুদ্ধি বেশি থাকলে তা পদ্য হয়ে ওঠে। 'ছড়া' আখ্যা দিতে মন সায় দেয় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় আজীবন সৎ ও চরিত্রানুগ ছড়া লিখতে চেয়েছেন। লোকছড়ার মণিমাণিক্য উদ্ধার করে ছড়ার মাধ্যমে নিজের ও দেশের জীবনেতিহাস রচনা করেছেন। ছড়া সচল সময়ের স্থির প্রতিকৃতি– অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া সেই শর্তপূরণ করেছে অনায়াসে। কিন্তু বাংলা ছড়া অন্নদাশঙ্কর রায়ের মনোজগৎ দিয়ে কেন সম্মুখবর্তী হল না এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। অন্নদাশঙ্কর রায় সেই যশস্বী ও মননশীল ছড়া-লেখক যিনি লোকমুখের ছড়াকে আধুনিক রক্তমাংসে, প্রাণস্পর্শে জীবন দান করেছেন। ছড়া-লেখকদের মধ্যে সত্যি তিনি বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলাদেশের চিরকালীন লোকছড়ার সুর ও ধ্বনিমাধুর্যকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। ছড়া রচনায় তিনি অকারণ পাণ্ডিত্য, কারিকুরি কিংবা কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেননি। একলব্যের মতো নিষ্ঠাবান, এক ও অবিসংবাদিত এই ছড়া-লেখক বাংলা ভাষার মহান ছড়া-রূপকার। বাংলা ছড়া অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে কেন এগিয়ে যায়নি? কেন লোকছড়ার জগৎ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি? শুধু শক্তিমান ছড়াকারের অভাবের কারণেই কি আমাদের ছড়া লোকছড়ার পথ অনুসরণ করেনি?

আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত কবি ও ছড়াকার আল মাহমুদ। বাংলা লোকছড়ার উত্তরাধিকার বহন করে তিনি আশ্চর্য সব ছড়া রচনা করেছেন। রচনার পরিমাণ যৎসামান্য। কিন্তু খাঁটি দেশজ ছড়ার বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ এতটাই তীব্র যে আল মাহমুদ আমাদের প্রধানতম ছড়াকার হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। যদিও আল মাহমুদ মাতৃহৃদয়ের সরলতা নিয়ে ছড়া লিখে থাকেন। তিনিও বিশ্বাস করেন– অশিক্ষিতের পটুত্বই হচ্ছে ছড়া রচনার সফলতা। আল মাহমুদ ছড়াকার ও কবির ভেদরেখা মান্য করেন না। ছড়া– কবিতারই অংশ। সেই অর্থে ছড়াকারও আসলে কবি। কবিতারও নানা ফরম আছে। সেই ফরমের একটি রূপ ছড়া।

আল মাহমুদের পথ ধরেও আমাদের ছড়া বেশি দূর এগোতে পারেনি। অব্যাখ্যাত ও রহস্যময় এর কারণ। লোকছড়া বা খাঁটি দেশজ ছড়া থেকে বিযুক্তির কারণ কী আমাদের? শুধুই মেধাহীনতা? আত্মনিমগ্নতার অভাব? নাকি সস্তা জনপ্রিয়তার দুর্মর লোভ?

বাংলা ছড়া এখন একঘেঁয়ে ক্লিশে। বহুব্যবহৃত এর বিষয়ভাবনা। ছন্দ-বৈচিত্র্যের বড় অভাব। ছড়া এখন বড়ই কাব্যাসংক্রান্ত। কবিদের হাতে ছড়া কবিতাগন্ধী।

নানা বিচিত্র পথে ছড়ার অগ্রযাত্রা। নানা বিষয়কে ছড়া ধারণ করে। কোন অলীক যাত্রাপথে ছড়ার অনির্দিষ্ট গন্তব্য– কোন স্বপ্নযাত্রায় তার গতিপথ তা হয়তো এই মুহূর্তেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বহু বিচিত্রগামী আমাদের ছড়া। গত একশ' বছরে বাংলা ছড়ার নানা গতিপ্রকৃতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে। সরল ও শাদা চোখে সব বৈশিষ্ট্য হয়তো শনাক্ত করা সম্ভবও না।

বাংলা ছড়ার গর্বিত উত্তরাধিকার আমরা। লোকছড়ার বিস্তৃত পরিক্রমায় যদি আমাদের ছড়া নতুন দিনের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলেই হয়তো আমরা খুঁজে পাব আমাদের সঠিক গতিপথ।

অমিত সম্ভাবনা রয়েছে ছড়া মাধ্যমটির। নতুন যুগের নতুন ছড়াকাররা সেই নতুন ভাবধারার ছড়া লিখে পূর্ণতা দান করবেনি।

হাস্যরসই আমাদের ছড়ার একমাত্র চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য– এ কথা মানতে আমার বড় কষ্ট হয়। সৃজনশীল ও নতুন মাত্রার পথ বড় বন্ধুর। বড় কঠিন।

ছড়াকে একঘেঁয়েমির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে– তার দায়িত্ব কে নেবে? বুড়ো মগজে, ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে, ঔপনিবেশিক চেতনায় নতুন ছড়া লেখা সম্ভব নয়।

নতুন ছড়াকারদের হাতেই বাংলা ছড়া মুক্তি পাবে। তবে ছড়া লেখা বিষয়টা সহজ নয়। ভালো ছড়া লিখতে হলে জীবনপাত করা দরকার। আর একটা ছড়া সফল বা চিরন্তন হয় কেন, সেই উত্তরও ব্যাখ্যাতীত। আমরা কেউ জানি না। সার্থক ছড়া কিভাবে রচিত হয় তারও কোনো সহজ পথ নেই।

বহু বিচিত্র পথধারায় আমাদের ছড়া স্বর্ণালী তোরণে জয়ধ্বজা ওড়াবে এই আশাবাদই সার্থক করে তুলবে আমাদের ছড়াসাহিত্যকে।

চার.
ছড়া একমাত্র মৌলিক প্রতিম

বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক মিল বা সাদৃশ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা গদ্য তার আপন ঠিকানা আজও খুঁজে পায়নি– ইংরেজি সাহিত্যের কাছেই তার অপরিসীম ঋণ।

বাংলা গদ্যরীতি দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজি অনুকরণে। ইংরেজি স্টাইলে বাংলা গদ্য সচল হয়েছে। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প– সবকিছুতেই ইংরেজিয়ানার ব্যাপক প্রভাব আছে। এটাই ঔপনিবেশিক প্রভাব। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব। বাংলা কবিতাও এ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ইউরোপীয় ঘরানার প্রত্যক্ষ ছায়া রয়েছে বাংলা আধুনিক

কবিতায়। এমনকি অনেক উৎকৃষ্টমানের কবিতা পাঠের পর মনেই হতে পারে–এ বুঝি অনুবাদ কবিতা।

তবে বাংলা কবিতার যে নিজস্বতা আছে–ত্রিশের আধুনিক কবিরা সে পথে পা দেননি। ইংরেজিশিক্ষিত এই কবিকুল উপনিবেশবাদী সাহিত্যবোধকেই উৎকৃষ্ট ও আধুনিক মনে করেছিলেন। তাই তাদের কাব্যকৃতিতে ইংরেজি প্রভাব সুস্পষ্ট। তারা বাংলা কবিতার নিজস্বতাকে উপহাস করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতাকে তরল ও ফেনায়িত আখ্যা দিয়ে এর কাব্যসুধাকে অস্বীকার করেছেন। স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশিয়ানার প্রতি যারা অনুগত ছিলেন, তারা তাদের কাছে 'গ্রাম্য' আখ্যা পেয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের নাম উল্লেখ করা যায়। সমকালে জসীমউদ্‌দীন চরম উপেক্ষা ও অনাদর পেয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা উপলব্ধি করি যে, জসীমউদ্‌দীন কত বড়মাপের কবি এবং কতটা মৌলিক কবি।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ আধুনিক কবির কবিতা গ্রন্থাগারে সঞ্চিত হয়ে আছে। পাঠক তা ছুঁয়েও দেখে না। কারণ মৌলিক বিষয় চিরদিন মর্যাদা পেয়ে থাকে। ধার-করা বস্তুর মূল্য অত্যন্ত সমকালিক।

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়-আশয় যদি ধার করা হয়েই থাকে মৌলিকত্ব কি কিছু নেই?

আমি সবিনয়ে বলতে চাই, এই বিষয়ে বাংলা ছড়ার কথা। বাংলা ছড়া অত্যন্ত মৌলিক মাধ্যম। এসব লোকছড়ার সঙ্গে ইউরোপীয় ছড়ার কোনো মিল নেই। আধুনিক ছড়াতেও ইউরোপীয় ছড়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না।

ছড়ার এই মৌলিক ক্ষেত্রটি আমাদের গর্ব করার মতো বিষয়। ইংরেজিতে Mother Goose আছে।

কিংবা বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে একে খাপ খাওয়ানো যাবে না। ইংরেজি রূপকথার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা রূপকথার মিল পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে কোনো মিলের সন্ধান করা যায় না।

বাংলার ছড়া একেবারেই বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলার মা-বোনেরা এর নির্মাতা। বাংলার কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থা এর রূপকার। এর রস আস্বাদনকারী বাংলার ছেলেমেয়েরা। এর সঙ্গে ইউরোপীয় ছড়ার মিলমিশ হয়নি। খাপ খায়নি।

তাই বাংলা লোকছড়া কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। একেবারে নিজস্বতায় পূর্ণ হয়ে আছে। আধুনিক ছড়ার গৌরব এখানেই। আধুনিক ছড়াকারেরাও চিরন্তন ঐতিহ্য থেকে সরে আসেন-নি। তারা সেই আবহমান কালের ধারাবাহিকতায় এখনো ছড়া রচনা করে যাচ্ছেন। ছড়া বিদেশি সাহিত্য দ্বারা দ্রবীভূত হয়নি। চরিত্রহানি হয়নি তাই ছড়ার। ছড়া চিরকালই স্বয়ম্ভু, একক, মৌলিক।

একমাত্র বাংলা সাহিত্যে ছড়াকেই সঙ্কর ধাতুতে রূপান্তর করা যায়নি। ছড়ার মধ্যে ঔপনিবেশিকতা নেই। ছড়া পরভৃতের মতো নয়।

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আর বাঙালি জীবন-আচরণ ছড়ার প্রাণশক্তি। বাংলা ছড়া তাই আদি ও অকৃত্রিম। মৌলিক ছড়ার মৃত্যু নেই।

পাঁচ.

ছড়া-ভাবনা

সত্যি দুঃখ হয়– যখন দেখি আমাদের ছড়ার কোনো সৎ ও গঠনমূলক মূল্যায়ন হয়নি। আমাদের প্রবন্ধ শাখাটি অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনুর্বর। প্রবীণেরা অল্প সংখ্যক যা প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে পূর্বসূরিদের কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী শিশুসাহিত্যিকরা তাদের রচনায় বড়ই উপেক্ষিত। আতোয়ার রহমান, আলমগীর জলিল কিংবা হায়াৎ মামুদের লেখায় সে উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলাদেশ আমলে কবিতার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে ছড়াচর্চা হয়েছে। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি জনজীবন এবং চলমান সময়ের চালচিত্র ছড়াসমূহের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো গবেষক সেইসব ছড়া নিয়ে দু'চার পঙ্‌ক্তি লিখেননি। কারো লেখায় ছড়ার বৈশিষ্ট্য কী, ছড়ার ভিত্তি কী ছিল, বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য কী ছিল– এইসব নিয়ে সমালোচনামূলক কোনো রচনা আমার চোখে পড়েনি। তাতে আমাদের ছড়া মর্যাদাবান হত। আমরা লক্ষ্য স্থির করতে পারতাম। আমাদের প্রধান প্রাবন্ধিকেরা বড়ই অবজ্ঞা করেছেন ছড়াসাহিত্যকে। কোনো কোনো প্রাবন্ধিক যখন ছড়া বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন তখন এমন সব বিস্মৃতপ্রায় নামের উল্লেখ করেন যে তা হাস্যকর মনে হয়। কিংবা কিছু গৎবাঁধা নামের উদ্ধৃতি দেন– যারা আদৌ কয়টি ছড়া লিখেছেন কিংবা আদৌ তারা ছড়াপ্রেমিক কিনা– সেই নিয়ে সংশয় থাকে।

আর কিছু উৎসাহী ছড়ালেখকরা বিভিন্ন সময়ে ছড়াকারদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। সবিনয়ে বলতে চাই– সে সব কি নতুন চিন্তাধারার আলোকে পরিশ্রুত কোনো প্রবন্ধ?

তারা শুধু নাম উদ্ধৃতি করেছেন। ক্যাটালগ নির্মাণ করেছেন। এই রকম অসংখ্য ক্যাটালগ– নিবন্ধের উল্লেখ করা যায়। যেমন– শাহাবুদ্দীন নাগরী, রাশেদ রউফ কিংবা খালেদ হোসাইনের প্রবন্ধ শিরোনামে ক্যাটালগ রচনা। এইসব রচনায় ঝাঁকের কইয়ের মতো কিছু নাম লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু কবে তারা নিজেরাই শেষ ছড়া লিখেছিলেন তা বলতে পারেন না। এরকম কিছু মৃতপ্রায় ছড়াকারদের নাম প্রায়ই সসম্মানে উদ্ধৃত হতে দেখি। কিন্তু দুঃখ হয়– সত্যিই বাংলাদেশের ছড়ায় কোনো শক্তি নেই! এতটাই অক্ষম আমাদের ছড়া যে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মতো নাম খুঁজে বের করে উদ্ধৃতি দিতে হয়! প্রশ্ন জাগে– কে লালচান? রশিদ সিনহা কবে ছড়া লিখতেন? নিয়ামত হোসেন বা আখতার হুসেন শেষ ছড়াটি কবে লিখেছিলেন? এখলাসউদ্দিন আহমদ তার

পুরনো ছড়া নানা নামে ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবেন? আবু সালেহের ছোটদের ছড়া কি আদৌ ছড়া হিসেবে স্বীকৃত?

এমনতরো বহু প্রশ্ন জাগে আমাদের ছড়া নিয়ে। তাহলে আমাদের ছড়া সঠিক মূল্যায়ন পাবে কিভাবে? কিভাবে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সুশীল সমাজের? কবে আমাদের দেশের প্রকৃত ছড়াগুলোর মূল্যায়ন হবে? আমি এমনও ছড়াকারদের চিনি যারা নিজেদের ছড়াকার ভাবতে কুণ্ঠিত বোধ করেন– কিন্তু ক্যাটালগ রচনাকারীরা তাদের নাম লিখতে লিখতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে আখতার হুসেনের নাম উল্লেখ করা যায়।

আর একটি বিষয়– আমাদের কিছু কিছু ছড়াকার নিজের ঢোল পেটাতে এতটাই ব্যস্ত যে তারা নিজেদের বিষয়ে এক ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ লিখিয়ে থাকেন। যা আদতে সাহিত্যপদবাচ্য নয়। যেমন– ফারুক নওয়াজ কিংবা কবি আসলাম সানীর ব্যাপারে বলা যায়। সামগ্রিক কর্মের ওপর প্রবন্ধ- লেখা হতেই পারে– কিন্তু সেটির মানদণ্ড ঠিক থাকা দরকার। কারণ ছড়াকারদের মধ্যে আশা করব– কেউ কবি আবদুল খালেক মার্কা নেই।

ছড়াকারদের শক্তি ও মর্যাদা অনেক। কিন্তু সেই মর্যাদা আমরাই ভূলুণ্ঠিত করি। ছড়াকারদের প্রকৃত মর্যাদার জন্য লড়াই করার সময় এসেছে। এই বিষয়ে ছড়াকারদেরই আত্মসচেতন হতে হবে।

আ বৃ ত্তি / প্র ব ন্ধ

জাতীয় মানস গঠনে আবৃত্তিশিল্প

....

মা হি দু ল ই স লা ম

আমরা বাঙালি, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আধুনিক বিশ্বে গৌরব বা অহংকার বোধ করার মতো হয়তো আমাদের অনেক কিছু নেই কিন্তু অনেক কিছু না-থাকা সত্ত্বেও

আমাদের আছে মহিমান্বিত মুক্তিযুদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল মহান বিজয়। আমরা বিজয়ী। আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীজমন্ত্র মহান ভাষা আন্দোলন। আর আছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল আমাদের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি। ঐতিহ্যবাহী আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার অনেকখানি জায়গা নিজের করে নিয়েছে এখন আবৃত্তিশিল্পের বিস্তৃত চর্চা। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে, প্রত্যেকটি জেলা শহরে, প্রায় প্রতিটি উপজেলায় এখন আবৃত্তির সাংগঠনিক চর্চা শুরু হয়েছে এবং সকল জায়গাতেই বিশেষ শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতার হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছে আবৃত্তি। প্রতিটি স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি এখন অপরিহার্য অংশ। কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবৃত্তির সংগঠন ও ক্লাব গড়ে উঠেছে এবং নিয়মিত চর্চাও শুরু হয়েছে। আবৃত্তি চর্চার এই বিকাশ ও বিস্তৃত চর্চা আমাদের স্বপ্ন দেখায়, সাহসী করে তোলে।

উন্নয়নশীল এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর প্রজন্ম গড়ে তোলা। আর এই অগ্রসরতায় শিল্পচর্চার বিস্তৃতির বিকল্প নেই। সৎ আদর্শবান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, পরিশ্রমী, সৃজনশীল আর আলোকিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে দেশব্যাপী আবৃত্তি চর্চা আমাদের চোখে সেই স্বপ্ন এঁকে দেয়। আবৃত্তিশিল্প নির্মাণে প্রধান অবলম্বন কবিতা। আর কবিতায় বিধৃত মানুষের সমাজের রাষ্ট্রের আশা ও দুরাশা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্নাহত যন্ত্রণার অকৃত্রিম চিত্র। কবিতায় থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের চালচিত্র। কবিতায় থাকে দেশ-প্রেম, মূল্যবোধ চর্চার অশেষ রস ও রসায়ন। একজন শিশু-কিশোর আবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এই কবিতা হৃদয়ে-মননে লালন করতে করতে হয়ে ওঠে মূল্যবোধসম্পন্ন খাঁটি দেশপ্রেমিক আলোকিত মানুষ। জাতীয় মানস গঠনে আবৃত্তি চর্চা এভাবেই নিভৃতে কাজ করে চলে সবার হৃদয়ে। ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, অগ্রসরমানতার পক্ষে, জীবনের পক্ষে দাঁড়াতে আমাদের সাহসী করে আবৃত্তি চর্চা। আমাদের মাতৃভাষার অধিকার আদায় করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে দেশমাতৃকাকে হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে মুক্ত করে আমাদের স্বাধীনতার সৌরভ পেতে যারা আত্মোৎসর্গ করে গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আর মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয় আবৃত্তি চর্চা। নবীন একজন আবৃত্তিশিল্পীর প্রস্তুতিপর্বে অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করার পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্বে শিখে নিতে হয় প্রমিত বাংলা উচ্চারণ। আবৃত্তির সাংগঠনিক চর্চার অপরিমেয় সুফল নিহিত রয়েছে এখানে। যে জাতির ছাত্রসমাজ অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করল সে জাতির জন্য শুদ্ধ ভাষার চর্চা শুধু নান্দনিক চর্চামাত্র নয়– সে তার নৈতিক দায়। বাংলার ঘরে ঘরে এই প্রমিত বাংলা চর্চার সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে আবৃত্তি চর্চা। এ তথ্য বিস্ময়কর যে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর নব্বই শতাংশ মানুষ অশুদ্ধ ও বিকৃত বাংলায় কথা বলে। নামি ও দামী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেও আমরা প্রমিত বাংলা ভাষায়

কথা বলতে পারি না। অপ্রিয় সত্য হল শিক্ষকদেরও এই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে অক্ষমতা আমাদের অসচেতনতা এবং বক্তিত্বের দুর্বলতাই প্রকাশ করে মাত্র। দেশজুড়ে আবৃত্তি চর্চা আমাদের এই ক্ষেত্রে সচেতন করছে, উৎসাহিত করছে এবং প্রেরণা যোগাচ্ছে।

কবিতা এবং কবিতার আবৃত্তি আমাদের হৃদয়-মনকে মানবতার প্রেমে, মানবতার মুক্তি ও জয়গানে উদ্বুদ্ধ করে। কবিতাই বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি আমাদের হৃদয়কে আনত করে, সমর্পিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ আমাদের সবার হৃদয়কে নির্মল আর উজ্জ্বলতর করে তোলে। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমেই সহজেই মানবহৃদয় বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে লীন হয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে আত্ম-আবিষ্কারের পথের সন্ধান পেতে পারে। কবিতার রহস্যময়তার আবরণে লুকিয়ে থাকা সকল দর্শন, নান্দনিক বোধ, সত্য ভাষণ– এর প্রতিনিয়ত চর্চায় প্রত্যেক আবৃত্তিশিল্পীর হৃদয় হয়ে ওঠে একেকটি নান্দনিক প্রতিফলক। যুগে যুগে বাঙালি জাতির দুঃসময়ে কবিতা এবং আবৃত্তি বাংলা মায়ের সন্তানদের সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছে। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গণসঙ্গীতের পাশাপাশি আবৃত্তি উপস্থাপনা রণক্ষেত্রে মুক্তিসেনাদের রক্তে উন্মাদনা যুগিয়েছে, তাদের প্রতিজ্ঞা শাণিত ও দৃঢ়তর করেছে। ৯০-এ জাতির বুক চেপে ধরা সামরিক শাসকদের উৎখাত করতে আবৃত্তিশিল্পীদের দৃঢ়তা ও বিপ্লবী আবৃত্তি ঘরের মানুষকে রাজপথে টেনে এনেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজনীতিক আর গণমানুষকে এক বৃন্তে সংযুক্ত করে দিয়েছে রাজপথের আবৃত্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের অন্তরে পৌঁছে দিচ্ছে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবৃত্তি চর্চা। পরাজিত শক্তির আস্ফালন, তাদের তীক্ষ্ণ নখর থেকে প্রজন্মকে সচেতন করতে, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তা রোধ করতে নতুন প্রজন্মকে সচেতন আর সাহসী করে তুলছে আবৃত্তি চর্চা। জাতির স্বাধীনতাযুদ্ধের যে স্বপ্ন– স্বাধীন দেশে সেই স্বপ্নের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, সঙ্কট আর তা থেকে উত্তরণের আহ্বান সবার হৃদয়ে পৌঁছে দেয় আবৃত্তি। স্বাধীন দেশেও কীভাবে মৌলবাদী ধর্ম-ব্যবসায়ী দ্বারা আমাদের নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়ছে, ছদ্মবেশী বর্ণচোরা শোষকের হাতে, অসাধু-অসৎ ব্যবসায়ীর হাতে কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত, নিষ্পেষিত, আর প্রতারিত হচ্ছে সমাজসচেতন ও সামাজিক সঙ্কট-বিষয়– কবিতার আবৃত্তি সেই অপ্রিয় বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদের সচেতন করছে প্রতিনিয়ত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার, বিভিন্ন মানসিকতার অনেক মানুষ নিয়ে একটি আবৃত্তি সংগঠন পরিচালিত হয়। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যকে এই পরিবেশে মানিয়ে চলতে চলতে তার আত্মার ও মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচর্চায় তার পারিবারিক আবহের একটা স্পষ্ট প্রভাব থেকে যায়, যা হয়তো সবসময় তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে যথেস্ট সহায়তা করে না। আবৃত্তি চর্চা করতে এসে সংগঠনের সাথে নিজেকে সমন্বয় করতে সচেষ্ট হলে প্রত্যেকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একজন আদর্শ, সামাজিক ও আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। সংগঠনের প্রয়োজনে, সতীর্থের প্রয়োজনে ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভালোবাসার মতো মহৎ গুণাবলির চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে প্রত্যেক সদস্য আত্মার উৎকর্ষের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পায় আবৃত্তি চর্চার বৃহত্তর পরিসরে এসে। নিজের পরিবারের মতো সংগঠনও একটা বর্ধিত পরিবার। এই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলতে চলতে যে কোনো বৃহত্তম পরিবেশে মানানসই ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে প্রত্যেক আবৃত্তিকর্মী। সংগঠনে অগ্রজের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মেনে চলতে চলতে, নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে করতে অভ্যস্ত হয়ে কাজ করবার মানসিকতা তৈরি হয়– পরবর্তীতে তার স্পষ্ট আর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে। পেশাগত জীবনে সহজেই একজন আবৃত্তিকর্মী সহকর্মীদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে শোষণ আর বঞ্চনার প্রলম্বিত প্রচ্ছদপট কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি। যুগের পরিবর্তনে নবতর শোষণ ও নিষ্পেষণের শিকার হয় সাধারণ মানুষ। সংস্কৃতিচর্চা-রহিত কিছু মানুষের সরল চোখে এসব শোষণ ও বঞ্চনা দৃষ্টিগোচর হয় না। তারা কেবল নিজের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যস্ত আর তাতেই পরিতৃপ্ত। মানুষের জীবন তো এ রকম দেবদারু গাছের মতো হতে পারে না। সমাজের অবহেলিত, নিষ্পেষিত, শোষিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বার্থে শক্ত ভূমিকা রাখতে হবে সমাজের স্বচ্ছল মানুষের। আবৃত্তিশিল্পের বিকাশ সাধারণ্যে এই মূল্যবোধ বিস্তারে অপরিমেয় ভূমিকা রেখে চলেছে। মানুষকে ভালোবেসে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে আত্মত্যাগ করবার শিক্ষা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরির শিক্ষা দেয় আমাদের আবৃত্তি চর্চা। অপরের অধিকার হরণ করে, অপর মানুষকে দলিত -মথিত করে একা সামনে যাওয়ার অপকৌশল পরিহার করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা আমরা আবৃত্তি চর্চা থেকে লাভ করতে পারি। সত্য ও সুন্দরের নিয়ত চর্চায় বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সাথে আত্মার সংমিশ্রণে, বিশ্বমানবতার জয়গানে সম্পৃক্ত থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব-স্রষ্টার অপার শক্তির সন্ধানলাভে একজন আবৃত্তিশিল্পীর হৃদয়-মন ও সার্বিক কর্মপ্রয়াস হয়ে উঠবে অন্য মানুষের জন্য শিক্ষণীয়, অনুসরণযোগ্য আর আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমাদের প্রাণপ্রিয় এই বাংলাদেশের আবৃত্তিশিল্পের বিকাশ এবং জয়জয়কার অবশ্যম্ভাবী।

শেষ পর্যন্ত লেখাই আমার প্রিয়তম বিষয়: রশীদ করীম

....

ব্রা ত্য রা ই সু

[রশীদ করীম-এর জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯২৫, কোলকাতায়। মা:...... বাবা: আবদুল করীম। একাডেমিক শিক্ষা: স্নাতক, ইসলামিয়া কলেজ, কোলকাতা। কর্মজীবন: জেনারেল ম্যানেজার, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড; পরে অবসর গ্রহণ। ঢাকার স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ি: ১৭/১, সড়ক: ৬, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫। প্রকাশিত বই: উপন্যাস: উত্তম পুরুষ ১৯৬১, প্রসন্ন পাষাণ ১৯৬৩, আমার যত গ্লানি ১৯৭৩, প্রেম একটি লাল গোলাপ ১৯৭৮, সাধারণ লোকের কাহিনী ১৯৮২, একালের রূপকথা ১৯৮০, সোনার পাথর বাটি, বড়ই নিঃসঙ্গ, মায়ের কাছে যাচ্ছি, চিনি না, পদতলে রপ্ত, লাঙ্গবক্স; গল্প: প্রথম প্রেম, ; প্রবন্ধ: আর এক দৃষ্টিকোণ, অতীত হয় নূতন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি; ইত্যাদি। উল্লেখ্য নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন নব্বই দশকের উল্লেখযোগ্য কবি, সম্পাদক ব্রাত্য রাইসু। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার ৭ অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে 'রশীদ করীম সংখ্যা'য় এটি প্রথম প্রকাশ হয়। যা পরবর্তী সময়ে কবি হামিদ কায়সার ও কবি পিয়াস মজিদ সংকলিত 'তরুণ আলোয় রশীদ করীম; নির্বাচিত সাক্ষাৎকার' গ্রন্থে প্রকাশ পায়। এই নিভৃতচারী স্বপ্নচারী মানুষটির মৃত্যু তার পাঠকশ্রেণীর মধ্যে বেশ নাড়া দিয়েছে; পাঠকের হৃদয়ে তার উপস্থিতি ঘটবে নিশ্চয়ই তার সৃষ্টির মধ্যদিয়ে।]

ব্রাত্য রাইসু
রেকর্ডারে সাক্ষাৎকার দিতে আপনার আপত্তি কেন?

রশীদ করীম
এইজন্য যে, আমি আমার অসুখের কারণে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলি। এছাড়া রেকর্ডারে তোমাকে বহুবার ভুল সংশোধন করতে হত।

ব্রাত্য রাইসু
আপনি লেখালেখি করেন না কত দিন?

রশীদ করীম

প্রায় দু'বছর। যখন থেকে আমি স্ট্রোকের শিকার হয়েছি। তার আগে দু'তিন কাগজে সাপ্তাহিক কলাম লিখতাম। খুব মন্দ হত না কিন্তু কলামগুলো।

ব্রাত্য রাইসু

লিখতে পারছেন না যে, আপনার অনুভূতি কী এতে?

রশীদ করীম

এতে অনুভূতি এই যে, আমি সম্পূর্ণ নিষ্ফল মানুষ। আমি একথা বলব না যে, শুধু লেখার জন্যই বেঁচে ছিলাম। কারণ নিসর্গ আছে, মানুষের ভালোবাসা আছে– ইত্যাদির মূল্য অনেক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখাই আমার প্রিয়তম বিষয় ছিল।

ব্রাত্য রাইসু

শারীরিক অসুস্থতার পরেও তো অনেকে লেখালিখি করেন। আপনি ডান হাতে লিখতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে বাঁ হাত বা অন্য কারো সাহায্যে তো লেখালেখি চালিয়ে যেতে পারতেন। আপনি কী মনে করেন?

রশীদ করীম

আমার বন্ধু শামসুর রাহমান এবং সৈয়দ আলী কবীর প্রায়ই আমাকে বলেন, শারীরিক অক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে আবার লিখতে। তাঁরা মনে করেন যে, শরীরটা শুধু অবশ হয়েছে কিন্তু চেতনা আমার সঠিক ও সজাগ আছে। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, সকালবেলার পরেই আমি একেবারে অথর্ব হয়ে যাই। সকালবেলা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় হয়তো মোটামুটি ঠিকই বলি। কিন্তু সাহিত্য রচনা করবার জন্য চিন্তার যে সংলগ্নতা আবশ্যক তা দু'চার মিনিটের বেশি আমি রক্ষা করতে পারি না। শুধু সাহিত্য কেন, সব বিষয়েই এ রকম হয়।

ব্রাত্য রাইসু

আপনি তো বেশ অনেকক্ষণ উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এতে তো কোনো অসংলগ্নতা দেখছি না?

রশীদ করীম

কোনো কোনো দিন আমার মাথা বেশ স্বচ্ছভাবে কাজ করে। তা-ও কিছুক্ষণের জন্য। তোমাদের প্রশ্নগুলো এতই সুপরিচিত যে উত্তর দিতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু

এই চিন্তা যদি আমাকে সংলগ্নভাবে করতে হত তাহলে আমি ব্যর্থ হতাম। আমি আমার স্ত্রীর নাম ভুলে যাই; কন্যার নাম ভুলে যাই, মনের মধ্যে অনেক কথা আকুলি-বিকুলি করে প্রকাশের জন্য, কিন্তু চুপ করে থাকি। কারণ কী ভাষায় তা প্রকাশ করব সেটাই মনে থাকে না। আমার শরীর নিয়ে তো যথেস্ট হল, আর কী?

ব্রাত্য রাইসু

বইপত্র পড়েন?

রশীদ করীম

খবরের কাগজ আমি পড়ি না। খুব ইম্পর্টেন্ট খবরের প্রতি আমার স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই খবরের হেডিং এবং কিছু অংশ কোনোমতে পড়ে নিই। স্ট্রোকের পর গোড়ার দিকে আমি বহু কষ্ট করে হলেও কতকগুলো উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। এখনও শামসুর রাহমানের কলাম আমি পড়ে ফেলি; তারপর সারাদিন চোখের ব্যথায় ভুগি।

ব্রাত্য রাইসু

সাহিত্যকে আপনি এখন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করছেন?

রশীদ করীম

জেনারেশন গ্যাপ বলে একটা জিনিস আছে। বর্তমান জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা সাহিত্যকে যেভাবে দেখে অথবা হয়তো সাহিত্যের কেয়ারই করে না। আমাদের বেলায় তা ছিল না। আমরা যেসব সাহিত্যিককে বড় মনে করেছিলাম বর্তমান ছেলেমেয়েরা তা করে কিনা ভেবে দেখতে হয়। এমনকি বয়স্ক কবি-সাহিত্যিকরা ভেবে দেখতে পারেন যে, তাঁদের বাণী বর্তমান প্রজন্মের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কি না কিংবা আদৌ পৌঁছাচ্ছে কি না। কিংবা তাঁদের বাণী কি তার যথার্থতা এখন হারিয়ে ফেলেছে? আমি সত্তর স্পর্শ করতে চলেছি। সেই পুরনো যুগের লোক। আমার মন তো বাঁধা আছে সেই পুরাতন মূল্যবোধে।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার প্রিয় লেখাগুলো সম্পর্কে যে ধারণা আপনার ছিল যখন আপনি সক্রিয় লেখক-পাঠক এখন তার কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে কি? ঘটলে কী রকম? সেই পরিবর্তনটা আপনি কীভাবে নিচ্ছেন?

রশীদ করীম

আমার প্রিয় লেখকরা তাঁদের সময়কার মূল্যবোধ অবলম্বন করে গল্প-উপন্যাস লিখতেন। আমিও সেই সময়কার লোক। এখন ছেলেমেয়েরা বদলে গেছে, এমনকি সমাজও বদলে গেছে। সুতরাং তখনকার সৃষ্ট সাহিত্যের যে আবেদন আমার কাছে ছিল তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে নেই, আমি অলসভাবে চিন্তা করি, আমরা ঠিক নাকি তারা ঠিক। জেনারেশন গ্যাপ বস্তুটি আজকাল যে রকম দ্রুত হচ্ছে আমাদের আমলে হত না। তার প্রধান কারণ টেলিভিশন ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতাপ।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার মনে কি নতুন কোনো উপন্যাসের বীজ আছে? যা খুব চেষ্টা করলে আপনি লিখে ফেলতে পারেন?

রশীদ করীম

সঠিক অর্থে বীজও নেই এবং পরিকল্পনাও নেই। তবে সেই দৃশ্যগুলো ভাসমান হয়ে আসে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তা পলাতক হয়। তবে সেই দৃশ্যগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে অনেকগুলো আসে। সেগুলো আমার পূর্বের উপন্যাসের মতো নয়। সেগুলো অনেক বেশি বর্তমানকালের রিয়ালিজম আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু স্বল্পকালীন তাদের মেয়াদ বলে তা লেখায় চিরস্থায়ী হতে পারে না।

ব্রাত্য রাইসু

'প্রসন্ন পাষাণ' উপন্যাসটি একজন মহিলার জবানিতে লেখা। মহিলার জবানিতে লিখতে গিয়ে পুরুষ হিসেবে কী সমস্যায় আপনি পড়েছেন?

রশীদ করীম

আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একটি মেয়ে হিসেবে কল্পনা করেছিলাম। সুতরাং সমস্যা তেমন দেখিনি এবং কল্পনা করা যাক যে, মেয়েটি লেখকের কাছে খুবই পরিচিত। সুতরাং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লেখকের খুব জানা। এইজন্য আরো নিজেকে মেয়ে হিসেবে কল্পনা করা সহজ হয়েছে। তবে সত্যি কথাটা হয়েছে তা তো বিচার করবে পাঠকরা। বিশেষ করে পাঠিকারা।

ব্রাত্য রাইসু

নারী বিষয়ে প্রশ্ন করি। মেয়েদের প্রতি আপনার অনুরাগ কোন বয়সে প্রথম শুরু হয়?

রশীদ করীম

কোনো কোনো মেয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালোবাসা জন্মে আমার অজ্ঞাতসারে। সেই শৈশবস্থা হতে। আমি শৈশবে তিনজন মেয়েকে ভালোবাসি এবং বয়স হলে একটি মেয়েকে। এদের কারো সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়নি। এদের মধ্যে দু'জন মৃতা। বাকি দু'জন সেই বয়স থেকে আরম্ভ করে আজকে এত বদলে গেছেন যে, তাদের আমি ভালোবাসি বলতে পারি না। তারা সেই বয়সে যেমন ছিলেন, বিবাহিত জীবনে ঠিক সেভাবে ডেভেলপ করেননি। তবে আমি একটি কথা চিন্তা করেছি একসঙ্গে কি চারটি মেয়েকে ভালোবাসা যায়? উত্তর পেয়েছি যে হ্যাঁ, যায়। কোনো- একটি মেয়ের মধ্যে বা দুটি মেয়ের মধ্যে জীবনের সব গুণ থাকে না। বহু গুণ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। একেকজন সেই গুণের কিছু অংশ ধারণ করে থাকেন।

ব্রাত্য রাইসু

এখন কোনো নারীর প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করেন?

রশীদ করীম

এখন আমি কোনো নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করি না। শুধু আমার স্ত্রী ছাড়া। তার মানে এই নয় যে, আমাদের তুমুল ঝগড়াঝাটি হয় না।

ব্রাত্য রাইসু

পরকীয়া প্রেমকে আপনি কীভাবে দেখেন?

রশীদ করীম

আমরা একটা সমাজে বাস করি। অঙ্গীকার করে একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিত সমাজের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করা। তবে মানুষ অনেক সময় নিরুপায় হয়ে যায়। এসব বিষয়ে সংযত হওয়া ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা উচিত। হালকাভাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে পরকীয়া প্রেম আমি সমর্থন করি না। আর যদি পরকীয়া প্রেম করবই তো বিবাহের শৃঙ্খলার অর্থ কী? অনন্যোপায় হয়ে হয়তো একজন নারী বা একজন পুরুষ তার বর্তমান স্বামী বা স্ত্রীকে অনুমোদন করছে না; তখন তাদের অন্য পথ দেখতে হয়।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার যে অসুস্থতা এটি কি কোনোভাবে আপনার জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করছে?

রশীদ করীম

সুস্থ মানুষ আসলে অসুস্থ মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসা করতে পারে না। হয়তো সুস্থ মানুষের ভালোবাসা অসুস্থের জন্য অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা আগের মতো সঙ্গ দেন না। এরজন্য তাদের দোষ দেয়া যায় না একেবারে। তাদের জন্য আছে মুক্ত নিসর্গ, ভালোবাসার বিশাল ক্ষেত্র, জীবন উপভোগ করবার বহু রাস্তা। তারা তাহলে এসব বাদ দিয়ে কেন অসুস্থতার সঙ্গে বসবাস করবে? তবে তাদের ভালোবাসা অটুট থাকে।

ব্রাত্য রাইসু

এই উপলব্ধি কি আপনার মধ্যে কোনো অভিমান তৈরি করে?

রশীদ করীম

না, বিন্দুমাত্র না। জীবন এ রকমই হয়। আমি নিজে হলেও এ রকম ব্যবহারই করতাম। তাদের যেমন আমার প্রতি ভালোবাসা অকৃত্রিম, আমারও সেই রকম।

ব্রাত্য রাইসু

আমাদের লেখকসমাজ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

রশীদ করীম

তোমরা আমার বিষয়ে সংখ্যা প্রকাশ করছ। এ কারণে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ঢের আগে শামসুর রাহমানের বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। এই মাসের ২৩ তারিখে তাঁর জন্মদিন। তাঁর জন্য কিছু করো না। তোমরা আরেকটা মস্ত ভুল করো। বর্ষীয়ান লেখকদের তোমরা ভুলে যাও। আবু রুশ্‌দ, শওকত ওসমান, আবুল হোসেন এঁদের বিশেষ সংখ্যা বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া সৈয়দ আলী আহসানকে ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু আমাদের মুশকিল এই যে রাজনীতি আমাদের ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। তুমি সাধারণভাবে লেখকদের কথা জিজ্ঞেস করেছ। সৈয়দ শামসুল হক আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এছাড়া আছেন আল মাহমুদ। আছেন শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা প্রমুখ। গল্পলেখকদের মধ্যে সরদার জয়েনউদ্‌দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান আজিজুল হক, হাসনাত আবদুল হাই, মাহমুদুল হক, শওকত আলী প্রমুখ। আমি মনে করি যে, এই মুহূর্তে যাঁরা গল্প লিখছেন তাঁদের মধ্যে হাসনাত আবদুল হাই শ্রেষ্ঠ। আমি এলোপাথাড়ি কতকগুলো নাম বলে গেলাম। হয়তো বহু নাম বাদ পড়ে গেল।

ব্রাত্য রাইসু

ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলেননি।

রশীদ করীম

আবু রুশ্‌দ ও শওকত ওসমান উপন্যাসও লিখেছেন। তা ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সম্পর্কেও বলা উচিত।

ব্রাত্য রাইসু

আমাদের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ, তাঁর লেখা পড়েছেন?

রশীদ করীম

হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ছিলেন। এখনও তাঁর পথ-পরিবর্তনের সময় আছে। কিন্তু তিনি অজস্র ধারায় এত বেশি লিখছেন যে উপন্যাসগুলোর প্রশংসা করা কঠিন। তা ছাড়া আছেন রাহাত খান, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের, মঞ্জু সরকার এবং কায়েস আহমেদের প্রশংসা শুনেছি শামসুর রাহমানের কাছে, কিন্তু আমি তাঁর লেখা পড়িনি। তা ছাড়া রাজিয়া খান, শাম্‌স রশীদ, রাবেয়া খাতুন, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন এঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

ব্রাত্য রাইসু

তসলিমা নাসরিনের অবদান সম্পর্কে বলুন।

রশীদ করীম

তাসলিমা নাসরিন কবিতা ও কলাম বেশ ভালো লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কলামে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে আমি সবসময় একমত হতে পারি না। কিন্তু দ্বিমত হলেই কি লেখার প্রশংসা করা যাবে না? তাঁর উপন্যাস আমার তেমন ভালো লাগেনি।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলুন।

রশীদ করীম

আমার স্ত্রী সালিমা মুরশেদের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু ব্যক্তি আমি দ্বিতীয়জন দেখিনি। তাঁর ওপর আমি অনেক অত্যাচার করি। তিনি হয়তো সাময়িক রাগ করেন, যেমন আমার নিজের রাগটিও সাময়িক। তার এখন কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে,

কিন্তু এককালে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন। যে কারণে আমার প্রাকবিবাহ প্রেম-অভিজ্ঞতাগুলো ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। যখন তিনি প্রসন্ন মেজাজে থাকেন তখন আমার অসহায় অবস্থা দেখে তিনি কাঁদেন। তা ছাড়া আমাদের মেয়ে নাবিলা, নাতনি তিশনা ও জামাতা মুশাহেদের জন্য নীরবে অশ্রুপাত করেন। কারণ তারা দীর্ঘকাল আমেরিকায় বসবাস করছেন। শামসুর রাহমান আমার গত বছরের জন্মদিনে বলেছিল যে আমার স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা বস্তুত বাংলা সাহিত্যকে সেবা করা।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার প্রাকবিবাহ প্রেমগুলো কীভাবে নিয়েছেন আপনার স্ত্রী?

রশীদ করীম

আমার স্ত্রী কখনো আলোচনা করেননি। কিন্তু ও-সবই তো বিগত। সেজন্য চিন্তা করেন না। অবশ্য এখনো রাগান্বিত হলে তিনি বলেন যে, ওদের একজনকে বিয়ে করলেই তো ভালো করতে।

ব্রাত্য রাইসু

আপনার এখন ৬৯ বছর বয়স হয়েছে। এই বয়স কি আপনাকে বিচলিত করে?

রশীদ করীম

সুস্থ থাকলে মৃত্যুচিন্তা আমার কাছে অনভিপ্রেত মনে হত। কিন্তু বর্তমানে আমি উদাসীন।

[উৎস: হামিদ কায়সার ও পিয়াস মজিদ সংকলিত ‘তরুণ আলোয় রশীদ করীম; নির্বাচিত সাক্ষাৎকার’ গ্রন্থ]

নিঃশব্দের কথা

....

কুহেলী ইসলাম

সকলেই নক্ষত্র হতে চায় কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যাঁরা চায় আ-কা-শ হতে। মৃদুলকান্তি তাঁদের একজন।

স্বপ্ন আর সংকল্পকে তিনি ছড়িয়ে দিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে। চোখ মুখে তাঁর অবিরল আনন্দ ভর করত যখন কেউ কিছু জানতে চাইতেন বা শিখতে চাইতেন তাঁর কাছে। মহীরূহ সদৃশ সেই মানুষটি চলে গেলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংগীত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী একজন বিদগ্ধ মানুষ। সংগীতের সকল শাখায় তাঁর বিচরণ, বাংলাদেশের লোকসংগীত গবেষণা তাঁর কাছে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সংগীত বিভাগের নানা আয়োজনে নতুন নতুন অনুষ্ঠান নির্মাণ করে বাংলা সংগীতকে সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে দিনমান মগ্ন থাকতেন তিনি। বিভাগের পাঠ্যসূচি কিভাবে আরো ভালো করা যায় কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংগীতকে সকল স্কুল-কলেজে সংযুক্ত করা যায় এই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা।

তাঁর উদার মানসিকতার শান্ত ছায়ায় তাঁর সহকর্মী হিসেবে আমরা ছিলাম তাঁর স্নেহধন্য। আমাদের সংকটে-সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে সমাধান দিতেন। শান্ত-সৌম্য এই মানুষটি শুধুমাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এদেশের এক সূর্যসন্তান, একজন সংগীতজ্ঞ, শিল্পী ও গবেষক। তাঁর লেখায় ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। তাঁর গ্রন্থগুলো বাংলা সংগীতের সমৃদ্ধি পথের সারথি হয়ে থাকবে। তাঁর তত্ত্ব ও গবেষণাকে ভর করে সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবে। তাঁর গ্রন্থে সংগীতের সকল শাখা যে স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে তা সত্যিই বিরল।

অসাধারণ এই মানুষটি ছিলেন মৃদুভাষী– বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যের পরিমিতিবোধ ও উপযোগিতা ছিল অমূল্য। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন। কথার বাঁকে বাঁকে তিনি দরাজ কণ্ঠে গান জুড়ে দিতেন অতঃপর– আবার কথায়। কথা ও সুরের খেয়ায় ভর করে এমন সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন আমি দেখিনি।

তাঁর উদারতা, পরের জন্য সহমর্মিতা, বিনয় ও স্পষ্টবাদিতা আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি।

'বেড়েছে জনগণ বাড়েনি মানুষ'

ড. মৃদুলকান্তি একজন মা-নু-ষ ছিলেন।

তাঁর সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠায় তাঁর পারিবারিক অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জীবন সম্পর্কে এবার আলোকপাত করি–

শিল্পী মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর জন্ম সুনামগঞ্জে, ১৯৫৫ সালে। পিতা প্রয়াত মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও মাতা দীপালী চক্রবর্তীর সাত পুত্রকন্যার মধ্যে তৃতীয় সন্তান মৃদুলকান্তি। বাবা ভালো বাঁশি বাজাতেন ও মা সেতার বাজাতেন। বড়ভাই মৃণালকান্তি তবলাবাদনে পারদর্শী ছিলেন। ১৯৭৭ সালে সর্বভারতীয় যুব উৎসব ১৯৭৭ (YUV `77) লোকগীতিতে প্রথম স্থান লাভ করেন (বিশ্বভারতীর ছাত্র হিসেবে যোগদান করে) মৃদুল। এই উৎসবের প্রধান বিচারক ছিলেন গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিবারের সবাই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাতা দীপালী চক্রবর্তী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন সুনামগঞ্জ স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে। বড়ভাই মৃণালকান্তি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে ও তাঁবুতে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বড় বোন রত্না চক্রবর্তী ও মৃদুল ভারতের মেঘালয়ে শিলং, বালাট, মাইলাম শরণার্থী শিবিরে গান গেয়ে বেড়ান অসহায় মানুষ যাতে মনোবল না হারিয়ে ফেলে। দেশপ্রেমের গান, মুকুন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান করতেন।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে বৃত্তি লাভ করে বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন থেকে যথাক্রমে বি.মিউজ (১৯৮০) ও এম.মিউজ (১৯৮২) কোর্স কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ১৯৭২ সালে সিলেট বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে গান গাইতে থাকেন। পরে শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রে ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করছেন।

মৃদুল এক ব্যতিক্রমী শিল্পী, যাঁর রবীন্দ্রসংগীত ও লোকসংগীতে ছিল অবাধ বিচরণ। সেই সঙ্গে মাটি ও মানুষের গান এক কথায় গণসংগীতে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিযাত্রা। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত এবং লোকসংগীত বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠত। সংগীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাকর্মে যুক্ত রয়েছেন বাংলা গানের নানা দিক নিয়ে। পিএইচডি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯94 সালে। ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণাকর্মের একটি অধ্যায়– 'হাসনরাজা : তাঁর গানের তরী', বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এই গবেষক-শিল্পীর লেখা 'বাংলা গানের ধারা' (১৯৯৩) প্রকাশ করেছেন। গবেষণাকালে বাউল-ফকিরদের সঙ্গে থেকে মৃদুল বাংলার প্রিয় লোকবাদ্য দোতারাও

শিখেছেন এবং এই দোতারার পরিমার্জিত রূপ দিয়েছেন সরোদ ও নকুলবীণার সম্মিলনে। যন্ত্রটির নাম শিল্পী রেখেছিলেন– সুরশ্রী। এই 'সুরশ্রী' যন্ত্রে শিল্পী বাংলা গানের নানা দিক রবীন্দ্রসংগীত, গণসংগীত, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের সুর বাজিয়েছেন। এই ক্যাসেটটি প্রকাশ করেছেন ঢাকা 'উৎস'। এটি বাংলা সংগীতের এক অনন্য সংযোজন।

লোক কবি হাসনরাজার অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত কিছু গান মৃদুল সংগ্রহ করে ক্যাসেটবদ্ধ করেছেন। নিজে পরিচালনা ও স্বকণ্ঠে হাসনরাজার গান গেয়েছেন। দেশে-বিদেশে হাসনরাজার গানকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মৃদুলকান্তি। কলকাতা দূরদর্শনে 'হাসনরাজা ও তাঁর গান' শীর্ষক আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীতের পাশাপাশি হাসনরাজার গান, রাধারমণের গান ও শাহ আবদুল করিমের গান পরিবেশন করেছেন। তবে, এই গুণীশিল্পীকে টেলিভিশনে খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীত – 'অধরা মাধুরী' ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন উৎস (বাবুল রেডিও ইলেকট্রনিক্স)। এটি একটি অনুষ্ঠান থেকে ধারণ করা– তাতে এস্রাজ, মন্দিরা, খোল, তানপুরা সহযোগে শিল্পী ১৪টি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। তাঁর গীত বাউল অঙ্গের গানে এক গভীর আবেদন জাগিয়ে তোলে মনে।

অধ্যাপক মৃদুলকান্তি বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে আমন্ত্রণ পেয়ে সংগীত বিষয়ক বক্তৃতা, পারফর্মেন্স এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ভারত, ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা ও মরক্কোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার ও Lecture Demonstration প্রদান করেছেন।

সংগীতশিক্ষা ও সাধনা : শৈশব-কৈশোরে পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংগীতচর্চা শুরু হয়। বড় বোন রত্না চক্রবর্তীর কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। পরে শান্তি নিকেতনে নানা সংগীত গুণীজনের সংস্পর্শে আসেন। প্রাচীন বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত– রাগসংগীতে তালিম নেন স্বর্গীয় মন্মথনাথ রায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন সিং খাঙ্গুরা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, গোরা সর্বাধিকারী, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিভি ওয়াঝলওয়ার, দেবেন দাস বাউল-এর কাছে। দেশে এবং বিদেশে তাঁর বাউল ভাবদর্শন ও রবীন্দ্রনাথের গান সমাদৃত সুধী সমাজে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বভারতী থেকে "বাংলা সংগীতের ধারা ও লোকসংগীতের সুরে রবীন্দ্রসংগীত" (অষ্টম থেকে বিংশ শতাব্দী) বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ও ফরেন সার্ভিস একাডেমী আয়োজিত সংগীত বিষয়ে পাঠদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। হাজার বছরের বাংলা গান নিয়ে গবেষণাধর্মী সংগীতানুষ্ঠান 'বাংলা গানের ধারা' অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা করছেন ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। দেশ ও জাতি এমন এক বরেণ্য সংগীতজ্ঞের অকালমৃত্যুতে বিস্মিত।

ঘড়ির কাঁটা ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে আমাদের আয়ু খায়। আমরা সকলে সময়ের হাত ধরে একটিই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাই, যেই গন্তব্যের নাম মৃত্যু। আর মৃত্যু আছে বলেই এত মায়া জীবন-জীবনে।

"এত যে বাতাস পৃথিবীতে
তবু নিঃশ্বাস শেষ হয় কেন?"

অ নু বা দ / গ ল্প

জুতো

....

না সা র ই ব্রা হি ম / অ নু বা দ : শ ও ক ত হো সে ন

হয়তো এটা স্রেফ একটা বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক, কিন্তু এখন সবার গল্পে পরিণত হয়েছে।

নিজার রামাল্লায় যাবার জন্যে জেদ করছিল কেন জানত না কেউ। অবস্থা সুবিধের ছিল না–মিলিটারি চেকপয়েন্ট, বেইজ্জতি, পাহাড় আর আবর্জনায় তৈরি বাধা ডিঙিয়ে কষ্টকর যাত্রা। তবু দিনমজুরের গোঁ নিয়ে লেগেছিল নিজার: একটা সমস্যা আছে, রামাল্লায় গিয়েই সুরাহা করতে হবে। ওকে যেতেই হবে। 'রাস্তার কষ্ট আমি সইব...আমরা তো অভ্যস্ত হয়েই বেড়ে উঠেছি...আমাদের জন্যে এসব দস্তুর হয়ে গেছে...আর কীই-বা করার আছে আমাদের? মরণ পর্যন্ত বসে থাকব, কিসের অপেক্ষায়?'

গাড়িতে চেপে চলে গেল ও। যেভাবেই হোক ওকে রামাল্লায় যেতেই হবে।

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এক কিলোমিটার পিচঢালা রাস্তা পেরুনোর পর আরেক কিলোমিটার মাটির পথ পেরোয় গাড়িগুলো। পাহাড়ের দিকে তাকাল নিজার। চেকপয়েন্ট পেরুনোর একটা উপায় সবসময়ই পেয়ে যায় লোকে। সাইডরোডগুলো চেকপয়েন্ট, নানা বিধিনিষেধ, ক্লান্তি আর অসহায়ত্বকে ফাঁকি দেওয়ার বেলায় দক্ষ করে তুলেছে ওদের। পিঁপড়ের ঢিবি যেন, ওদের ঘরবাড়ি আর পথঘাট ধুলোয় মিশিয়ে

দেওয়ার মুহূর্তে সব সময়ই বেরুনোর একটা পথ, সমাধান পেয়ে যায়। ফাঁকি দেওয়া, খাপ খাওয়ানো আর সহ্য করার বেলায় দারুণ প্রতিভা ওদের। দিনের পর দিন মুখ আর ক্ষুদে পায়ে মাটি খুঁড়ে মাটির কণা দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এই পিঁপড়েগুলো। ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে ওরা, তবে সেটাই অনেক; এমনভাবে পথ চলতে থাকবে যেন কিছুই ঘটেনি। হয়তো মিনিটখানেক পেরুনোর পর ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে ওদেরই একজন সেই গর্ত ধ্বংস করে দেবে। পিঁপড়ের দল থামে, ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে শুঁড় নাড়ে, অবস্থা জরিপ করে, ওটার চারপাশে ভিড় করে, তারপর ফের বেরিয়ে এসে কাজে লাগে।

মেঠোপথে লাইন ধরে কালো স্তূপের মতো চলাফেরা করছে লোকে; মানুষের এই দলটি খোঁড়ায়, থামে, সামনে এগোয়, তারপর ফের পিছিয়ে যায়। গন্তব্যে পৌঁছাতে যেকোনও জায়গায় উঠবে ওরা; দান্তের নরকের ভেতর দিয়ে যাবে। সোজা পথে একসাথে জড়ো হয়, চড়াই ভাঙে; আবর্জনার বাধা টপকে যায়। এক ঘণ্টা বাদে বুলডোজারগুলো হয়তো পাথর, মাটি আর সিমেন্টের টুকরোয় ওদের পথ ধ্বংস করে দিতে পারে। কালো জটলা থামে, ইতিউতি নজর চালায়, নিজেদের কষ্ট, অশ্রু, ঘাম নিয়ে ভাবে, কিন্তু তারপরেও একটা পথের খোঁজ পেয়ে যায়, তৈরি করে, আবিষ্কার করে আর চিরন্তন জেদ অব্যাহত রাখে।

অন্যদের মতোই এগিয়ে যায় নিজার। ক্রোধে আক্রান্ত হয়ে খিস্তি করতে করতে পিঁপড়ের পথে চলে ও। পা-জোড়া বিক্ষত হয়ে গেছে, পড়ে যায়, আবার ওঠে, এক বুড়ো লোকের হাতে ভর দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে চড়াই বেয়ে উঠতে থাকে। রামাল্লায় ওকে পৌঁছতেই হবে। ঠিক ওই মুহূর্তে হয়তো রামাল্লায় যেতে চাওয়ার কারণ ভুলে গিয়েছিল ও। সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওখানে পৌঁছানোটাই ছিল ওর লক্ষ্য–একগুঁয়ে হওয়ার ক্ষমতা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্রেফ পৌঁছানোটাই এক ধরনের বিজয়, সেটাই যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে যায় উত্তপ্ত, ধূলিধূসরিত সময়। বাধা, অস্ত্র, সৈনিক, আইডেন্টিটি কার্ড পরখ, দীর্ঘ অপেক্ষা, মুখখিস্তি আর অপমান। সবকিছু মিশে যায় সবকিছুর সাথে। আগে বাড়া আর পিছু হটায় সমান দুর্গতি। পেছনে বাধা আর অসম্মান, সামনে সেই একই জিনিস। তাই সামনেই চলল ও। এটা কি পৌঁছানো নয়, এটা কি দুর্দশাকে পাশ কাটানো নয়, সাধারণ স্পষ্ট সমতাকে ভেঙে দেওয়ার বিরোধিতা নয়? আস্ত একটা জাতি গলি খুঁজে পায়, সেই যুক্তিকেই টিকিয়ে রাখতে যুক্তিকে অতিক্রম করে যেখানে বলা হয়, লেগে থাকো, নইলে মরণ।

নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে ক্লান্ত পায়ে আশার পথ বেয়ে উঠতে লাগল নিজার। প্রতিটি টিলাই একেকটা বাধা, ওকে পার হতেই হবে। ওর একগুঁয়েমি পুষ্টি যোগাচ্ছে তাতে। প্রতিটি হাসি এক ধরনের প্রতিরোধ, যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটিই ওই। তবে নির্ভেজাল হাসির মুহূর্তটিতেই সত্যিকারের খুশি হবে ও।

এক গাড়ি থেকে আরেক গাড়িতে, এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে, এক চেকপয়েন্ট থেকে আরেক চেকপয়েন্টে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে চলল ও। আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে অবশেষে গাড়ির আসনে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল, চারপাশে কী ঘটছে বলতে পারবে না।

ভোরের পর ছয় ঘণ্টা খুব বেশি সময় নয়, ভেবে হাসল ও। অনেকের তো কোথাও যেতে, কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে দশ ঘণ্টাও লেগে যায়। কালান্দিয়া রিফিউজি ক্যাম্পের কাছে শেষ চেকপয়েন্টের কাছাকাছি হাজির হল ও। যুদ্ধ জেতার জন্যে আর মাত্র একটা ধাপ বাকি।

পিচঢালা রাস্তায় গাড়ির দীর্ঘ সারি। গতি কমিয়ে দীর্ঘ সারির শেষমাথায় এক সময় থেমে গেল গাড়িটা। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে চারপাশ জরিপ করল ও। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল একটা ঝকঝকে কালো গাড়ি, খিস্তির তুফান উঠল পেছনে।

রোদে লোকজনের চাঁদি পুড়ে যাচ্ছে, লোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে ঘাড় বেয়ে, চোখে ধন্ধ লেগে যাচ্ছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবিচল মনে এগিয়ে চলল নিজার। প্রতিটি বাক্য আর ভাঙা ভাঙা কথা শুনছে কান পেতে: 'সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পাস ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেবে না ওরা।'

'পারমিট থাকুক কি না থাকুক আমাকে রামাল্লায় গিয়ে ফিরে আসতেই হবে।'

চেকপয়েন্টের দিকে আগে বেড়ে সিমেন্ট ব্লকের সামনে দাঁড়াল ও। অল্প কয়েকজন সৈন্য ঘুরঘুর করছে। ওদের কারও কারও বয়স এমনকি আঠার বছরও হবে না; এখনও গোঁফের রেখাও দেখা দেয়নি। ওদের সামনে শত শত নারী-পুরুষ, অপেক্ষায় আছে, আশাবাদী; পাস পাওয়ার জন্যে সৈনিকদের নানাভাবে তোষামোদ করছে। কিন্তু নিষ্ফল: অনুনয়, কান্না, বয়স, অসুস্থতা, ইউনিভার্সিটির কোর্স, কোনওটাই কোনও কাজে আসছে না...'না মানে না।'

চাপ আর ভিড়ে প্রবল হয়ে উঠল। এক সৈনিক গ্যাসবোমা ছুঁড়ে মারল, ভিড়ের ভেতর ফাটায় চাপা আওয়াজ তুলল ওটা। লোকজন ছুটতে শুরু করল, কাশছে, জ্ঞান হারাল, কিন্তু ফায়দাহীন। না মানে না।

ফের আগে বাড়তে শুরু করল জনতা। আগে বাড়ল নিজার। সিমেন্ট ব্লকের সামনে দাঁড়াল, তারপর সংকীর্ণ প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেল।

'অ্যাই তুমি, কোথায় যাচ্ছ? থামো!'

'আমি যেতে চাই।'

'পারমিট আছে?'

'না, পারমিট নেই।'

'তাহলে ফিরে যাও। নিষেধ আছে।'

'কিন্তু, মিস্টার, আমাকে যেতেই হবে। অনেক দূর থেকে এসেছি। জরুরি কাজ আছে।'

‘পরোয়া করি না। নিষেধ আছে। ফিরে যাও, নইলে গুলি করব।’

‘গুলি করতে চাইছ কেন? দেখতেই পাচ্ছ আমি নিরস্ত্র।’

‘বললাম তো, নিষেধ আছে।’

ইতস্তত করল নিজার। ঘাড় ফিরিয়ে চোখের পাতার ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে পেছনে তাকাল, তারপর আবার চেষ্টা করল।

‘ফিরে আসা পর্যন্ত আমার আইডি কার্ড রেখে দিতে চাইলে, ধরো, এটা রাখো।’

‘দরকার নেই ওটা। যাওয়া নিষেধ। আমার হুকুমই শেষ কথা।’

‘কেন রে ভাই? আমার কাছে কী চাও? আমাকে রামাল্লায় যেতেই হবে।’

অনন্তে তাকাল সৈনিক, তারপর ফের নিজারের চেহারার দিকে চোখ ফেরাল। এবার একটু মজা করার, মশকরার সুযোগ মিলেছে। নিজারকে ওর আইডি কার্ড দিতে বলল সৈনিক। ওটার দিকে একবার নজর ফেলে নিজারের দিকে তাকাল সে।

‘শোনো, টুপি খুললে তোমাকে যেতে দিতে পারি।’

তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকের দিকে তাকাল নিজার। তারপর মাথা থেকে টুপি খুলে ছুঁড়ে মারল দূরে।

‘এবার যেতে পারব?’

জোরে হেসে উঠল সৈনিক। জনতার মাথার উপর দিয়ে উড়ে টুপিটা উধাও হয়ে যেতে দেখল।

‘শেষ হয়নি। আরও শর্ত আছে, যদি যেতে চাও।’

নিজার বুঝতে পারল প্রাথমিক ও চরম প্রত্যাখ্যানের বাধা ভাঙতে পেরেছে ও। এইবার দরাদরি শুরু করল ও।

‘হ্যাঁ, আর কী চাও তুমি?’ সৈনিককে জিজ্ঞেস করল।

‘জুতো খুলে রেখে যেতে হবে। আমার কাছেই থাকবে ওগুলো, ফেরার পথে নিয়ে যেতে পারবে।’

সৈনিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিজার। এটা রসিকতা– নাকি সৈনিক সিরিয়াস?

‘সেটা সম্ভব না। এই গরমে ভাঙা কাচ আর আবর্জনার ভেতর হাঁটব কিভাবে...?’

‘ঠিক আছে, সেটা না চাইলে আগের জায়গায় ফিরে যাও।’

মাথা নিচু করে খানিকটা ঘোরাল নিজার। প্রচণ্ড রোদ আর ধূলির ভেতর জনতাকে জরিপ করল। চোখের পলকে গোটা জীবনের ভোগান্তি আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

‘বেশ, মেনে নিলাম,’ অবশেষে বলল ও।

উবু হয়ে জুতোজোড়া খুলে বিস্মিত সৈনিকের সামনে চট করে সিমেন্ট ব্লকের উপর রাখল, তার অনুমতির অপেক্ষা করল না।

‘আরে দাঁড়াও, শর্ত এখনও শেষ হয়নি।’

ঘোরের ভেতর হাঁটছে নিজার। রোদে তেতে আছে মাটির রাস্তা।

'যাবার আগে আমাকে এক কাপ চা এনে দিতে হবে।'

সৈনিকের দিকে, ওর পায়ের দিকে তাকাল নিজার। গাল বেয়ে ঘামের ধারা নামছে, থুতনির কাছে ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করে তারপর হারিয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত ধূলির মাঝে।

ধীর পায়ে সরে এল ও। পাঁচ মিনিট বাদে বড় একটা গ্লাসে করে চা নিয়ে ফিরে এল। সৈনিকের হাতে দিল ওটা, অন্য সৈনিকদের সাথে রসিকতা করতে করতে তাতে চুমুক দিতে লাগল সৈনিক।

চেকপয়েন্ট থেকে বিদায় নিল নিজার; অবশেষে ওটা পেরিয়ে রামাল্লার পথ ধরল। অতিক্রম করতে পেরেছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

(বয়ানের যুক্তি মোতাবেক এখানেই গল্পটা শেষ হতে পারত। কিন্তু যথারীতি একজন সাধারণ ফিলিস্তিনি অন্য এক সমাপ্তির দিকে গল্পটাকে নিয়ে যেতে জোর করেছে।)

চার ঘণ্টা বাদে ফিরে এল নিজার। চেকপয়েন্টের কাছে যাবার আগে জুতো খুলে নিল। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢোকাল ওগুলো। খালি পায়ে ফেরার শর্ত ছিল ওর।

চেকপয়েন্টের সৈনিকের দিকে এগিয়ে গেল ও।

'দেখ, ফিরে এসেছি আমি। আমার জুতোজোড়া কোথায়?'

সিমেন্টের চৌকো ব্লকের উপর রাখা জুতোজোড়ার দিকে ইঙ্গিত করে প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সৈনিক।

জুতোর দিকে এগিয়ে গেল নিজার। ডান পাটা জুতোর ভেতর গলাতেই উষ্ণ তরলের ছোঁয়া পেল। চমকে পিছিয়ে এল ও। জুতোটা ধরে সৈনিকের দিকে তাকাল, আরও চারজন সৈনিক যোগ দিয়েছে তার সাথে, হাসতে শুরু করেছে ওরা। জুতো ওল্টাল নিজার, কাদাময় হলদে তরল বের হয়ে এল। বার কয়েক জুতোটা ঝাঁকিয়ে নিল ও। খবর কাগজের পাতা দিয়ে মোছার চেষ্টা করল, রাজনীতিক আর শীর্ষসম্মেলনের নেতাদের ছবিতে ভরা ওগুলোর পাতা। শান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ও, জুতোয় পা গলাল, তারপর চেকপয়েন্ট হয়ে বের হয়ে এল। তিন কদম। তারপর আচমকা থমকে দাঁড়াল। ঘুরে ফিরে এল আবার, সিমেন্ট ব্লকের দিকে এগোচ্ছে।

'কী চাও?' হাসি আর বিস্ময়ের সাথে ওকে জিজ্ঞেস করল সৈনিক।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল নিজার। লোকজন আর গাড়ির দিকে তাকাল। জুতোজোড়া খুলে সিমেন্ট ব্লকের উপর রাখল। সৈনিকের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল ও।

'শেষ একটা কথা বলতে চাই তোমাকে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'যতদিন তোমরা আমাদের জুতোয় পেশাব করছ আর আর আমরা তোমাদের চায়ে পেশাব করছি ততদিন আমাদের ভেতর শান্তি আসবে না। বুঝতে পেরেছ?'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল নিজার। খালি পায়ে মিশে গেল ভিড়ে।

[নাসার ইব্রাহিম একজন ফিলিস্তিনি লেখক]

[দ্র. এই অনুবাদক আর গোলাঘর'র সম্পাদক-এর নাম একই, কিন্তু এরা আলাদা ব্যক্তি ।]

বি শ্ব সা হি ত্য / প্র ব ন্ধ

টোমাস ট্রান্সট্রোমার: পরাবাস্তব চিত্রকল্প আর আত্মজৈবনিক বাস্তববাদ

....

কু মা র চ ক্র ব র্তী

কেন জানি মনে হচ্ছিল টোমাস ট্রান্সট্রোমার আর নোবেল পাবেন না, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নাম সম্ভাব্য নোবেল লরিয়েট হিসেবে উঠে আসছিল, কিন্তু তিনি বাদ পড়ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি পেলেন। এখন তাঁর বয়স আশি, বহু দিন ধরেই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, পঙ্গু ও বাক্শক্তি রহিত। এখন তাঁর নির্বাণের সময় এসে যাচ্ছে, পার্থিব এই পুরস্কার তাঁকে কতটুকু তৃপ্ত করবে তা-ই কথা। জানা গেছে পুরস্কার পাওয়ার খবর শুনে তিনি নাকি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তা করে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। পুরস্কার আস্পর্ধা দেখায়: গৌণকে প্রধান করতে চায় আর প্রধানকে

উপেক্ষা করে বসে। নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রেও এরকম অনেক ঘটেছে। যা-ই হোক টোমাস ট্রান্সট্রোমার পুরস্কার পেলেন এতে তাঁর কিছু না হলেও আমরা কবিতাপ্রেমীরা বেজায় খুশি ও আপ্লুত। খুশি এ কারণেও যে অনেকদিন পরে একজন প্রকৃত কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। প্রকৃত এই অর্থে যে ইউরোপীয় সমসাময়িককালে, আমার বিবেচনায় সকল বিবৃতিধর্মিতাকে পরিহার করে তিনি লিখেছেন রহস্য, উপমা, নতুন চিত্রকল্প ও প্যারাডক্স-সমৃদ্ধ মিতায়ত কবিতা, যেখানে স্থানিক উপাদানকে নিয়েও তা বিশ্ববোধকে ধারণ করতে পেরেছে । এখন ফিকশনের যুগ, কবিতার রস ও রহস্য বোধগম্য করার মানুষের অভাব। এর মধ্যেই তিনি লিখে গেছেন কবিতা, আত্মসুরে ও অন্তর্বস্তুদের সমভিব্যাহারে। আমার জানামতে, শুধুই কবিতা আর একটি স্মৃতিকথা?*Memories Look at Me: A Memoir* তিনি লিখেছেন। অনেক বছর আগে, ১৯৯৫ সালে যখন তাঁর কবিতা পড়ি তখন প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়েই অবশ হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর পত্নী মনিকা ট্রান্সট্রোমার যখন নরম খামে করে তাঁর দুটি বই আমাকে ডাকযোগে পাঠান, তখন খামটি খুলে দেখি তার ভেতরের দিকে ফোম দেওয়া– যাতে পাঠানো বস্তু বিকৃত হয়ে না- যায়। আর প্রথমবার আরও দেখি, একটি বইয়ের জ্যাকেটের ভেতরের দিকটা লেমিনেশন করা। এই তো গেল বস্তুগত আনন্দের কথা। কিন্তু যেইমাত্র নির্বাচিত বইটি খুলে প্রথম কবিতাটি পড়লাম তখন আমি ভাবার্পিত হয়ে গেলাম:

Awakening is a parachute jump from the dream.
Freed from the choking vortex, the diver
sinks towards the green map of morning.
Things magnify.

বস্তুত এই বই দুটিকে আমার মনে হচ্ছিল রহস্যগ্রন্থ যা খোলা মাত্র আশ্চর্যরা বেরিয়ে আসতে থাকে।

দুই.

টোমাস ট্রান্সট্রোমার তাঁর *জীবিত ও মৃতদের জন্য* কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'ভেরমেয়ার'-এর শেষ পঙ্‌ক্তিতে বলেছেন, `Jag ar inte tom, jag ar open'?'আমি শূন্য নই, আমি উন্মুক্ত'। মূলত টোমাস ট্রান্সট্রোমার অসংখ্য শূন্যস্থান দিয়ে সেট করেন এক দীর্ঘ কাব্যময় জায়গা, যা আমাদের মুগ্ধ ও মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর শূন্যতা আমাদেরকে কিছু বলে ওঠে। উল্লিখিত কবিতাটির শুরুতে তিনি বলেছেন, 'কোনো আশ্রিত জগৎ নয়, 'দেয়ালের অপর পার্শ্বে শুরু হয়ে যায় কলরোল'। আর কবিতাটির শেষ প্রান্তিক স্তবকের চৌম্বকীয়তা: নির্মল আকাশ দেয়ালের দিকে নিজেই হেলছে।/এ যেন শূন্যের প্রতি এক প্রার্থনা। /আর শূন্য আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কানে কানে বলে: 'আমি শূন্য নই আমি উন্মুক্ত।'

যে নিগেশন দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়, পরিণতিতে ব্যক্ত হয় চরম আশাময় দৃঢ়তা। এই হলেন ট্রান্সট্রোমার, যিনি তাঁর কবিতার বৃহত্তম অংশকে দেশ-কাল-অনুষঙ্গ থেকে স্বাধীন করে সব পাঠকের সম্পদ করে দেন। তাঁর কাছে, কবিতা হল সক্রিয় ধ্যান, 'তারা জাগাতে চায়, আমাদেরকে ঘুম পাড়াতে চায় না'।

কী আছে টোমাস ট্রান্সট্রোমারের কবিতায় যার ফলে একজন সুইডিশ গীতিকবি হয়েও অপ্রতুল লেখা, রাজনৈতিক বাগ্মিতাহীনতা, ও অভিজ্ঞতার আতশ-বাজিতা ছাড়াই সারাবিশ্বের পাঠকের কাছে তিনি নিমিষে পৌঁছে যান এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র নোবেল ছাড়া স্ক্যান্ডেনেভীয় ও বহির্বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হন। সাধারণ বিবেচনায় এসবই হল গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তবে তিনি এসব বিধিবিধান ছাড়াই অতি গুরুত্বপ্রাপ্ত শুধু তাঁর কবিতা দিয়ে। তাঁর একটি কবিতার বইয়ের নাম *দ্য ট্রুথ ব্যারিয়ার*। আর সত্যিই তিনি ভেঙে ফেলেন সকল প্রতিবন্ধকতা আর বাধা। কী এই ক্ষমতা? কিন্তু বোধ হয়, এর কোনো পরিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। লিথুয়ানিয়ার কবি হেনরিকাস রাউডুসকাস বলেন যে, কোনো কবির স্বল্প পাঠক আর অন্যদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত, তা কিছু ধর্মের মুষ্টিমেয় অনুসারীর সংখ্যা, অন্যদিকে কিছু ধর্মের পৃথিবীব্যাপিতার কারণের মতোই রহস্যময়। অধিকাংশ সমালোচকই, এক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্গত আত্মসুর, অজানা ও শাশ্বতের প্রতি ধ্রুব উন্মুখতাকে চিহ্নিত করেন যা সকল অন্ধমত, বিশ্বাস এবং পদ্ধতির ঊর্ধ্বে কবিতার আরোগ্যকারী শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এ জন্যই তাঁর কবিতার অন্যতম বিশিষ্ট ইংরেজ অনুবাদক ও সমালোচক রবার্ট বাই তাঁর কবিতাকে আখ্যায়িত করেন 'নীরবতা আর গভীরতার কবিতা' হিসেবে, যার মধ্যে থাকে সর্বজনীন জাগরণ; যা ইতিমধ্যে অনায়াসে তিরিশটিরও বেশি ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যায়। ট্রান্সট্রোমার শুধুমাত্র শব্দের কবি নন, তাঁর আছে এক শক্তিশালী ব্যক্তিক ভাষা যা সংক্রামিত হয়ে অবশেষে ভাষান্তরিত হবার শক্তি রাখে। তাঁর নিজের ভাষায়:

> শব্দ থেকে বেরিয়ে আসা সবকিছুতে ক্লান্ত হয়ে, শব্দ কিন্তু ভাষা নয়,
> আমি যাই বরফাচ্ছাদিত দ্বীপে।
> বন্যতার শব্দ নেই কোনো।
> অলিখিত পৃষ্ঠাগুলো নিজেদের ছড়িয়ে দেয় সবদিকে!
> এখানে রয়েছে ভাষা, কিন্তু শব্দ নয় কোনো।

[মার্চ'৭৯]

তিন.

ট্রান্সট্রোমার-এর জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ এপ্রিল স্টকহোমে, গোস্টা ও হেলমি ট্রান্সট্রোমারের ঔরসে। তাঁর যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর মা-বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তিনি ও তাঁর মা তারপর স্টকহোমের এক শ্রমিক-শ্রেণির অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৭টি *কবিতা* বের হয় যা প্রথম আবির্ভাবেই পাঠকপ্রিয়তা ও গুণীদের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৫৬ সালে তিনি স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনস্তত্ত্বে ডিগ্রি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাইকোটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করতে যান। ১৯৫৮ সালে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *যাত্রাপথে গোপনতা* (secrets on the way) বের হয় যাতে তাঁর ১৪টি কবিতা স্থান পায়। ১৯৫৮ সালে তিনি মনিকাকে বিয়ে করেন যিনি পরবর্তী সময়ে সারাজীবনের জন্য হয়ে যান কবির সবচেয়ে একান্ত ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক ঘনিষ্ঠতম মুখপাত্র। ১৯৬০ সালে ট্রান্সট্রোমার লিংকোপিং-এর নিকট রক্সট্নায় যুবকদের একটি কারাগারে মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৬২ সালে বের করেন ২১টি কবিতার কাব্যগ্রন্থ *অর্ধ-সমাপ্ত স্বর্গ*। এ-পর্যায়ে দশ বছরে মোট ৫২টি কবিতা তিনি লেখেন। ১৯৬৬-এ প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ *প্রতিধ্বনি ও পদচিহ্ন/ঘণ্টা ও রেলপথ*। এ বছরই প্রথমবারের মতো *নিউডিরেকশন্স এনুয়্যাল*-এর ৮ম সংখ্যায় এরিখ স্যালিনের ইংরেজি অনুবাদে ১৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়। একই বৎসরে ট্রান্সট্রোমার স্টকহোমের ষাট মাইল পশ্চিমে ভেস্টারস শহরে চলে আসেন এবং বিশেষত, প্রতিবন্ধীদের মাঝে মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৭ সালে বের হয় কাব্যগ্রন্থ *কোয়ার্টেট*। ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ Morkerseende যা পরে রবিন ফালটনের অনুবাদে *অন্ধকারে দেখা* নামে ইংরেজিতে বের হয় এ বছরই। একই বছরে রবার্ট বাইয়ের অনুবাদে যুক্তরাষ্ট্রে *অন্ধকারবীক্ষণ* বের হয়। মে সুইসন ও রিয়ফ সোবার্জের অনুবাদে আমেরিকাতে *জানালা ও পথ* বের হয়'৭২-এ। '৭৩-এ বের হয় কাব্যগ্রন্থ *পথ*। '৭৪-এ বের হয় *বাল্টিকস* যাতে বর্ণনায়িত হয় দ্বীপ যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন। '৭৫-এ ফালটনের অনুবাদে যুক্তরাজ্যে *নির্বাচিত কবিতা* প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থ *দ্য ট্রুথব্যারিয়ার* বা *সত্যের সীমানা* '৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। '৮১ সালে কবি লাভ করেন পশ্চিম জার্মানির মর্যাদাপূর্ণ 'পেট্রারকা' পুরস্কার। এর মধ্যে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে বের হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে ট্রান্সট্রোমার স্টকহোমের 'বনিয়ারস কবিতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে বের হয় কাব্যগ্রন্থ *দ্য ওয়াইল্ড মার্কেট স্কোয়ার*। যুক্তরাষ্ট্রের ইকো প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *সিলেকটেড পোয়েমস?*১৯৫৪-৮৬, ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৮-তে ফালটনের অনুবাদে ব্রিটেনে বের হয় *কবিতা সংগ্রহ*। নোবেলের পর সুইডেনের সবচেয়ে সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় 'পাইলট পুরস্কার' তিনি এ বছরই লাভ করেন। '৮৯-এ বেরোয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ জীবিত ও *মৃতের জন্য*–যা মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার এক অসাধারণ সংকলন।

১৯৯০-এ এই কাব্যগ্রন্থের জন্য পান 'নর্ডিক কাউন্সিল প্রাইজ'। একই বছর এপ্রিলে সাহিত্যে 'নিউস্টাড ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ' (Newstadt International prize)-এর ১১তম লরিয়াট হিসেবে তিনি মনোনীত হন এবং ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার তাঁকে প্রদান করা হয়। এর আগে যাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা সবাই বিশ্বসাহিত্যের এক-একজন অনন্য দিকপাল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস ১৯৭২-এ, ফ্রাসিঁস পজঁ '৭৪-এ, এলিজাবেথ বিশপ '৭৬-এ, চেসোয়াভ মিউশ '৭৮-এ, অকতাবিও পাস '৮২-এ, পাবো হাডিক্কো '৮৪-এ, ম্যাক্স ফ্রিস '৮৬-এ এবং রাজা রাও '৮৮-এ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *বিষণ্ন গন্ডোলা* ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এক পর্যায়ে কবি বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যান এবং শরীরের ডান-অংশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এ-অবস্থায়ও তিনি অন্যের সাহায্যে কবিতা লিখে যাচ্ছেন। ট্রান্সট্রোমার ব্যক্তিজীবনে দুই কন্যাসন্তান ইমা ও পউলার জনক। তাঁর পত্নী মনিকা হলেন অসুস্থ জীবনে তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী, যিনি পেশায় একজন নার্স।

১৯৫৪ থেকে '৯০ পর্যন্ত তিনি লেখেন ১০টি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর সমগ্র কবিতা সংকলনটি মাত্র ২০০ পৃষ্ঠার এক ঐশ্বর্যময় গ্রন্থ। তিনি লেখেন কম আর যা লেখেন তা আসে সত্যিকার প্রেরণার তাগিদে। সুইডিশ সাহিত্যিক গুন্নার এডম্যান বলেন, ট্রান্সট্রোমার-এর কবিতার বইয়ের সংখ্যা দিয়ে তাঁর কবিতা বিচার্য নয়। তাঁর কবিতার ওজন তাঁর বইয়ের ওজনের চেয়েও বেশি। যখন আমরা তাঁর কবিতার গভীর প্রত্যন্তে প্রবেশ করি তখন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন উদ্‌ঘাটিত হয় যার মধ্যে জড়িত থাকে রহস্যময় প্রকৃতির নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক। যদিও তিনি লেখেন কম তবুও তাঁর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। তাঁর কবিতা পঞ্চাশটিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে গেছে। উত্তর ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকাতে বর্তমানে তিনি তুমুল প্রভাবসঞ্চারী।

চার.

১৯৯০-এ 'নিউস্টাড পুরস্কার' ভূষিত হওয়ার সময়ে জুরিদের উদ্দেশে প্রদত্ত প্রস্তাবনায় জন ক্যাপলিনস্কি বলেন, ট্রান্সট্রোমার শিল্প এবং জীবন, আধুনিক ও ঐতিহ্যের এক সংশ্লেষণকে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক অস্তিত্বের অসঞ্জীবিত বাস্তবতার মধ্যে তিনি জীবনের প্রশ্বাসকে সার্থক করেছেন এবং এ পথে তিনি তাৎপর্যপূর্ণভাবে কবির দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন তুমুল সৃষ্টিশীলতায়। রাজনৈতিকভাবে একজন অসম্পৃক্ত মানবতাবাদী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের দুর্দশাকে ভুলে যাওয়ার তাঁর কোনো অধিকার নেই। লরিয়্যাটের বক্তব্যে কবিতা সম্পর্কে ট্রান্সট্রোমার দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন যা তাঁর অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরে: 'একটি কবিতাকে আপনি ভাষায় একমাত্র জীবনের প্রকাশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারেন যা সুসম্বন্ধভাবে সেই ভাষায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে ভাষায় তা লেখা হয়, যেমন আমার ক্ষেত্রে সুইডিশ। একটি কবিতা সুইডিশ ভাষায় আমার দ্বারা লেখা হয়।

অন্য ভাষায় তাকে বহন করে নেয়া অসম্ভব।' অন্য, বিপরীত মতটি হল: 'কবিতা যেভাবে উপস্থাপিত হয় তা হল অন্য অভিব্যক্তি, অদৃশ্য কবিতা, যা সাধারণ ভাষার নেপথ্যে একটি ভাষায় লেখা হয়। সুতরাং এমনকি মুল ভার্সানটাও এক ধরনের অনুবাদ। ইংরেজি অথবা মালয়লাম ভাষায় অনুবাদ হল শুধুমাত্র সেই অদৃশ্য কবিতার নতুন সত্তায় আবির্ভূত হওয়ার এক পদচারণা।'

ট্রান্সট্রোমারের প্রথম দিকের কবিতাকে বলা যায় অনেকটা রোমান্টিক যাতে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ভাব ও উপাদানের উপস্থিতি বিরাজমান। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাঁর ভাষা সুইডেনের কথ্য ভাষায় চলে আসে এবং তিনি লিখতে থাকেন গদ্যে, মুক্ত ছন্দে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'প্রায়শই কবিতায় কোথাও না কোথাও, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে নিয়মিত-সংখ্যক তালযুক্ত এক কঙ্কাল। তোমার যা জানা নেই, কিন্তু আমার জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ।' তাঁর কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রশস্ত ও পৃথক পৃথিবী থেকে আসা চিত্রকল্পের সম্মেলন আর অন্তর্গত 'স্পেস' যা আমরা অনুভব করি। সমালোচক রবার্ট বাই এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্ভবত তাঁর অন্যতম কারণ হল চার বা পাঁচটি প্রধান চিত্রকল্প, যা তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় প্রতিভাত হয়, তা মনের প্রশস্ততম অন্দর-উৎস হতে বের হয়ে আসে। তাঁর কবিতা, এমন এক রেলস্টেশনের মতো, যেখানে রেলগাড়ি অতিশয় দূরত্ব থেকে এসে একই জায়গায় অল্পসময়ের জন্য দাঁড়ায়। কবিতা এজন্যই রহস্যময়, কারণ, চিত্রকল্পগুলো মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দূরত্বশীল থাকে। চিত্রকল্প নির্মাণের দিক থেকে তিনি এক আশ্চর্য প্রতিভাবান ও অভিনব শিল্পী। চিত্রকল্পগুলো প্রায়ই উদ্যোগহীনভাবে উঠে আসে। তারা ঊর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হয় যেন প্লাবনের মতো ভরে দেয় নির্জন জায়গা, জলাশয় বা গভীর কাজল-কালো ফার বনানী। এগুলো ভরা, অন্তহীন আর উপর্যুপরি। প্রায়শই অনন্তে সম্পৃক্ত। তাঁর কাব্যগন্থের প্রথম কবিতাটিতে এ-জাতীয় মূল সূত্রের একটি ইশারার প্রবৃদ্ধি ধরা পড়তে পারে:

জেগে ওঠা স্বপ্ন থেকে প্যারাসুট ঝাঁপ।
রুদ্ধশ্বাস আবর্তের ছাড় পেয়ে, ডুবুরি
ডুবে যেতে চায় ভোরের সবুজ মানচিত্রে।
বস্তুরা বিবর্ধিত। সে দ্যাখে, পাখা ঝাপটানো
ভরত পাখির অবস্থান থেকে, অজস্র বৃক্ষমূল নিয়ম
যেন ভূ-গর্ভস্থ আন্দোলিত দীপাধার। {প্রস্তাবনা}

আত্ম-দর্শন ও আত্ম-উন্মোষ, দ্বৈতসত্তার দ্বান্দ্বিকতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাঁর কবিতার গৃহপালিত পরিচয়। *অন্ধকারে দেখা* কাব্যগ্রন্থের 'নাম' কবিতাটিতে ফুটে ওঠে এই সঙ্কট প্রশ্ন:

গাড়ি চালানোর সময় ঘুম এসে গেল আমার, আর আমি পথের ধারে গাছের নিচে নিজেকে রেখে দিলাম। পেছনের সিটে নিজেকে রেখে দিলাম। পেছনের সিটে নিজেকে ঠেসে ঘুম গেলাম। কিন্তু কতক্ষণ? কতটা সময়? অন্ধকার নেমে আসল। হঠাৎ জেগে উঠলাম, আর বুঝতেই পারলাম না আমি কী ছিলাম। সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু কোনো কাজ হল না। কোথায় আমি? কে আমি? আমি এমন একটা কিছু যে ঠিক পেছনের সিটে জেগে উঠল, আর বস্তায় ঢোকানো বেড়ালের মতো নিজেকে ঘুরিয়ে আতঙ্কের ভেতর ছুড়ে দিল। আমি কে?

অনেক পরে জীবন যেন আমার কাছে ধরা দেয়। দেবদূতের মতো নিজের নাম আমার কাছে এসে পড়ে। দুর্গ-দেয়ালের বাইরে ঢোল ভেঙে পড়ল আর এ পদক্ষেপ যা আমাকে রক্ষা করবে তা তাড়াতাড়ি দ্রুত দীর্ঘ সিঁড়িতে নেমে আসে। এই আমার আসা! এই আমি!

কিন্তু নঞর্থকতার নরকে পনেরো সেকেন্ড যুদ্ধের কথা ভুলে যাওয়া অসম্ভব, একটি প্রধান মহাসড়ক থেকে কয়েক ফুট দূরে যেখানে গাড়িগুলো তাদের আলো জ্বেলে পিছলে যাচ্ছে অতীতে।

ট্রান্সট্র্যোমারের নিকট কবিতা হল মিলিত হওয়ার জায়গা যা প্রধানত মুখোমুখি হতে সংযুক্তির দিকে মোড় নেয়। 'স্ট্রিট-ক্রসিং' কবিতায় পুরনো সুইডিশ পৃথিবী আর স্টকহোমের রাস্তার মুখোমুখিতার ইঙ্গিতধর্মী বর্ণনা:

রাস্তাটির প্রকাণ্ড জীবন আমার চারপাশে ঘুরছে;
তাঁর কোনো কিছুই মনে নেই কোনো কিছুরই ইচ্ছে নেই।
দূরে ট্রাফিকের সিগন্যালে, পৃথিবীর গভীরতা,
অজাতক বনানী অপেক্ষমাণ, স্থির, সহস্র বছরের জন্য।

মধ্য-পঞ্চাশে তিনি যখন প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন তখন নিছক প্রযুক্তিগত অনুপ্রবেশ ছাড়াই প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা লেখা সম্ভব ছিল বলে তিনি মনে করেতেন। কিন্তু এখন প্রযুক্তিগত সৃষ্ট অনেক উপাদান-আবহই প্রকৃতির অংশ হিসেবে কবিতায় আসে বলে তাঁর ধারণা। এবং তিনি নিশ্চিত যে তাঁর কবিতায় প্রযুক্তি ও তার সৃষ্ট উপাদান-অনুষঙ্গের আগমন ঘটে সার্থকভাবে। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি তাঁর কাছে কোনো কৃত্রিম প্রজনন নয়। তাঁর চিত্রকল্প আত্ম-উন্মেষকারী, স্বয়ংক্রিয়, যা তাঁর তাৎক্ষণিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাথে আশিষ্ট ও সম্পর্কিত। একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর কবিতার ডাচ অনুবাদককে নিয়ে ভস্টারসে তাঁর আবাসের কাছে এক বসন্তকালে যখন তিনি হাঁটছিলেন তখন লেকের ধারে একটি জীর্ণশীর্ণ শাখা-প্রশাখাবহুল চারদিকে

তাকিয়ে থাকা ওক গাছকে দেখিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'দেখো, যেন এক বৃদ্ধ ওয়েটার যে সবাইকে একসাথে আপ্যায়ন করাতে উৎসুক।' মুহূর্তে এই যে তাৎক্ষণিক উপমা-রূপক-চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষমতা, তা যেন এক মহান জাদুকরের কাজ, যিনি এক বৃদ্ধ ওক গাছকে নিমেষে বৃদ্ধ ওয়েটারে রূপান্তরিত করে ফেলেন।

'১৯৭২-এর ডিসেম্বরের বিকেল' কবিতার শুরুটা খুব গুরুত্বপূর্ণ :

এখানেই আসি আমি, হে অদৃশ্য মানব, সম্ভবত
কোনো এক মহৎ স্মৃতির দ্বারা নিয়োজিত, ঠিক এখনি বেঁচে আছে,
আর আমি
তালাবদ্ধ সাদা চার্চ অতীতের দিকে তাড়া করে
এক কাঠের সন্ত এখানে দাঁড়িয়ে
ঠিক হাসছে, অসহায়, যেন-বা তারা সরিয়ে নিয়েছিল
তাদের কাচগুলো।
সে একা। সবকিছুই এখানে, এখানে, এখানে।
মাধ্যাকর্ষণসূত্র
দিনে আমাদের কর্মে আর রাতে শয্যায়
চেপে রাখছে
এ-ই যুদ্ধ।

প্রথম দুই লাইনে আমাদের এ ধারণার প্রত্যয় হয় যে, টোমাস ট্রান্সট্রোমার শিল্পী হিসেবে বিশ্বাস করেন তিনি স্মৃতির ধারক। যখন স্মৃতিরা পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে চায় তখন তিনি কবিতা লেখেন। আর শিল্পের এই ধারণা ও অবলোকন আমেরিকান থেকে অনেক বেশি ইউরোপীয়। আমেরিকাতে শিল্পী নিজের জীবন সম্পর্কে সত্য বলাকেই তার কাজ হিসেবে মনে করে থাকেন। কনফেশনাল কবিতা এ-ই বলে। ট্রান্সট্রোমারের এ ধারণা রয়েছে যে শিল্পী যখন সচেতন হন তখনি মহৎ স্মৃতি হানা দিতে পারে। স্মৃতি তাঁর কাছে এমন এক অভিজ্ঞতা, যখন মনে হয়, কেউ তাঁর বাহুকে টেনে রাখছে আর তিনি কবিতা লিখতে চাচ্ছেন।

তাঁর কাব্যগ্রন্থের দশটি ভলিয়্যুমে দুইশ'র মতো পৃষ্ঠায় ধরা আছে ১২৮টির মতো কবিতা, যা লেখা হয়েছে ৩৫ বছর ধরে, ঠিক গড় হিসাবে বছরে সাড়ে তিনটি করে। কিন্তু তারা স্ফটিকায়িত, কেলাসিত গভীরতায় অতল হ'ত; তারা ঘনত্বের, মনোযোগের উচ্চতর ডিগ্রিতে হানা দেয় মনের ভিতর, আর স্মৃতিতে ঝলমল, মৃত নক্ষত্রের জেগে ওঠার মতো, স্মৃতিই যেন-বা আত্মীয়তা করে। 'স্মৃতিরা আমাকে পাহারা দেয়' কবিতায় তাঁর উচ্চারণ :

জুনের এক সকাল যখন জেগে ওঠার জন্য তা
খুব আগে আর ঘুমানোর জন্য এখনও খুব দেরি

আমি সবুজের ভেতর দিয়ে যাই যা স্মৃতিতে ঠাসা,
যা তাদের চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে।

তারা অদৃশ্য, আড়ালে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত
বিশুদ্ধ বর্ণাভ গিরগিটি।

তারা এতটাই কাছে যে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়
যদিও পাখিদের গান বধিরতাময়।

টোমাস ট্রান্সট্র্যোমারের কবিতাকে নিগূঢ় ও ব্যতিক্রমভাবে সত্যায়িত করতে গিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করার আর-এক ভাষা চলে আসে, জার্মানির অগ্রসর সমালোচক কার্ল হাইন্স বোহরা'র ভাষায় তা হল 'মুহূর্তের ইউটোপিয়া'। এর স্বরূপটি কী? সময়ের ইউটোপিয়া আর তাঁর ধরনটির একটি পাঠ আমরা পাব *সিক্রেটস অব দ্য ওয়ে* কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম কবিতাটিতে :

দিনের আলো ঘুমন্ত মানুষটির মুখে হানছে আঘাত।
তার ঘুম ছিল তীব্র
কিন্তু সে জাগল না
সূর্যের তীব্র অসহিষ্ণু রশ্মি দিয়ে
অন্ধকার এমন একজনের মুখে আঘাত করল
যে অন্যদের ভেতর দিয়ে যায়।

অঝোর বৃষ্টির মতো
তা ছিল হঠাৎ অন্ধকার।
আমি এমন এক কক্ষে দাঁড়ালাম যা প্রতিটি মুহূর্তকে ধরে আছে –
যেন এক প্রজাপতি জাদুঘর।
আর সূর্য এখন আগের মতোই শক্তিশালী
তার অসহিষ্ণু তুলি অনর্গল এঁকে যাচ্ছিল পৃথিবীকে।

এই ইউটোপিয়ার ধরনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব স্পেসীয় ইউটোপিয়া-উদ্ভূত ক্ষণস্থায়ী ইউটোপিয়া থেকে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিত্বের ইউটোপিয়া এবং চূড়ান্তে তা সময়ের বা মুহূর্তের ইউটোপিয়া হয়ে যায়। একই সময়ে এই সময়-মুহূর্ত রূপান্তরিত হয়, তার ধনাত্মক চার্জ কোনোমতেই আর স্বয়ংসিদ্ধ নয়। এটা হতে পারে মুহূর্তের প্রকাশ, কিন্তু তা ভয়ঙ্করেরও মুহূর্ত, পিশাচী মেডিউশার কোপ-দৃষ্টির নিষ্পেশন। এখানে আধুনিকতার নান্দনিকতা নিজেকে প্রকাশ করে নিটশের নন্দনতত্ত্বের সাথে সাথে মালার্মে ও বোদল্যেরকেও। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় মুহূর্তের ব্যাখ্যা টোমাস ট্রান্সট্র্যোমারের কবিতায় সুন্দরভাবে দৃষ্টান্তলাভ

করেছে। কিন্তু কোনো মুহূর্তের ইউটোপিয়াই সম্ভব নয়, যদি সেখানে না থাকে প্রাসঙ্গিক বিন্দু; আমাদের বাইরের সত্তার একটি স্থির প্রাসঙ্গিক বিন্দু, যাকে আমরা তুলনা করতে পারি। এই ভূমিকা, এক স্বর্গ হতে বিতাড়ন; শৈশবের শর্তায়নে টোমাস ট্রান্সট্রোমারের কবিতায় যাকে আলো-ছায়া ফেলতে দেখি, যা আত্মজৈবনিক সংস্পর্শের চেয়ে বড় বেশি প্রাকৃতিকতামণ্ডিত, প্রত্যক্ষময়। এ জন্যই অনেকে মনে করেন, তাঁর কবিতা একটি সরল অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির মৌল অবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় যেখানে জিজ্ঞাসার বা তৃষ্ণার সূত্র ধরা থাকে ‘Know Thyself ’ বা ‘আত্মানং বিদ্ধি’র মতো দর্শনের আত্ম-কাঠামোতে:

> দুটি সত্য পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবমান। একটি আসে ভেতর থেকে
> অন্যটি বাহির হতে, এবং যেখানে তারা মিলে যায় সেখানে
> তোমার সুযোগ আছে নিজের দিকে তাকানোর।
> ঘটে যাওয়ার এই নোটিশ, উদ্যত তোমার চিৎকার:
> “বন্ধ করো!
> যেকোনো কিছু, যেকোনো কিছু, যতক্ষণ-না আর নিজেকে জানি।” [প্রস্তাবনা : অন্ধকারে দেখা]

প্রতিটি জিনিসে অদৃষ্টপূর্ব মুহূর্তের পুনরুদ্ধারময় কবিতার উত্তেজনা আমাদেরকে এই প্রগ্‌লভতা দেয় যে তিনি আমাদের গভীর অঞ্চলের কবি। ট্রান্সট্রোমারের কবিতা আমাদেরকে বাস্তবতার ভেতর ভাঁজ করা বাস্তবতা, সময়ের এক দিব্য কৌশলকে তার অধিগম্যতার মধ্যে নিজস্ব ও নতুন সৃজনায় উদ্বর্তিত করে। তিনি জাদুকরের মতো উন্মোচন করেন বাস্তবতার ভেতর লুকানো বাস্তবতার রুমাল।

পাঁচ.

ট্রান্সট্রোমারের কবিতা স্যুররিয়ালিস্ট কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় কোথায় যেন এক যোগসূত্র আছে পরাবাস্তবতার নিম্ন অভিঘাতের সাথে। আমেরিকান কবি নেসলি উলম্যান এক সময় বলেছিলেন যে, ট্রান্সট্রোমারের কবিতা তাঁকে রেনে ম্যাগরিটের ছবির কথা মনে করিয়ে। যেখানে অনুষঙ্গের স্বয়ংক্রিয়তা ভেঙে পড়ে এবং বিন্যাস তার বীক্ষণকে পরিবর্তিত করে দেয়, আমাদের কল্পনার পেশিকে নমনীয় করে দিয়ে অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসে। যেখানে বোধ হয় কবি পল-এলুয়ারের সাথে তাঁর সামীপ্য, যার কবিতা তিনি অনেক আগে পড়েছিলেন এবং ১৯৬৬ সালের দিকে লেখা একটি কবিতায় এলুয়ারের কথা এ জন্যই হয়তো তাৎপর্যপূর্ণ ভাবানুষঙ্গে আবির্ভূত হয়:

এলুয়ার কয়েকটি বোতাম স্পর্শ করলেন
আর দেয়াল খুলে যায় অবলীলায়
আর বাগানও নিজেকে দেখিয়ে দিল গোপনে
[শ্রদ্ধার্ঘ]

কিন্তু ট্রান্সট্র্যোমারের কবিতাকে কে পাহারা দেয়? শরীরের ভেতর শরীর, চিত্রকল্পের ভেতরে জেগে থাকা চোখ, প্রতীক-মূর্ছনা আর প্রাত্যহিকতার বস্তু-অনুষঙ্গের রূপক, এসব কিছুই তাঁর কবিতার দৌবারিক। তিনি আমাদেরকে এক নির্মল কৌণিকতা থেকে বস্তুকে অবলোকনের সুযোগ দেন, যেখানে সবকিছু একই ছাঁচে ঢালাই নয়। এবং এটাই হয়ে যায় তাঁর অন্যতম অসাধারণত্ব। তিনি মূল্যায়িত হন আত্ম-তাড়িত সেই বৈভবময় চিত্রকল্প-প্রতীক-রূপক-অনুসৃতি দ্বারা যার গোপন সঞ্চারণ আমাদেরকে গভীরতার মুহুর্মুহু সংকেত পাঠাতে শুরু করে। তাঁর কবিতার রহস্যময় ব্ল্যাকহোলগুলো আমাদের সামনে উন্মোচন করতে চায় যা, তা হল সেই কাব্যিক ভাষাঃ ' The seed is kicking inside the earth।' আর এভাবেই তাঁর কবিতা নিয়ে আসে এক 'মহাজাগতিক ইমেজ' যা সম্ভাবনার অনন্ত সোপানকে উন্মোচিত করে। এজন্যই কবিতার আনন্দমহল ও অন্তস্তরায়ণের গভীরতাকে উজ্জ্বলতর করে রাখার জন্য তাঁর কবিতার উপমা, প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্পগুলো, নিজেরা জায়গা বদলাতে শুরু করে এবং অন্তর্নিহিত ভ্রমণকে উদ্দিষ্ট করে রাখেঃ

শান্ত ঘর।
চাঁদের আলোয় আসবাবপত্রগুলো দ্রুত সরে পড়ার জন্য প্রস্তুত।
একটি সাজশয্যাহীন শূন্য অরণ্যের মাঝ দিয়ে
আমি আমার ভেতরে ধীরে হেঁটে যাই।

আর এভাবেই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে সামগ্রিকতার এক অভাবনীয় আধার, হোর্হে লুইস বোর্হেসের ভাষায় যাকে অলঙ্কারিত করা যায়- ' Into a music, a murmur of voice, and a symbol'.

তাঁর কাব্যগ্রন্থ *জীবিত ও মৃতের জন্য (For The living and The dead)*, যেখানে স্থান পেয়েছে সাম্প্রতিক কবিতাবলিসহ একটি গদ্যে লেখা স্মৃতিতর্পণ, যেখানে তাঁর স্বভাবজাত মুগ্ধতায় মিতাবেগে সযত্ন ভাষায় তুলে ধরেছেন সুইডেনে তাঁর শৈশবস্মৃতিকে। এই স্মৃতিকথায় তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন এক কৌতূহল-পরায়ণ, স্পর্শকাতর বালক হিসেবে যে প্রত্নতত্ত্ব আর কীটপতঙ্গে আগ্রহী আর স্কুল ও তার কর্তৃত্বপরায়ণ শিক্ষকদের ভয়ে ভীত। স্মৃতিকথা *Memories Look at me: A Memoir*-এর প্রথমেই তিনি উন্মোচন করছেন তাঁর ব্যক্তিসত্তার বর্ণনাভ দিগন্তের প্রকৃতিকে তাঁর সহযোগ দার্শনিকতায়:

> " My Life" Thinking these words. I see before me a streak of light. On close inspection it has the form of a comet,

> with head and tail. The brightest end, the head, is childhood and growing up. The nuclease, the densest part, is infancy, the first period, in which the most important features of our life are determined. I try remember, I try to penetrate there. But it is difficult to move in these concentrated regions , it is dangerous, it fells as if I am coming close to death itself. Further back, the comet thins out that's the longer part, the tail. It becomes more and more spares, but also broader. I am now far out in the comet's tail; I am sixty as I write this.

জীবিত ও মৃতের জন্য কাব্যগ্রন্থে কবি জীবনের বাস্তব উপাদানের শূন্যতার মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন আর বিপরীতে শক্তির ভেতর যে আশ্চর্যময়তা ও অঙ্গীকার-সম্বন্ধতা বিরাজমান, তাকে অগ্রগামী করতে চেয়েছেন। তিনি আলো ফেলতে চেয়েছেন দুটি ভিন্ন বলয়ে যারা কোনো না কোনোভাবে আলাদা থেকেও একাকার হয়, শেষ পর্যন্ত সংলাপ চালায় নিরিবিলিতে নিথরতার সাথে। তাঁর দীর্ঘকবিতা 'বাল্টিক্স'-এ তিনি বলেছেন:

> চেয়ে থাকি আকাশ, পৃথিবী আর সোজাসুজি সামনের দিকে
> আর শেষ পর্যন্ত মৃতদের উদ্দেশে লিখে যাচ্ছি দীর্ঘ চিঠি– সেই
> টাইপরাইটারে যার কোনো রিবন নেই, কেবল এক দিগন্তরেখা
> যেন শব্দরা আঘাত হানছে বৃথা আর কোনোকিছুই থাকছে না অবশিষ্ট।

আর এ কাব্যগ্রন্থে তিনি বলেছেন:

> যেন তারা ছিল অস্তিত্বহীন।
> কিন্তু তারা ফিরে আসবে।
> সহস্র হাতের পুরনো টেলিফোন একচেঞ্জের
> ক্রস-করা লাইনে ফিরে আসবে।

আর এভাবেই তাঁর কবিতা বেড়ে ওঠে, যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন স্মৃতিলেখায়: 'আর সবসময়েই আমি বেড়ে যাচ্ছিলাম। সেই শরৎ-প্রান্তিকে আমি ছিলাম ক্লাসের ছোটদের একজন, কিন্তু তারপরই হয়ে গেলাম লম্বাদের একজন। যত খারাপই আমি থাকি, যেখানে এক-জাতীয় সার চারাটিকে পল্লবময় হতে সাহায্য করছে।' স্মৃতিকথার সে সময়ের ভয়ানক অভিজ্ঞতার বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, তাঁর অস্তিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল 'অসুস্থতা'। পৃথিবী মনে হয়েছিল এক বিশাল হাসপাতাল। 'আমি দেখলাম আমার সামনে মানবসত্তার আত্মিক ও শারীরিক বিকৃতাবস্থা' ; আরো লিখছেন, 'আলো জ্বলে যায়, আর ভয়ানক মুখগুলোকে দূরে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু কখনো কখনো আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, আমার চোখের মণি ছোট হয়ে পড়ে, আর ভয়ানক মুখগুলো হঠাৎ করেই আমার ভেতর গুটাতে থাকে।' নিজ জীবনের এক সময়ের অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও সংক্রমণের বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন,

‘এসবই ঘটে নীরবতায়, যদিও তার ভেতর-স্বরগুলো ছিল অন্তহীনভাবে ব্যস্ত। আমি ছিলাম ভূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমি নিজেই ছিলাম ভূত। একজন ভূত যে প্রতিদিন সকালে হেঁটে স্কুলে গিয়ে গোপনতাকে প্রকাশ না করেই স্কুলের পাঠ গ্রহণ করত’। সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, তখন সকল ধর্মাচরণের প্রতিই তিনি সন্দেহপ্রবণ ছিলেন এবং কোনোরকম প্রার্থনাও তিনি করতেন না। এই সংকট আসার কয়েক বছর পর রিভেলেশানের মতোই তিনি অভিজ্ঞতায় পরিণত করেন যা ছিল সিদ্ধার্থের চার মুখোমুখিতা-সংক্রান্ত (এক: একজন বৃদ্ধের সাথে, দুই: রুগ্ণলোকের সাথে, তিন: এক মৃতদেহের সাথে, চার: একজন ভিক্ষুকের সাথে) অভিজ্ঞতার মতোই এক আত্মোন্মেষময় অর্জন। তখন তিনি আবিষ্কার করেন যে ধর্মীয় বর্ণাঢ্য বর্ণনা তাঁর ভেতর সহজলভ্য নয়, বরং কোনোরকম প্রার্থনা ছাড়াই সাংগীতিক মন্ত্রায়নের দ্বারা ভূত-গ্রস্ততা হতে উদ্বর্তন সম্ভব। আর এ জন্যই তিনি সে-সময় পূর্ণ আন্তরিকতায় পিয়ানো বাজাতে শুরু করেন। অন্ধকার হতে কীভাবে তিনি আলোময় জগতে এগিয়ে যান, তার ইঙ্গিত-প্রতিম উপলব্ধির এক যথার্থ বর্ণনা আমরা পাই আত্মকথার উপসংহার-প্রান্তিকে: শীতকাল শেষ হয়ে যায় আর দিন দীর্ঘ হতে থাকে। এখন আশ্চর্যজনকভাবে, আমার জীবনের অন্ধকার উবে যায়। এটা এমন ধীরে হয় যে আমি তা মন্থরভাবে হলেও সম্পূর্ণরূপে বুঝে ফেলি, কী ঘটেছে। এক বসন্তসন্ধ্যায় আমি আবিষ্কার করে ফেলি যে আমার পূর্বের সব ভয় এখন প্রান্তিক পর্যায়ে। বন্ধুদের সাথে একত্রে বসে দার্শনিকতায় আলোড়িত হই আর সিগার টানতে থাকি। এটা ছিল ধূসর বসন্তরাতে হেঁটে ঘরে ফেরার মতো সময় আর আমার মোটের ওপর এমন কোনো অনুভূতিই ছিল না সেখানে ভয়ানক মুখগুলো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। স্মৃতিলেখার সবশেষে উপসংহার টানতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতাকে তিনি এভাবে উপ-সংজ্ঞায়িত করেন : still, it is something I have take part in possibly my most important experience. But it came to an end. I thought it was inferno but was purgatory.

ছয়.

দ্য ট্রুথ ব্যারিয়ার কাব্যের ‘অ্যাট ফানচাল’ কবিতায় ট্রান্সট্রোমার বলেন, ‘কোনো মানুষই দ্বীপ নয়’, আবার *বেলস অ্যান্ড ট্র্যাক্স* কাব্যের ‘আনডার প্রেসার’ কবিতায় তিনি লেখেন, বড় নৌকাটি থেকে বেরিয়ে আসে ছোটো নৌকাটি। দেখা যায়, ট্রান্সট্রোমারের (জন্ম : ১৫ এপ্রিল ১৯৩১, সুইডেন) কাব্যসত্তার উত্থানপর্বে যে অপরিস্ফুট সংকেতের

ছায়াপাত লক্ষণীয়, তা হল, সত্তার বিকাশে দ্বান্দ্বিক মনোমুখিতার উপযোজন যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলয় থেকে উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং সম্ভবত, পরবর্তী সময়ে তার কাব্যবৈশিষ্ট্যের এক নিবিড় ভাবসূত্রকে উন্মোচন করেছিল। একটি জীর্ণ-বিবিক্ত চতুর্দিকে প্রসারিত ওক গাছকে ট্রান্সট্রোমার এক বৃদ্ধ ওয়েটারে চিত্রকল্পায়িত করেছিলেন যে-সবাইকে পরিবেশনে ছিল সচেষ্ট। শূন্যতার ভেতর, পৃথিবীর অতিক্রান্ত সময়ের ভেতর বর্তমানে বাক্‌রহিত ট্রান্সট্রোমার কী এরূপ এক প্রতীক বা রূপক হয়ে আছেন? তাঁর কবিতা রূপকের ভেতর রূপক আর চিত্রকল্পের ভেতর চিত্রকল্পের অনন্য জাগরণের মতো ওঠা-বসা করছে যেখানে: 'পাহাড়ের ওপর নীলসমুদ্র আর নীল আকাশ ধরাধরি করে আছে,' আর তিনি 'রংধনুর স্তব্ধতায়' শূন্যের দিকে প্রার্থনার মতো বসে থাকেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত ধীর-সম্মিলিত-দাঢ্য-রূপক-প্রবাহ মনের এমন এক অবস্থাকে উন্মোচিত করে যেখানে 'গুনটানা নৌকা মরচেপড়া দাগবিশিষ্ট। এত অন্ত র্দেশে এখানে তা কী করছে?/তীব্র ঠাণ্ডায় এই এক বিশাল নির্বাপিত বাতি/ কিন্তু বৃক্ষদের রয়েছে বুনো রং: অন্য এক সৈকতের সিগন্যাল।' কী আছে তাঁর কবিতায়? যদি আবারও প্রশ্ন করি তবে পুনঃ পেয়ে যাই সেই আলোকিত নির্বিকল্প পঙ্‌ক্তি-মালা যা আমাদের অন্যভাবে জাগায়:

গভীরতার সেই সব কালো ফোঁটা ফোঁটা বিন্দু
কখনো-বা আত্মার ভেতর শোষিত
যা আমাদেরকে এক স্বাস্থ্যবান ধাক্কা দেয় আর বলে: যাও!
আমাদের চোখ মেলে দেওয়ার এ-এক নিবিড় সাহস জোগায়।

[কালো কফি]

‘পুরান ঢাকা’ বনাম নতুন ঢাকার ‘উত্তরা’

সু রা ই য়া জা বী ন

একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে হয় তাতে খাদ্য ও বস্ত্রের পরেই আসে বাসস্থান বা ‘বাসযোগ্য স্থান’। প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রাণীর ‘বাসযোগ্য স্থান’ বিভিন্ন রকম। যেমন– বন্য শৃগালের জন্য প্রয়োজন অন্ধকার, কারণ– সে দিনে ঘুমায় এবং রাতে খাদ্যসন্ধানে বের হয়। তাই তার গুহাটি যত অন্ধকার ও গভীর হবে ততই তার জন্য ‘বাসযোগ্য’ হয়ে উঠবে। এভাবে ‘মানুষ’ নামক প্রাণীটিরও থাকবার স্থানটি ‘বাসযোগ্য’ হতে কিছু বিশেষত্ব প্রয়োজন। সেগুলো হল–

১. রবিরশ্মি বা সূর্যের আলো
২. বাতাস
৩. পানি
৪. প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য
৫. মানুষ

ফলে মানুষ তার আবাসের স্থানগুলোকে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করে এমনভাবে যেন উপরের এই চারটি বিষয়কেই ধারণ করা যায়। অবশ্য ধারণ করার পদ্ধতিগুলো হয় ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের দেশের Context-এ মানুষ ঘরের দক্ষিণে জানালা কাটে বসন্তের হাওয়ায় অবগাহন করতে। উঠান, বারান্দা আর বড় বড় জানালা দিয়ে ধরে সূর্যের আলোকে। বাড়ির এক কোণে বাগান তৈরি করে ডেকে আনে পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি। সাথে বিভিন্ন ঋতুতে বর্ণিল ফুল আর সুবাস তৈরি করে বাড়ির ‘Genre’ বা ‘Mood’। বাড়ির এই ‘মেজাজ’ বা ‘আবহে’র সাথে বাড়িটির নির্মাণ উপাদানগুলোর রং ও ‘টেক্সচার’ যুক্ত করে আরেক মাত্রা। সময় ও ঋতুভেদে পরিসরে এই আলো-ছায়া ও তার বর্ণের পরিবর্তন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও গন্ধের পরিবর্তন বাড়ির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর এই সবগুলো মাত্রা মিলে তৈরি হয় ‘space’-এর ‘experience’ এবং ‘experience’গুলো জমে জমে তৈরি করে ব্যক্তির

‘স্মৃতিপট’। ব্যক্তির শৈশবের দৈনন্দিন জীবনের সঞ্চয়ই প্রকাশ পায় তার কর্মময় জীবনজুড়ে।

এবার আসা যাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ‘মানুষ’-এ। মানুষ সামাজিক জীব তাই তার কাছাকাছি থাকতে হয় নানান রকম মানুষকে। যেমন– ‘কাছের মানুষ’, ‘মাঝের মানুষ’ আবার ‘দূরের মানুষ’কেও প্রয়োজন হয় তার কাছাকাছি থাকার। এইসব মানুষদের ধারণ করতে মানুষ তার আবাসে তৈরি করার চেষ্টা করে তিন ধরনের স্পেস–

১. প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত স্পেস

২. সেমি-প্রাইভেট স্পেস

৩. পাবলিক স্পেস

১. প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত স্পেস

যা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। পরিবারের অন্যরাও যেখানে প্রবেশ করে অনুমতি সাপেক্ষে। যেমন– শোবার ঘর।

২. সেমি-প্রাইভেট স্পেস

এই স্পেসে প্রতিবেশী, স্বল্প-পরিচিত ও অনাত্মীয়রাও অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশাধিকার পায় এবং ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্পেসের বাইরে এসে বাড়ির এই সেমি-প্রাইভেট স্পেসটিতেই করে গল্প-গুজব, আলোচনা, পারিবারিক সকল কর্মযোগ ও ব্যবস্থাপনা।

৩. পাবলিক স্পেস

এটি যদিও ‘বসতবাড়ি’র বাইরের স্পেস তবু এই বৃহত্তর স্পেসটি (যেখানে সমাজের পরিচিত, অপরিচিত সকল মানুষের বিচরণ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার ‘ক্ষুদ্র’ বসতবাড়িটিকে ‘বাসযোগ্য স্থানে’ পরিণত করতে। মূলত ‘পাবলিক স্পেস’-এর ছাঁচ কেমন হবে তার ওপরই নির্ভর করে তার বাড়ির ‘নিরাপত্তা’ যা বাসযোগ্যতার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আর এভাবেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক চাহিদা মেটাতে এই চারটি উপাদান নিয়েই যুগ যুগ ধরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমে প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ থেকেই গড়ে উঠেছে ‘Indigenous city’গুলো। বুড়িগঙ্গা নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা আমাদের পুরান ঢাকাও এরকমই একটি ‘স্বতঃস্ফূর্ত নগরী’, যেখানে তার ছোট ছোট এককগুলো বা ‘বাসা’গুলো ভীষণভাবে মানবিক।

মূলত এই চারটি প্যারামিটারের ভিত্তিতে দুটো নগরীর তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করব কেন পুরান ঢাকা এখনও নতুন আর কেনই-বা নতুন শহর ‘উত্তরা মডেল টাউন’ প্রাণহীন। আর প্রাণহীন একটা শহরের পরিণতিই-বা কী হতে পারে।

পুরান ঢাকা

পুরান ঢাকার একটি typical বাড়ির প্ল্যান এবং সেকশন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রথমেই বাড়ির 'ব্যক্তিগত স্পেস'গুলোকে ঘিরে থাকে একসারি বারান্দা-জাতীয় স্পেস। এরপর বারান্দান্তর দিয়ে ঘেরা 'প্রাইভেট' বা ব্যক্তিগত স্পেসগুলো সজ্জিত থাকে বাড়ির কোনো উঠান বা আঙ্গিনাকে ঘিরে, যেটা পরিবারটির 'সেমি-প্রাইভেট স্পেস' হিসেবে কাজ করে।

'ব্যক্তিগত স্পেস'-কে ঘিরে এই বারান্দাবলয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি স্তর যা একইসাথে ব্যক্তির প্রাইভেসিকেও নিশ্চিত করে, আবার ঘরের ভেতরে আলো ও বাতাসের প্রবাহ ও ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্যপট বা ভিউকেও নিশ্চিত করে। বাইরে থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে বারান্দাবলয়টির কারুকার্যময় জালিকা, যা প্রথমেই চোখকে আটকে দেয় ও আড়ালে পড়ে যায় ভেতরের প্রাইভেট স্পেসটি। ফলে ভেতরের স্পেসটির দরজা, জানালাগুলো সারাক্ষণই খোলা রাখা সম্ভব হয়, ফলে সারাক্ষণ আলো ও বাতাসের প্রবাহ ঘরের আবহাওয়াটিকেও করে আরামদায়ক। আবার ব্যক্তি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এই বারান্দাবলয়ে দাঁড়িয়েই অংশ নিতে পারে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বা পাশের বাড়ির বারান্দাবলয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তি বা একদম রাস্তায় দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতায় বা কুশলবিনিময়ে। ফলে সে 'ব্যক্তিগত স্পেস'-এ থেকেও কখনোই পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

এরপর পরিবারের সকল ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত বলয় থেকে বেরিয়ে জড়ো হয় তাদের পারিবারিক 'সেমি-প্রাইভেট স্পেস' বা উঠানটিতে। তাদের সকল পারিবারিক কর্মকা -গু ও আলাপচারিতায় মুখর থাকে এই স্পেসটি। সাধারণত বাড়িগুলোতে ২টি করে উঠান থাকে। একটি উঠান সংযুক্ত থাকে বর্হিবাটির সাথে যেখানে পরিবারের বাইরের পরিচিত পুরুষসদস্যরা অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারে এবং এই উঠানটি আশেপাশের প্রতিবেশীদের 'সেমি-প্রাইভেট' স্পেসগুলো ও বারান্দাবলয় থেকেও দৃষ্টিসীমায় সংযুক্ত থাকে। ফলে এই পারিবারিক উঠানে দাঁড়িয়েও ব্যক্তি তার প্রতিবেশীদের কুশল বিনিময় ও খবরাখবর সেরে ফেলেন। প্রয়োজনে এগিয়ে যান একে অপরের বিপদে। অপর উঠানটি সংযুক্ত থাকে অন্দরমহলের সাথে যেখানে পরিবারের বাইরের পুরুষরা প্রবেশাধিকার পান না কিন্তু মেয়েরা অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশাধিকার পান। এই উঠানটি পরিবারটির একান্ত ব্যক্তিগত উঠান এবং এটি প্রতিবেশীদের দৃষ্টিসীমায় সংযুক্ত থাকে না।

মহল্লার বাড়িগুলোর কোনো না কোনো অংশ এভাবে পরপর দৃষ্টিসীমায় সংযুক্ত থাকে বলে পাড়ার একপ্রান্তে কারো বিপদ ঘটলে খুব দ্রুত খবর পৌঁছে যায় অন্য প্রান্তে , ফলে প্রতিবেশীরাও খুব দ্রুত এগিয়ে যান অন্যের বিপদে, এমনকি পারিবারিক বা আর্থিক সংকটেও প্রথম হাত বাড়িয়ে দেন তার প্রতিবেশীরাই। আর এভাবেই গোটা

অবকাঠামোগত সিস্টেমটি নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তার, যা মানুষের সুস্থ জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

এরপর আলো-বাতাস বণ্টনের অনুপাতটিও লক্ষ করলে দেখা যাবে যে 'সেমি-প্রাইভেট' উঠানগুলোতেই রবিরশ্মির হার সবচেয়ে বেশি, ফলে উঠানকোণের তরুলতার সাথে রবিরশ্মির আলোছায়ার খেলা ও নাটকীয়তাও এ স্থানটিতেই সবচেয়ে বেশি, যা মানুষকে আকৃষ্ট করে, বের করে আনে তার বক্তি-কোণ হতে। মুখর হয়ে ওঠে উঠানটি। প্রতিনিয়ত এই মানবিক প্রাণসঞ্চারণের কারণেই পুরান ঢাকা আজও নবীন। নদীর সাথে তাল রেখে রাস্তাগুলো চলে গেছে মৃদু বাঁক নিতে নিতে, ফলে প্রতিটি বাঁকের শেষে দৃষ্টিসীমায় নতুন নতুন চমক। একেকটি প্লটের আকার-আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, কেউ কারো সাথে 'Orthogonal Grid'-এ না থাকাতে একই সময়ে একেক বাড়ির উপর আলো পড়ছে একেকভাবে। ফলে একই জায়গা, একই দৃশ্য– কিন্তু প্রতিদিনই যেন নতুন। প্রতিটি বাড়িই যেন আলাদা আলাদা গল্প। রাস্তার দু'ধার জুড়ে একতলাতে দোকান-পাট, কারখানা, দোতলাতে থাকবার ব্যবস্থা। দোকান-পাটগুলো একইসাথে নিশ্চিত করছে অধিবাসীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং 'সোশ্যাল সারভেইলেন্স'-এর। ফলে কোনো অচেনা লোক এলাকায় ঢুকলেই দৃষ্টিগোচরে আসছে এলাকাবাসীর। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে কোনো আক্রমণই প্রতিহত হচ্ছে এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়– যা কিনা নতুন ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলোতে একেবারেই দুর্লভ।

উত্তরা মডেল টাউন

এবার দেখা যাক 'উত্তরা মডেল টাউন'-এ বাড়িগুলো পূর্বোক্ত চারটি বিষয়কে কিভাবে ধারণ করছে।

১. সূর্যের আলো

ধরে নেই পুরো মডেল টাউন জুড়েই সর্বোচ্চ 'consumption' হয়ে গেছে। প্রতিটি প্লটেই অনুমোদিত সর্বোচ্চ তলা পর্যন্ত বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে। দেখা যাবে যে, পুরো উত্তরা মডেল টাউনটি যদি একটি লোভনীয় থকথকে কেক হয় তবে বাড়িগুলো যেন সমান, সমান্তরালভাবে কাটা কেকের টুকরো। কোনোরকমে ন্যূনতম সেটব্যাক ছেড়ে বাড়িগুলো উঠে গেছে লাইনের পর লাইন। সারিবেধে বাড়িগুলোর উপরের ২টা তলা পর্যন্ত রবিরশ্মি পৌঁছালেও নিচের ৪/৫টা তলাতে কোনো ন্যূনতম রবিরশ্মিও পৌঁছাচ্ছে না, আলোছায়ার খেলা তো বহু দূরের বিষয়। অর্থাৎ বাসযোগ্যতার প্রথম শর্তটিই ভয়ংকরভাবে অনুপস্থিত।

২. বাতাস

বাতাসটা হয়তো কোনোভাবে অলি-গলি দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঢুকে যেতেও পারে, তবে খোলা জানালার প্রাণজুড়ানো দমকা হাওয়ার রোমাঞ্চ আর ইঁদুরের গর্তে কোনোরকমে অক্সিজেন সঞ্চালন এক জিনিস নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্তটিও প্রবলভাবে ব্যাহত।

৩. প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য

উত্তরা ফেজ-১-এর এলাকাগুলোতে কিছু গাছ-পালা এখনো দেখা যায়, কারণ মাস্টার প্ল্যান-এ গাছের জন্য কিছু জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং প্লটমালিকেরাও নিজস্ব প্লটে কিছু গাছ লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উত্তরা ফেজ-২-তে এসে বাজার অর্থনীতির চাপে কিছু বড় রাস্তা বাদ দিয়ে 'সেকেন্ডারি' রোডগুলো থেকে গাছের লেয়ারটি হয়ে গেল আরও চিমসে, যেখানে কোনো গাছই লাগানো সম্ভব না, আর কোথাও কোথাও ওই রুগ্ণ স্তরটিও হয়ে গেল গায়েব। কারণ গাছ লাগিয়ে জায়গা নষ্ট না করে দুইটা প্লট বেশি আঁটাতে পারলে রাজউকের ঘরে ২টা পয়সা বেশি আসবে। বাকি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল রিয়েল এস্টেট সেক্টর। প্রতিটি কেকের টুকরোকে আরও টুকরোয় ভাগ করে নিবেদন করল 'consumer'-এর সেবায়। ব্যক্তিমালিকানার প্লটে বাড়ির সামনে ২/১টি রুগ্ণ গাছ দেখা গেলেও ডেভেলপারের প্লটে একেবারেই নয়। কারণ বাজার-অর্থনীতিতে এর জন্য ছাড়া 'space' ডেভেলপারকে 'square feet' হিসেবে কোনো অর্থ এনে দেবে না।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, যে– কোটি টাকা খরচ করে কেনা কেকের টুকরোয় বা অ্যাপার্টমেন্টের space-এ নাই কোনো genre বা mood, যা হয়ে ওঠে না কোনো experience। যা আছে তা হল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার (দিনের বেলায়ও), চরম বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি বা 'boredom' যা উস্কে দেয় ফ্র্যাস্টেশনকে, ত্বরান্বিত করে মনোবৈকল্যকে।

এবার দেখা যাক 'উত্তরা মডেল টাউন' মানুষকে কিভাবে ধারণ করছে। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি ধরেই শুরু করা যাক।

পুরনো সেই দিনের কথা
ভুলবি কি রে হায়
ও সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায়।

....

মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি
দুলেছি দোলায়
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি
বকুলের তলায়।

ধরি A ও B দুই বন্ধু। তাদের যখন বসিয়ে দেয়া হয় কোনো নদীর পাড়ে, তাদের গল্প বা 'প্রাণের কথা' বাঁধভাঙা নদীর মতোই বেরিয়ে আসে। আবার এই দু'জনকেই যখন স্থাপন করা হয় কোনো শপিংমলের 'ফুড কোর্টে'– তাদের 'প্রাণের কথা'র দশা হয়ে যায় শীর্ণ খালের মতো (সাথে মৃদু অস্বস্তি, দু'জনের ট্যাঁকের অবস্থা সমান না-ও থাকতে পারে!) আর যদি কমিয়ে দেয়া যায় রবিহীন বিজলি-আলোকিত Living room-এ–রবি-উষ্ণতার অভাবে 'প্রাণের কথা'র অবশেষটুকু শীতল হয়ে বরফটুকরোয় পরিণত হয়েছে। আর তাই তো 'প্রাণের কথা' বলার 'প্রাণের বন্ধু' হয়ে উঠতে context বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এতটা জরুরি। স্থাপত্যের পরিভাষায় আমরা যাকে বলি 'Interaction space'।

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ধানমন্ডি লেক, রবীন্দ্র সরোবর এই 'Interaction space'-এর দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু উত্তরায় সুদীর্ঘ একটি লেক ও কতিপয় মাঠ থাকা সত্ত্বেও তারা 'Interaction space'-এ পরিণত হয়নি। মানুষকে জায়গাগুলো টানে না। না- টানার পেছনে আবারও সেই একই কারণ বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি, 'boredom'।

ধানমন্ডি লেকের সর্পিল গতিপথের কারণে প্রচুর 'পকেট-স্পেস' তৈরি হয়েছে, ফলে আড্ডার অনুকূল 'স্পেস'-এর সংখ্যাও অনেক। আর বারবার বাঁক পরিবর্তনের ফলে তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যময়, অগণিত 'Vista' বা 'view', যার ফলে লেকপথে হেঁটে যাওয়াটা হয়ে ওঠে একটি 'experience'। এই 'Vista' এবং 'experience'গুলো মানুষের প্রাণের খোরাক। আর এর লোভেই তো দুর্গম পাহাড়ি পথে ছুটে যায় ট্র্যাকাররা।

বলাই বাহুল্য, উত্তরা লেকের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর 'সিঙ্গেল ডিরেকশন'-এ পথচলা উপরোক্ত সকল সম্ভাবনাকে স্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করেছে।

পরিশেষে ঘটনাটি দাঁড়াল এই যে, পুরো 'উত্তরা আদর্শ নগরী' চষেও মানুষকে প্রাণের খোরাক যোগায়– এমন পাবলিক স্পেস পাওয়া গেল না, সেমি-পাবলিক স্পেসও পাওয়া গেল না। আলাদা আলাদা formal living, family living উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও।

এবার চলে যাওয়া যাক একেবারে ব্যক্তির 'ব্যক্তিগত স্পেস'-এ। একে bedroom না বলে 'শয়নগুম্ফ' বলাই ভালো। কারণ আচরণে তা 'শৃগাল' গুম্ভেরই সদৃশ। A/C নিয়ন্ত্রিত মেকানিক্যাল বাতাস আর 'সারাবেলা বন্ধ জানালা...' (কারণ

জানালা খুললেই পাশের বাড়ির bedroom, toilet-এর high window বা A/C outdoor unit অথবা set back-এ জমানো ময়লা)। সব মিলিয়ে ব্যক্তির শয়নগুম্ফের পরিবেশগত ছাঁচ তার একজন সফল শৃগাল হয়ে ওঠার পথটাই সহজ ও মসৃণ করে তোলে। অন্ধকারেই পথচলা, অন্ধকারকেই খুঁজে ফেরা। ঈশপের গল্পের 'শৃগাল-চরিত্র'গুলো মনে আছে তো? আর এভাবেই 'ব্যক্তিগত স্পেস'টি ব্যক্তির 'প্রাণসঞ্চারী' না হয়ে, হয়ে উঠতে পারে 'প্রাণ সংকীর্ণকারী' অথবা 'প্রাণ সংহারী'।

'Interactive public space'-এর অভাবে পাশাপাশি প্রতিবেশীও কেউ কাউকে চেনে না, একে অপরের বিপদে হাত বাড়ায় না, ফলে চরমভাবে বিপন্ন হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবতা। পুরো অবকাঠামোগত ছাঁচটি 'Individualistic' society তৈরির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে যার মূলমন্ত্রই হল 'ভোগ কর', 'আরও ভোগ কর', 'আরও ভোগ কর'– কোনো প্রশ্ন কোরো না। Neo-colonialization-এর একটি বড় mechanism হল অবকাঠামোগত প্ল্যানিংকে 'ম্যানিপুলেট' করা। তাই অবকাঠামোগত প্ল্যানিং-এ অযত্ন, অবহেলা গোটা সমাজ ও দেশের জন্যই মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

'উত্তরা মডেল টাউন'-এর মাস্টার প্ল্যানটি করার সময় প্ল্যানার এবং রাজউকের দেয়া অপরিণামদর্শী শর্টকাট সমাধানটি বাস্তবের মনুষ্যজীবনগুলোকে নির্মমভাবে আটকে ফেলেছে প্রাণহীন Orthogonal Grid system'এ। আবাসিক এলাকার জন্য যা কখনোই সমীচীন নয়। আরও ভয়ের বিষয় হল এই যে, গবেষণাহীন, শ্রমবর্জিত এই সমাধানটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে 'উত্তরা ফেজ-৩'-এও।

দিনের পর দিন 'মানুষের বসবাস অযোগ্য' negative পরিবেশে জীবনযাপন লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে মনোবৈকল্যের শিকার। সমাজকে এখনই কোনো উপায় ভেবে বের করতে হবে। 'Prevention is better than cure'। জ্ঞানী লোকেরা তো যুগ যুগ ধরে এই পরামর্শই দিয়ে এসেছেন।

বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য-জগৎ ও পর্যটনশিল্পের নতুন দিগন্ত

ফা র হা না র শী দ ত নু

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের দেশ। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয় জীববৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার রয়েছে এখানে। কিন্তু এই বিপুল সম্ভার অত্যন্ত দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে। খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সহজেই দেখতে পাওয়া প্রাণী বা গাছ পরিণত হচ্ছে দুর্লভ ও বিরল প্রজাতিতে। এর পেছনের কারণ কি কেবল জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি? অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও মাস্টার প্ল্যান এবং সেই সাথে আমাদের অসচেতনা ও নিয়ম-নীতিকে মেনে না চলা/পরোয়া না-করা বুড়ো আঙুল দেখানো বৈশিষ্ট্য কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য কোনো হুমকি, আর এগুলো যদি হুমকি হয়ে থাকে তাহলে স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয় বিষয়গুলোই-বা কী? আমার এইসব অদানাদার ভাবনা বা প্রশ্নগুলোকে একসাথে করে তার উত্তর খোঁজার এক ধরনের চেষ্টা মাত্র।

এবার আসি পর্যটন প্রসঙ্গে। সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ নতুন নতুন সৌন্দর্যের সন্ধানে ছুটে চলেছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। সেইসব ভ্রমণপিপাসুদের ছুটে চলা থেকেই ভ্রমণ ব্যাপারটা আজ এক শিল্পে পরিণত হয়েছে। পর্যটন শিল্প আজ অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়, বরং এই শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও পরিবৃদ্ধি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশের এই শিল্প বিকাশের যে ধারাবাহিকতা তাতে বেশিরভাগ টেকসই পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই কোনো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা না থাকায় এলাকাবাসী ও উদ্ভিদ-প্রাণী তথা পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। এলাকাবাসী হচ্ছে বাস্তু-উৎখাত এবং বিলুপ্ত হচ্ছে জীববৈচিত্র্য।

এরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে খাগড়াছড়ি জেলার আলুটিলা রহস্যসুড়ঙ্গ নামের পর্যটন এলাকায়। আজ থেকে বছর তিরিশ আগেও আলুটিলা ছিল বন্যপ্রাণীতে ভরপুর অরণ্য [তখনও রহস্যসুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়নি]। সেই অরণ্যের সাথেই ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহাবস্থান। রহস্যসুড়ঙ্গটি আবিষ্কারের পর ভ্রমণপিপাসুদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণে অপরিকল্পিত পর্যটনশিল্পের করাল থাবায় এলাকা উন্নয়নের নামে

আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে টেক্কা দেওয়ার জন্য দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার নামে শুরু হয় বন উজাড় ও একই সাথে বনায়নের নামে চলে মনো কালচার। যেগুলোর সবই কিনা পরিবেশের জন্য হুমকি। তার ফলেই আলুটিলা আজ জীববৈচিত্র্যশূন্য পর্যটন কেন্দ্র।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করেছে আলুটিলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রিছাং ঝরনা এলাকায়। রিছাং ঝরনার সন্ধান মেলে ২০০৯ সালে। এই ঝরনা স্রোতধারা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সাথে ঝরনা ও তার আশেপাশে পাহাড়-সবুজ-বন প্রতিদিন মনোহারি রূপের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের প্রবেশরাস্তা থেকে ঝরনা পর্যন্ত হেঁটে গেলে ঘণ্টাখানেকের পথ। আঁকাবাকা পাহাড়ি রাস্তা, বুনোলতা ঝোপ, বুনো ফুলেফুলে বাহারি প্রজাপতি, পাখির মধুর কলতান আবিষ্ট করে রাখবে পুরোটা পথ। একই পথে দেখা মিলবে মাচাং ঘরে বসে হুক্কায় টানরতা আদিবাসী বৃদ্ধা, কাঁধে সন্তান ঝুলিয়ে কাঁখে কলসি নেওয়া পাহাড়ি রমণী, বন থেকে কাঠ-ফল জোগাড় করে আনা পাহাড়ি সুঠাম পুরুষ অথবা পাহাড়ের জুমচাষরত পরিশ্রমী মানুষ, অথবা অনেক দূরে গভীর বন। নিদারুণ পরিশ্রম ও প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসায় বন-পাহাড়-বুনো জীব-আদিবাসী মানুষ একসাথে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বেঁচে আছে এখনও।

অথচ সেখানেও শুরু হয়ে গেছে পর্যটনশিল্পের নামে অপরিকল্পিত উন্নয়ন। অপরিকল্পিত স্থাপনা, দোকান-পাট, পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ধনের নামে সৌন্দর্যবিনাশ। তৈরি হচ্ছে পিচঢালা রাস্তা। গাড়ির উচ্চস্বরের হর্ন, দর্শনার্থীদের উচ্চস্বরের কোলাহল সুনসান পাহাড়ে অনেকটা তাললয়হীন সুর। এতে পাহাড়ি জনপদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সেই সাথে বুনো প্রাণীও ভয়ে তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল ছেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমরাও কি পারি না সরকার, নীতি নির্ধারকমহল ও আদিবাসী সম্প্রদায় সবাই হাতে হাত মিলিয়ে জীববৈচিত্র্যসম্ভারকে সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে? তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে জীববৈচিত্র্যশূন্য ভারসাম্যহীন পৃথিবী। অপরিকল্পিত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন অন্য কোনো সম্ভাবনাময় পর্যটনশিল্পে না ঘটে সেজন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্বসহ মাথায় রাখা প্রয়োজন তা হল–

* জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
* স্থানীয়/আদিবাসী সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ও সংরক্ষণ
* এলাকাবাসীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এলাকাবাসীর উন্নয়ন
* একই জায়গার বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে বিল্ডিং ফুট প্রিন্ট কমানো
* পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রীর ব্যবহার
* কমিউনিটি ট্যুরিজম।

পাহাড়ি জনপদে টেকসই (Sustainable) পর্যটনশিল্প কতগুলো পারস্পরিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিষয়গুলো একটি চার্টে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়ঃ

পর্যটন শিল্প	জীববৈচিত্র	আদিবাসী
পর্যটন শিল্পের আগে	আছে	আছে
অপরিকল্পিতভাবে পর্যটনশিল্প গড়ে ওঠার পর	নেই	নেই
পরিকল্পিতভাবে পর্যটনশিল্প গড়ে উঠলে	থাকবে	থাকবে

পর্যটনশিল্প গড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কোনো এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রেখে যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে। অর্থাৎ পর্যটনশিল্প যখন নেই তখন আদিবাসী ও জীববৈচিত্র্য, দুটোরই দেখা মেলে। কিন্তু প্রচলিত ধারায় পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয় এবং সেই সাথে হারিয়ে যায় জীববৈচিত্র্য। এ কারণেই পাহাড়ি জনগণ অনেক সময়ই চায় না নিজ এলাকায় পর্যটনশিল্প গড়ে উঠুক। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমনই একটি খবর 'ম্রো জনপদের ক্ষোভ....."

অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতিতে এই শিল্প বিকাশের কারণে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায় পর্যটনশিল্পের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে চাইলে আমাদের পরিকল্পনা পদ্ধতি কী হওয়া উচিত– এটাই এই আলোচনার মুখ্য বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে কিছু ডিজাইন ও প্ল্যানিং প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রস্তাবনাগুলো নিচে দেখানো হল–

আলুটিলার রহস্যসুড়ঙ্গ, সাংকসস বৌদ্ধমন্দির ও রিছাং ঝরনার অবস্থান খুব কাছাকাছি এবং প্রতিটি জায়গাই দর্শনীয় হওয়ায় পুরো এলাকাকে ট্যুরিজম ভিলেজ (Tourism village)-এর আওতায় আনা প্রয়োজন। পর্যটকরা যেন চাইলে আলুটিলা সুড়ঙ্গ থেকে রিছাং ঝরনা পর্যন্ত ট্র্যাকিং করে যেতে পারেন সেজন্য হাঁটার পথের (trail) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদেশি পর্যটকরা যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে এজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই সাথে সাংকসস বৌদ্ধমন্দিরে কঠিন চীবর দান ও পূর্ণিমার সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই মন্দিরের রাস্তা ধরে মেলা বসে। বছরে প্রায় চারবার এই মেলা বসে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নাটক, গান পরিবেশিত হয়। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এই সকল অনুষ্ঠান ও মেলার কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এতে পর্যটকরা যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের পাশাপাশি পাহাড়ি জনপদের কৃষি-কালচার সম্পর্কে জানতে পারবে সেই সাথে মেলায় অংশগ্রহণকারীরা ভ্রমণকারীদের কাছে তাদের ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্রগুলো বিক্রির মাধ্যমে একদিকে যেমন সেগুলোর প্রচার-প্রসার বাড়বে অন্যদিকে মেলাকে ঘিরে আয়ের পরিমাণটাও বাড়বে।

কিন্তু এই মেলাগুলো বসে মহাসড়কের ধার ঘেঁষে অপর্যাপ্ত জায়গায়। আর তাই দুর্ঘটনা মেলায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেজন্য মেলার জন্য নিরাপদ জায়গা প্রয়োজন। বছরের মাত্র ৪/৫ দিনে ব্যবহারের জন্য যদি বিশাল একটি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয় আর অন্য সময় যদি তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, পাহাড়ি অসমতল জায়গায় সেটিও কারও কাম্য নয়। সেক্ষেত্রে আলুটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যদি বৌদ্ধমন্দিরের পাশে সমতল জায়গায় স্থাপন করা যায় তাহলে মেলার সময় বিদ্যালয়ের মাঠে মেলা ও অন্যসময় এটি বাচ্চাদের খেলার জায়গা হিসেবে কাজ করবে। আবার স্কুলের বিশ্রামাগার টয়লেট মেলায় আগতদের ব্যবহারের সুযোগ দিলে আলাদাভাবে শৌচাগার বা বিশ্রামাগার স্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

আলুটিলা সুড়ঙ্গ এবং রিছাং ঝরনা দুটি জায়গাতেই গাড়ি প্রবেশ ও পার্কিং বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মহাসড়ক সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় গাড়ি, পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে পর্যটকদের নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়ে পার্কিং-এ গাড়ি রাখা যায়। গাড়ির গতি ও হর্ন যেহেতু পাহাড়ি মানুষ ও অন্যান্য জীবদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে সেজন্য মহাসড়ক থেকে ঝরনা পর্যন্ত ও মহাসড়ক থেকে সুড়ঙ্গ পর্যন্ত পুরো পথটিও হাঁটার পথ হওয়া উচিত।

গাড়ি থেকে নেমে প্রবেশমুখের কাছাকাছি টিকেট কাউন্টার ও তথ্যকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। তথ্যকেন্দ্রে গিয়ে যেন যে কেউ এই ট্যুরিজম ভিলেজ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য পেতে পারে। পুরো এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য, মানচিত্র, বন্যগাছ, প্রাণী, সংস্কৃতি, ম্যাপ সম্বলিত লিফলেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইডের ব্যবস্থাও জরুরি। এছাড়াও অন্যান্য তথ্যাদি যেমন– 'পলিব্যাগে সংরক্ষিত খাবার, মিউজিক সিস্টেম সাথে বহন করা যাবে না', 'মোবাইল ফোন সাইলেন্ট রাখতে হবে, ময়লা নির্দিষ্ট বিনে ফেলতে হবে', Trail অনুযায়ী চলার নিয়মাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পর্যটকদের যাত্রা শুরু করার আগে অবহিত করতে হবে। তথ্যকেন্দ্রের সাথে এলাকার জীববৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ছবি, ভিডিও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে কেউ পুরো এলাকাটি সম্পর্কে কিছুটা জেনে তার যাত্রাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

যে পথ দুটি দিয়ে মহাসড়ক থেকে ঝরনা পর্যন্ত ও মহাসড়ক থেকে সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছে সেই পায়ের দিকে সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পথটি হবে পায়ে হাঁটার

পথ। পথটি এমন হওয়া উচিত যাতে ভ্রমণকারীরা বুনো গাছ-প্রাণীকে বিরক্ত না করে তাদের সর্বাধিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। বর্তমানে পিচঢালা গাড়ি-রাস্তাটিকে কেবলমাত্র পথচারীদের জন্য রূপান্তর করা যেতে পারে এবং একটি মাত্র পথ/রাস্তা ব্যবহার না করে দুই-তিনটি আলাদা (Alternate) রাস্তা দিয়ে পথচারীদের ঝরনা পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু মহাসড়ক থেকে ঝরনা পর্যন্ত পৌঁছাতে এই পথগুলো দিয়ে যেতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগে। তাহলে অনেক ভ্রমণকারী একসাথে আসলেও ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে ভ্রমণ করলে সবাই একই সাথে ঝরনায় না-পৌঁছানোর কারণে ঝরনায় কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে না। আবার প্রতিটি পথের অভিজ্ঞতা একটি অন্যটির চেয়ে বেশি সুন্দর। পথগুলো বিভিন্ন ঋতুতে তাদের রং বদলায়। পাহাড়ি এই পথগুলোতে ভ্রমণ আরও সহজ করার জন্য জায়গায় প্রয়োজনমাফিক সিঁড়ির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেশি উঁচু ঢাল ও খাদের পাশের পথগুলোতে রেলিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রেলিং-এর বদলে ঝোপঝাড়ের গাছ লাগানো যেতে পারে। বর্ষায় পথগুলো যাতে বেশি পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনার কারণ না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তার নির্মাণসামগ্রী Biodegradable হলে ভালো।

একটানা পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথে চলাটা সমতলবাসী পর্যটকদের জন্য বেশ ক্লান্তিকর। পর্যটকরা তাদের এই সুন্দর যাত্রাপথে কিছুটা জিরিয়ে নিতে পারেন সেজন্য কিছুদূর পর প্যাভিলিয়ন তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে এসে ভ্রমণকারীরা একটু জিরিয়ে নেবেন, তৃষ্ণা মেটাবেন আর মুগ্ধ হয়ে দেখবেন পাহাড়ের সৌন্দর্য প্যাভিলিয়ন বা ছাউনিগুলো এমন জায়গায় হওয়া উচিত সেখান থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকৃতি

উপভোগ করা যায় এবং সেই জায়গাগুলোতে এসে মানুষ সচরাচর বেশি ক্লান্ত হয়ে যায়। এবার ঝরনার পানিতে অবগাহনের পালা। ঝরনায় ভেজা ও পাহাড়ি পিচ্ছিল ঢালে আছড়ে পড়ে ভ্রমণকারীদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে যাওয়াও নিত্যদিনের ঘটনা। তাই ঝরনার কাছাকাছি কোথাও চেঞ্জরুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসনের সেই সিঁড়িটি ঝরনা পর্যন্ত গেছে তাতে বিভিন্ন জায়গায় (Deck) পাটাতন যোগ করা যেতে পারে যাতে একটানা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে কেউ ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

পর্যটকদের অতি-উৎসাহের কারণে যাতে পাহাড়ি লোকজনের ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি পরিসরের স্বাভাবিকতা ব্যাহত না হয় সেজন্য প্ল্যানিং-এ ছোটখাট পরিবর্তন করা যেতে পারে। এজন্য পথচারীদের হাঁটার রাস্তা থেকে পাহাড়ি বাড়িগুলো যাতে সরাসরি ঢুকতে না-পারে সেজন্য সেরকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এখানে আসা ভ্রমণকারীদের সাধারণ পর্যটক, অভিযাত্রী, গবেষক ও ছাত্রছাত্রী এরকম কয়েকটা দলে ভাগ করতে পারি। প্রতিটি দলের ভ্রমণকারীদের ঘুরে বেড়ানোর ধরন ও উদ্দেশ্য আলাদা।

সাধারণ পর্যটকরা সাধারণত আরাম-আয়েশ করে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। কিন্তু অভিযাত্রী, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে দুর্গম প্রকৃতিকে জয় করাটাই মুখ্য, সেজন্য তারা যে কোনোভাবে থাকা-খাওয়ার কাজটা চালাতে পারে। এ কারণে এদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে সাধারণ পর্যটকদের জন্য আলুটিলার পাশে পরিত্যক্ত আদি ক্যাম্পে সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কটেজ তৈরি করা যেতে পারে। আর অভিযাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য রিছাং ঝরনা এলাকা স্কুলের স্থাপনাই রাতে থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে স্কুলের বেঞ্চগুলো জোড়া লাগিয়ে বিছানা তৈরি করা যেতে পারে। এমনকি স্কুলঘরেই পর্যটকদের জন্য আদিবাসী সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলো পরিবেশিত হতে পারে। খাবার জন্য একটি জায়গা দেয়া যেতে পারে যেটি কিনা অনেক ভ্রমণকারী আসলে তাদের থাকার জায়গা হিসেবে কাজ করবে। অথবা পাহাড়ি লোকদের বাসার সাথেই খাবার দোকান থাকতে পারে। এমনকি সুভেনির শপ, এগুলোও এখানে হতে পারে। যেখানে আদিবাসীদের পোশাক, গয়না অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিক্রি হবে। এই ঘরগুলোকেই রাতে পর্যটকদের থাকার জায়গায় রূপান্তর করা সম্ভব। আবার গবেষকদের গবেষণার জায়গা, লাইব্রেরি ও থাকার জায়গা একই হতে পারে।

এভাবে চাইলেই জায়গার বহুবিধ ব্যবহার করা সম্ভব এবং তাহলে বিল্ডিং ফুট প্রিন্ট কমবে। অপরদিকে প্রতিটি আলাদা আলাদা স্থাপনা তৈরি না করার কারণে খরচও অনেক কমে যাবে। নতুন স্থাপনা তৈরির জন্য স্থানীয় কারিগরি পদ্ধতিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী যেমন– বাঁশ, মাটি ইত্যাদিকে আধুনিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাহাড়ি জনগণ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রম চালু করলে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণীর ওপর এসব জায়গায় বিভিন্ন কর্মশালার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে পাহাড়ি জনগণ ও বিশেষজ্ঞরা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে হাতে-কলমে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। আবার দূরদূরান্ত থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণে আসা ছেলেমেয়েরা আদিবাসী শিশুদের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় করতে পারে। এভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়ন কিছুটা হলেও সম্ভব।

পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পাহাড়ি জনগণকে সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে একদিকে যেমন আত্মিকভাবে, সামাজিকভাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায় লাভবান হবে, তেমনিভাবে লাভবান হবে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

কেননা স্থানীয় লোকজনকে সম্পৃক্ত করলে জীববৈচিত্র্য বাঁচবে, ফলে দেশি পর্যটকদের গণ্ডি বাড়বে, আসবে বিদেশি পর্যটকও। তাছাড়া স্থানীয় জনশক্তি, স্থানীয় নির্মাণসামগ্রী, স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটালে নির্মাণ খরচও অনেক কমে যাবে। ফলস্বরূপ এলাকাটিতে টেকসই উন্নয়নও সম্ভব।

আর এভাবেই যথাযথ পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেই আলুটিলা রিছাং ঝরনা এলাকায় বায়োডাইভার্সিটি ঠরষষধমব গড়ে উঠতে পারে যা অন্যান্য সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে।

চি ত্র শি ল্প/ প্র ব ন্ধ

এস. এম. সুলতান : বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা

....

শ ও ক ত হো সে ন

শেষ পর্যন্ত শক্তিমানের বিজয় ঘটে এবং জনমত বিজয়ীর পক্ষে এসে একাত্ম হয়; ইতিহাস ধাবিত হয় শক্তিমানদের দিকে। বাঙালির অনন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাদের ভাষা-শক্তির স্বরূপ অন্যতম; এ-ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে, তবে যতদূর প্রমাণ মেলে তাতে মীননাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক। মীননাথ-এর কারণে সহজেই বোঝা যায়, বাংলাভাষা কতটা পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী। এ-ছাড়া হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে লেখা *চর্যাগীতি* কিংবা *ময়মনসিংহ গীতিকা* এ-ভাষাকে করেছে আরও শক্তিশালী। ঐতিহ্যিক এই শক্তিকেই এস.এম. সুলতান নিজের মননে শারীরিক ও মানসিক শক্তির আধার হিসেবে পুষ্ট করে তুলেছিলেন।

এস. এম. সুলতান বাঙালিকে বলশালী বা শক্তিমান রূপে দেখার মধ্যদিয়ে মূলত বিশ্ববাসীকে শক্তির পয়গাম হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর চিত্রশিল্পে। আজ

নিজেকে প্রশ্ন করি; আদিম বাঙালি মীননাথ কি রুগ্ন ছিলেন? নাকি সুলতানের কল্পনার মানসজাত স্বাস্থ্যশালী বলিষ্ঠ কোনো মানুষ ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় খানিকটা নৃতাত্ত্বিক পথে খোঁজখবর করবার চেষ্টা করে দেখা যাক–

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে হিন্দ-ইউরোপিয়ান (Indo-European), শামী (Semitic), হামী (Hamitic), দ্রাবিড় (Dravidian) প্রভৃতি নানাজাতীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পৃথিবীর প্রায় সকল শব্দ একই মূল হিন্দ-ইউরোপিয়ান শব্দ হতে উৎপন্ন'। পশ্চিম বাংলার প্রথাবিরোধী ভাষা-গবেষক কলিম খান তো বলেছেনই, পৃথিবীর সকল শব্দের মূল উৎস ভারতবর্ষ এবং সেটা সংস্কৃত (তথা পরবর্তীকালের বাংলা ইত্যাদি) থেকে। আর মীননাথ তো বাঙালি ছিলেন; দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন এবং যোগী সম্প্রদায় নাথ পন্থী ছিলেন; উল্লেখ্য আদিনাথ শিব, তার পরপরই কিন্তু মীননাথ-এর আবির্ভাব। নৃতাত্ত্বিক খোঁজ-খবর করে জানা যায় এরা বলশালী-সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত ছিলেন তিন দিক থেকে; শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং ভাষাগত দিক থেকে। শারীরিকভাবে শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন সেটা আদিকালীন পটচিত্র কিংবা গাজীর পটের মধ্যে বাঘের পিঠে মানুষ চড়ার দৃশ্য দেখে বোঝা যায়; তাছাড়া মাটিতে ফসল ফলানো, নদী বা সাগরে মাছ শিকার ইত্যাদি কাজ তো রুগ্ণ মানুষ দিয়ে সম্ভব নয়; অন্যদিকে যোগীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক উপায়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের মনের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা; সে-কারণে প্রাচীন-বাঙালি প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এবং প্রকৃতির সাহচর্যে যেমন বেঁচে ছিল একইভাবে নিজের মনস্তত্ত্বকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত; এমনকি ছোট-খাট অসুখ-বিসুখ তো বটেই বড় বড় অসুখ-বিসুখও সারিয়ে ফেলত তারা নিজের মনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে এবং এ্যাকুয়া প্রেসার-পদ্ধতির মাধ্যমে তারা এমন সব অসুখের চিকিৎসা প্রাচীনকালে অনায়াসে করত যা করার জন্য এখন বড় বড় হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারগুলোকে কাঁটাছেড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতসব কথা বলার অর্থ হল, শিল্পী এস. এম সুলতানের চিত্রের সঙ্গে আদি বাঙালির ঘনিষ্ঠতম মিল খুঁজে পাওয়া যায়; সুলতান তাঁর চিত্রে পেশির ভেতর দিয়ে, গোটা গোটা মাংসপিণ্ডের ভেতর দিয়ে, প্রশস্ত কপোল, বাহু, সুঠাম গ্রীবা, পীনস্তনী আদল, হাঁটু, তীক্ষ্ণ কনুই টানটান ঘাড়ের ভেতর দিয়ে প্রাচীন বাঙালির শারীরিক ও মানসিক সেই শক্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বদরবারের সামনে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা শুরু করে থাকেন গৌতম বুদ্ধের সমকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। এর কারণ সম্ভবত এই, তার আগের সময়ের মধ্যে আলোর তুলনায় অন্ধকারের পরিমাণটাই বেশি থাকায় সচরাচর আলোচনার মধ্যে সেই সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে বাঙালির কেবল

হাজার বছরের ইতিহাসের কথাই বলা হয়ে থাকে; ইতিহাসবিদগণ হাজার বছর আগের বাঙালি কী ছিল, তার রাজনীতি কী ছিল সেটা আলোচনায় উৎসাহী হয় না। সে-কারণে শিল্প-সাহিত্যেও সেই সময় নিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উহ্য থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল হাজার বছর পূর্বে কি বাঙালির রাজনীতি, সমাজনীতি ছিল না? অবশ্যই ছিল। এস. এম. সুলতান তারও একটি সমাধানের পথ টানতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ বাঙালির স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে; তাঁরই প্রচ্ছন্ন প্রতিকৃতিরা অপেক্ষামাণ আবার ক্ষমতায়নের ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে!

দুই.

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের ১০ তারিখ নড়াইলের মাছিমদিয়ায় এস,এম, (শেখ মুহম্মদ) সুলতানের জন্ম। দরিদ্র রাজমিস্ত্রী বাবার একমাত্র পুত্র সুলতানের ডাক নাম ছিল লাল মিয়া।

বাবাকে রাজমিস্ত্রির কাজে সহযোগিতা করার ফাঁকে খেলার ছলে ছবি আঁকতে শুরু করেন তিন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে নড়াইল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। ১৯৪১-তে অ্যাকাডেমিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও আর্ট কলেজে সুলতানের ভর্তির ব্যবস্থা হল; ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, তিন বছর কলকাতা আর্ট কলেজে সুলতান পড়াশুনা করলেন; প্রথম বছরে দ্বিতীয় ও পরবর্তী দু'বছর ক্লাসে প্রথম হলেন।

১৯৪৪-তে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা আর্ট কলেজ ত্যাগ করেন। কিছু কাল যত্রতত্র ভ্রমণের পর তিনি কাশ্মীরের পাহাড়ে একদল আদিবাসীর মাঝে বসবাস শুরু করলেন এবং চারপাশের মানুষ ও তাদের জীবন নিয়ে অনেকগুলো ছবি আঁকলেন।

১৯৪৬-তে কাশ্মীর থেকে সিম্‌লা গেলেন; সেখানে সুলতানের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে যান এবং পরে করাচিতে অবস্থান করেন। এ-সময় নাগী, চুগ্‌তাই, শাকের আলি, শেখ আহমদ প্রভৃতি শিল্পী ও পণ্ডিত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। একজন শিল্পী হিসেবে করাচিতেই প্রথম খ্যাতি লাভ করেন সুলতান।

১৯৪৮-এ লাহোরে প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়; ১৯৫০ : চিত্রশিল্পীদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য তিনি আমেরিকা গমন করেন। তখন নিউইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন, শিকাগো প্রভৃতি জায়গা ঘুরে বেড়ান এবং চিত্রপ্রদর্শনী করেন। এরপর ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। লন্ডনে বেশ কয়েকটি একক প্রদর্শনী করেন এবং কয়েকটি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। সে সময় তিনি ভিক্টোরিয়া এমব্যাকমেন্ট-এ অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট সমকালীন শিল্পীদের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, পাবলো পিকাসো, সালভেদর দালি, পল ক্লি,

ব্রাক প্রমুখের মতো খ্যাতিমান শিল্পীদের পেইন্টিং-এর পাশে এশিয়ান শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র সুলতান-এর ছবিই উক্ত প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের গৌরবের অধিকারী।"

১৯৫৩-তে জন্মভূমি তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের নড়াইলে ফিরে এলেন। গ্রামের শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলার শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন– নন্দনকানন প্রাইমারি স্কুল, নন্দনকানন হাই স্কুল ও নন্দনকানন ফাইন আর্ট স্কুল। এরপর ১৯৬৭-তে নড়াইল সদরে স্থাপন করলেন কুড়িগ্রাম ফাইন আর্ট স্কুল।

১৯৭৩-এ যশোর শহরে গড়ে তুলেন 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে যার নাম 'চারুপীঠ'।'

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সুদীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর সুলতানের এক চিত্রপ্রদর্শনী হয়।

১৯৮২-তে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সুলতানকে 'ম্যান অব এশিয়া' ঘোষণা করে।

১৯৮৭-তে সুলতানকে বাংলাদেশ সরকার 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স'-এর সম্মানে ভূষিত করে। ওই বছর ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজন করে সুলতানের একক চিত্রপ্রদর্শনী।

তিন.

আহমদ ছফা তাঁর 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য: সুলতানের সাধনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শেখ মুহম্মদ (এস. এম.) সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্টা পীনস্তনী এ-সকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সুজনলীলায় মত্ত, অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ-জাগানিয়া এ-সকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এ-সকল সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরোম তুলতুলে এ-সকল শুভ্র শান্ত ভোর, হিঙুল বরণ মেঘ-মেঘালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাঁকের নদীতীরের এ-সকল দৃষ্টি-শোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউ খেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাকা মেঠো পথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এ-সকল সরল আটচালা, এ-সকল আহ্লাদী বাছুর এবং পরিণতবয়স্ক গবাদি পশু, সর্বোপরি গোটা জনপদের জনজীবনে প্রসারিত উৎপাদন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকলারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-

ঘামের ঝঙ্কার, চেষ্টার সঙ্গীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশগঙ্গার কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়ছে।"

ছফা উপরিউক্ত কথাগুলো সুলতানের ছবি সম্পর্কে এমনিতে বলেননি, ছফাও একজন সিরিয়াস জীবনদর্শী মানুষ হিসেবে আরেকজন বহুসিঁড়ি-ভাঙা সুলতানকে দেখেছেন এভাবে, "সুলতানকে বাঙলার প্রকৃতিতে, বাঙলার ইতিহাসে এবং বাঙলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং শিল্পী জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তা-ও কম বিস্ময়কর নয়।"

শিল্পবোদ্ধা, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিক আহমদ ছফার মতে, 'গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লেগেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার একটা দুর্বার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাহিদা : জাতীয় সাহিত্য চাই, জাতীয় বিজ্ঞান চাই, জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাণিজ্য চাই।' ছফার এই উক্তির দাবি অনুসারে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে জাতীয় শিল্পের প্রয়োজন অনেকটাই পূরণ করেছিলেন দু'জন বাঙালি মুসলিম শিল্পী; এদের একজন হলেন জয়নুল আবেদীন আর দ্বিতীয় জন এস.এম. সুলতান। এখানে 'মুসলিম' শব্দটি উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি না-শেখা, পশ্চাৎপদ, ধর্মান্ধ একটি জাতি হিসেবে মুসলমানের পক্ষে অন্যান্য শিল্পের মতো চিত্রশিল্পেও মানুষের অস্তিত্বের জানানকে স্বার্থক করে ফুটিয়ে তোলা– সেই সময়ের জন্য নিঃসন্দেহে ছিল বিস্ময়কর; যা অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করে দেখিয়েছেন জয়নুল ও সুলতান। তবে সার্বিক বিচারে উল্লেখ্য যে, 'নন্দলাল বসুই প্রথম ব্যক্তি যাকে প্রকৃত অর্থে সার্থক বাঙালি চিত্র-শিল্পীর শিরোপা দেয়া যেতে পারে।'

'যামিনী রায় দেশীয় রীতিতে ঐতিহ্যনির্ভর মনোমুগ্ধকর অঙ্কনশৈলীর উদ্ভাবক এবং বাঙলার একান্ত ঘরোয়া চিত্রশিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

"শেখ সুলতানের মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, প্রমুখ শিল্পীর প্রকাশ কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এত গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ, কোনো রকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে উনিশশো ছিয়াত্তুর সালে বাংলাদেশের কৃষকসমাজে এসে নতুনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে।"

'অন্যূন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘরবিরাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারব না, তেমনি তাঁর এ সুদীর্ঘ কালের আঁকা

ছবির ওপর কোনো বক্তব্য রাখতেও পারব না।' 'সুলতানের ছবির মানব-শরীরগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে মনে হতে পারে অসংগত, অনানুপাতিক;

"সুলতান তাঁর ছবির প্রতিটি দেহকেই সেই মহামানবের মতোই এঁকেছেন, যে মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল ৫২'র একুশ তারিখে কিংবা ২৬ মার্চ গভীর রাতে, কারণ এ দেশের অসহায় জনতার কাছে প্রতিটি দিনই তো বস্তুত এক-একটি ব্যথাকাতর শুক্রবার। তাদের অস্তিত্ব অনিঃশেষ এক যন্ত্রণার রূপকথা, তবে তারা অকুতোভয়, টিকে থাকার জন্য প্রতিমুহূর্তে তারা অদম্য সংগ্রামে লিপ্ত।" কবি আল মাহমুদ-এর ভাষায়, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রায় সমসাময়িক এই মৌলিক চারুশিল্পী বহুকাল যাবৎ উপমহাদেশের উত্থান-পতন, দেশ বিভাগ ও অন্যান্য মানবিক আলোড়নের মধ্যেও তাঁর নিজস্ব এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছেন।'

আল মাহমুদ আরও লিখেছেন, 'তাঁর সাথে তুলনা হতে পারে এমন শিল্পীরাও পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন তবে তাঁর শিল্পকর্মের মতো মৌলিকধর্মী নিরপেক্ষতা প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে।'

কবি শামসুর রাহমানের জবানী থেকে জানা যায়; তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, 'সত্যিকথা বলতে কি প্রথমদিকে আমি এস, এম, সুলতানের চিত্রকর্মের অনুরাগী ছিলাম না। . . . . .

'আমি ক্রমশ স্বতশ্চল এই চিত্রশিল্পী ও তাঁর চিত্রকর্মে অনুরক্ত হই। ক্লান্তিহীন পরিভ্রমণকারী সুলতান বর্তমানে . . . . .

'সকল শিল্পীর ওপর প্রভাব যার অপ্রতিরোধ্য। সুলতান কখনো এই প্রভাবে সংকুচিত হননি; লজ্জিত নন, বরং এটি তাঁকে অমর চিত্রকর হিসেবে বেড়ে উঠতে পুষ্টি যুগিয়েছে।' সুলতান প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান ইয়ুং-এর উদ্ধৃতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, 'any genuine artist transmuters our personal destiny into the destiny of mankind, and evokes in us all those beneficent forces that even have enabled humanity to find a refuge from every peril and to outlive to the longer night '.

শিল্পী এস, এম, সুলতানের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছিলেন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'আদম সুরত'। ১৬ মি. মি. (রঙিন) ফর্মেটে নির্মিত এ চলচ্চিত্রের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮২ সালে। অর্থাভাবসহ নানা রকম সংকট কাটিয়ে তারেক মাসুদ একসময় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

তারেক মাসুদ 'ইউনিট' নিয়ে চলে গেছেন সুলতানের আবাস নড়াইলে; ছুটে গেছেন ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে– যেখানে তিনি ফেলে এসেছেন রঙে

রঞ্জিত বর্ণিল অনুভূতিমালাকে; সেইসব জায়গা সুলতানের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল একদিন। ৬০ মিনিট সময়-দৈর্ঘ্যের এ প্রামাণ্যচিত্রে ফ্রেমবন্দী হয়েছে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের জীবনের নানা দিক।

চার.

সুলতানের নারীদের প্রতিও মাহমুদের পর্যবেক্ষণ বেশ প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ, 'তাঁর আঁকা সব নরনারীই বাস্তবের নরনারীর চেয়ে একটু সুন্দর, পেশীবহুল, নিখুঁত এবং কর্মপরায়ণ। ফিগারগুলো বাস্তবের চেয়ে একটু বিস্তৃততর। এই বাহুল্যই সুলতানের প্রতিটি রচনাকে মহিমা দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু শিল্পীর আঁকা মহিলাদের দেহগুলো পুরুষদেহগুলোর একদম বিপরীত। তারা একান্তই রমণীয় যা মাইকেলএঞ্জেলোর ছবিতে একেবারেই দেখা যায় না। সুলতানের নারীগণ এক একটি মূর্তিমান শক্তিমান কিন্তু লাবণ্য। প্রাচ্য ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের দেহ আবৃত, শিল্পী কাজ করেছেন কেবল তাদের উন্মুক্ত হাত, পা আর মুখের ওপর। তাদের সোনালি গায়ের রং আর মাতৃময়ী মুখাবয়ব।

শিল্পীর আঁকা জীবজন্তুও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিকৃতি; বিশেষ করে ষাঁড়গুলো অসাধারণ সুন্দর, যে কারণে সুলতানের ষাঁড়ের পাশাপাশি উল্লেখ করা চলে ভিঞ্চির আঁকা সেইসব ঘোড়ার অনুশীলনগুলো।

সুলতান যে-ধারায় ছবি আঁকেন; তাঁর ব্রাশ ব্যবহারে কখনো প্রকাশ্য কখনো গোপন একটি ক্যারিশম্যাটিক ব্যাপার লক্ষ করা যায়। টুকরো টুকরো রঙ ব্যবহারে সূক্ষ্ম বৃত্তের ছোট ছোট তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ছবিতে টেক্সচারের আমেজ তৈরি করেন। তাঁর ছবিতে রূপক ব্যবহারের সাথে ঐতিহ্যিক, ধ্রুপদী ব্যাকরণগত তেমন কোনো ধারার সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর বিষয় যতই সাদা-মাটাই হোক-না কেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ গভীর মননশীলতায় ভাস্বর।

সুলতান কে! তিনি একজন অনন্য পিকাসো! ভিনসেন্ট ভ্যান গগ! হয়তো দুই-ই সুলতান, হয়তো তার চেয়েও বেশি বলা হলে মোটেও ভুল বলা হবে না। নাটকীয় দেহভঙ্গিমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি পিকাসোর সদৃশ, আর ব্রাশের ঋজু-দৃঢ় আঁচড়ে তিনি ভ্যান গগের কাছাকাছি। বিষয়বস্তুর প্রগাঢ় ভাবগাম্ভীর্যতায় তিনি আরো বেশি কিছু। ফলে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে– যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পৌরাণিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামের কৃষকদের আকাঙ্ক্ষার এক জীবন চিত্রিত করেছেন। এটা তাঁকে অনলংকৃত পল্লীগাথা কিংবা ভাবাবেগাক্রান্ত গ্রাম্যদৃশ্যাবলি রচনা থেকে বিরত রেখেছে। এভাবে তাঁর কৃষকেরা পৌরাণিক বাস্তবতায় আদিম শক্তি ও

শক্তির প্রত্যয় লাভ করেছে; সেই সব কৃষক, সম্ভাব্য সমাজের কাছ থেকে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে নিতে অপেক্ষমান; সুলতান এই আদিম প্রত্যয়, এই শ্রেণীচেতনার উত্তেজনাকে গ্রহণ করেছেন ।

ধ্রুপদী বা চিরায়ত শিল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শত শত বছর মানুষের মনে যে বিশ্বাস দানা বেঁধে থাকে, সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা; *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধুসূদন মেঘনাদ ও রামের চরিত্র উল্টো করে চিত্রণের মধ্য দিয়ে সেই রকম একটি বিশ্বাসের মূল্যে কুঠারাঘাত করতে পেরেছেন বলেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য বাংলা সাহিত্যের সকল সীমানা পেরিয়ে চির চিরায়ত'র আসনে আসীন হয়েছে। একইভাবে এস. এম সুলতান নির্বীর্য, রুগ্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই হল তোর অতীত, ঐতিহ্য, ইতিহাস; এই হল তোর বলিষ্ঠ মা যার বাহু সংসার আগলে রাখত, শত্রুর মোকাবেলা করতে কিংবা সন্তানকে পুষ্ট রাখতে সুঠাম গড়নের সুস্থ শরীরবতী তিনি। এই তোর বাবা– যিনি জমি, জলায় কাজ করার জন্য সদাসুস্থ ও প্রস্তুত। এই তোর উঠোন– যেখানে সূর্যের বলিষ্ঠ রোদ এসে পড়ে আর তোর খোলা মাঠ যেখানে খেলা করত তোর অতীত আর এই তোর গরু, গাছ, মুরগি, ছাগল– যা-যা আছে সবই তোর, তুইও এদের আর তোরা সবাই ভুলে যা যে তোর স্বপ্ন রুগ্ণ, অপারগ!

ইংরেজ, ওলন্দাজ, পাকিস্তানি তোদের হাতেই বিতাড়িত হয়েছে; তোরা বাঘা যতীনের সন্তান, তোরা এম এন রায়ের সন্তান, তোরা সূর্যসেনের সন্তান! কাজেই এস. এম. সুলতানের এই স্বপ্ন, শুধু নিছক স্বপ্ন নয়; এটা এক দ্রোহ, এটা ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি, এটা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে সুলতানের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি।

সহযোগী গ্রন্থ ও পত্রিকা

১. বাংলা সাহিত্যের কথা/ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২. পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং/ কলিম খান

৩. নূরুল আলম আতিক সম্পাদিত সাহিত্য ও শিল্প সংকলন/ বিষয়: এস.এম.সুলতান

৪. বাংলা পিডিয়া

৫. বাঙালি মুসলমানের মন/ আহমদ ছফা

৬. শওকত হোসেন সম্পাদিত 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার' (কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক)

কেন লিখি

....

জীবনানন্দ দাশ

জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তা-ও তো মানবীয়। অবশ্য এরকম কবি আছেন—বা কাব্যনিয়তির পথে এমন সব মুহূর্ত মাঝে মাঝে এসে পড়ে যখন মনে হয় কবির ভাবপ্রতিভা এমন এক অপরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে যা জীবনের কোনো ব্যবহারের ভিতরেই ধরা পড়ে না, জীবনের প্রতিবিম্বও নয়, আমাদের এই ইতিহাসসম্মত জীবন ছাড়িয়ে কবিমানসের কোনো অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গিয়েছে। কোনো কবি যদি এরকম মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কালকের বা আজকের নিত্যব্যবহার্য সমাজপদ্ধতির বাইরে কোনো কিছুর কথা ভাবছেন, কিন্তু তবুও জীবনের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারেননি। কারণ জীবন, —এই জীবনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়, এরই ভিতরে মানুষের সমবায়-ব্যবস্থা বার বার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুন ভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুন ভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।

যাঁরা মনে করেন কবিতা যে কোনো সময় সৃষ্ট হতে পারে কারণ কবিতা সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্যের মতোই, —কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অন্য রকম হবে। তাঁদের মতো হয়তো মানুষের ভূয়োদর্শী মনই কবিতা রচনা করে যেতে পারবে—গদ্য কি পদ্যে, এবং সে কবিতার ভাষা ও অর্থে কোনো দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকবে না, কিংবা থাকা অবান্তর, বা অপরাধ।

থাকা অপরাধ। তাদের কারো হয়তো এই মত। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি সৎ সম্পাদকীয় উক্তিই যেন কবিতা। কিন্তু কবিতা বাস্তবিকই কি তাই? যে কোনো সুস্থ ও সমীচীন মানুস অসুস্থ বা অন্যবিধ সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উক্ত রকমের মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, —এবং অহরহ করে যেতে পারেন। এর জন্য আত্মভ্রষ্ট

হৃদয়াবেগ ও কল্পনাপ্রতিভাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার মতো কোনো বিশেষ সুযোগ বা প্রতীক্ষার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ তাদের মতে কাব্য রচনা সম্পর্কে ভাবনা প্রতিভা ও হৃদয়াবেগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কবিতা লেখার কাজ খুব উন্নতভাবে সম্পন্ন করবার পক্ষে রচয়িতার সচেতন জীবনদর্শী মন ও সেই মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করবার মতো লিপিকুশলতাই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুটো জিনিসের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যে যে সুলিপি প্রবর্তিত হয় কবিতা কি তা ছাড়া অন্য কিছু? আমার মনে হয়, এই সুলিপি সত্যিই খুব ভালো জিনিস। কিন্তু সুসমাচারের মতো এই সুলিপি –এই সমস্ত জিনিসকেই অবান্তর করে দিয়ে কবিতা নিজের চরিত্রবলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ কবিরা একে মনে করতেন মায়াবল। অতটা সাহস আমার নেই। আমি একে কবিতার চরিত্রবল বলে অভিহিত করেছি। যে কোনো রচনা-সৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিকতায় পরিণত করে দু-একটা লাইন, কয়েকটি লাইন কিম্বা সম্পূর্ণ একটি জিনিস অবিসংবাদীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে কবিতা হয়।

কবিতার সংজ্ঞা ও কবিতা পাঠ সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা লেখক ও পাঠক উভয় শ্রেণীর ভিতরেই সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে এ আশা স্পষ্টভাবে পোষণ করবার মতো কোনো উৎসাহ অভিজ্ঞ মানবের হৃদয়ে আজ হয়তো নেই। কিন্তু সে আশা যাতে চিরকালই ছলনার মতো না থেকে যায় সে জন্য আধুনিক লেখকেরা আবার অবহিত হয়ে উঠছেন।

লেখক হিসেবে আমিও অবহিত হয়তো, –কিন্তু অসমর্থ। আমার সৃষ্টিপন্থাও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে; হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশি–কোনো এক ভবিষ্যত বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতা কী,– কী,– কী তার কাজ কাজ, কী করে কবিতা গ্রহণ করতে হবে, –এই সব জিজ্ঞাসা সম্পর্কে কবি ও পাঠকের ধারণা ক্রমশই আরো পরিচ্ছন্ন না হলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন। আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে, জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার করে যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না।

কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণমানসকে অপরোক্ষ ভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে

সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তর ভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।

এই করে। এবং এই সমস্ত করে বলেই আমাদের গতিপরিণতির কাহিনী নিয়েই কবিতা; পরিণতিশীল জীবনকে পূর্বোক্ত উপায়ে সজাগ ও শালীন করে তুলবার ভার কবিতার ওপর।

কিন্তু তবুও কবিতার ওপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারো নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবিমানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলি ভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে), অভিজ্ঞতা সজাগ, ও চেতনা অবচেতনা ঐকান্তিক ভাবে সক্রিয় থাকার দরুণ ব্যবহারিক পৃথিবীতে এ রকম মানুষের কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙা-গড়ার কাজে শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির ভিতেরই তিনি ঢের বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়–এমনকি অধিকতর মহৎ;–বাস্তব কার্যক্ষেত্রে তেমন নন।

এ রকম উক্তি করতে গিয়ে আমি সত্যই আত্মবিস্মৃত কিনা তা সমসাময়িক কবি-বন্ধুরা বিচার করে দেখবেন।

আমার মনে হয়, এই সমস্ত উপরোক্ত বিষয় অনুভব করে আমি লিখি। কিন্তু কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয়, সুলিপি সৃষ্টি করবার জন্যও (এই সমস্তই ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার কথা, সফলতার কথা নয়) লেখা প্রয়োজন মনে করি।

আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এসব বিষয় নিয়ে যে কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস। যদি একথা স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে অগণন কবিমনীষীর সৎ জীবননির্দেশের সমুদ্র আমাদের হৃদয়ের কাছে থাকতেও তা প্রায়শই আমাদের জন্য লবণাক্ত হয়ে রয়েছে–এবং তার পাশেই ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের অন্নপূর্ণা মরীচিকা,–তবুও তাতে এ জিনিস প্রমাণিত হয় না যে কবিতা ও সাহিত্য ও সুলিপির ইতিহাস বিশ্ব-মানুষের ভাবনা ও চেতনাকে মূল্যজ্ঞানময় ও চরিত্রবান করে তোলেনি।

শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশা-ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলি শ্রুয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ,– ও এই অভিজ্ঞতা –এই সুজাতার থেকেই উৎসারিত।

[উৎস: আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত "সমালোচনা সমগ্র/জীবনানন্দ" গ্রন্থ]

গ ল্প

মানুষের প্রতিপক্ষ ঘুণপোকা ঘুণপোকার প্রতিপক্ষ মানুষ মানুষের প্রতিপক্ষ মানুষ

....

তা রে ক শা হ রি য়া র

ক.

বাল্বটা নিভিয়ে দিলে দেয়ালে চারকোণা আলো পড়ে। তখন মনে হয়, আসলে কেবলমাত্র অন্ধকার বলে কিছু নেই।

জীবনটাকে চারকোণা আলোর মধ্যে ছুঁড়ে দিতে কি-না ভালো লাগে। যেন পৃথিবীর তাবৎ আলো ঘনীভূত হয়ে ওই দেয়ালে পড়েছে, আর জীবন সেখানে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

তারপর–

ভাবনা ক্রমাগত এলোমেলো হতে থাকে। নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে ঘুমিয়ে পড়ি, কোনও কোনও দিন ঘুম আসে না।

খ.

দু-একটি রাত টিকটিকির খসে পড়া লেজের মতো কাঁপতে থাকে, ঘুমের ভেতর। শাদা কাপড়ের আব্রু ভেদ করে, আমি নিজের শবযাত্রা নিজেই প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে, যেখানে আমার পূর্ব-পুরুষের হাড়গোড়ের চিহ্ন মাটি হয়ে গেছে।

পথচারীদের একজন, যে সম্ভবত আমার পূর্ব-পরিচিত, আস্তে আস্তে বলে, 'আহা ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মরে গেল!'

শবযাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, 'ব্যক্তির মৃত্যু আছে, কিন্তু মানুষের মৃত্যু নেই।'

কর্পূরের গন্ধে ভারি বাতাসের কণ্ঠনালী চিরে গুলির শব্দ কানের পাশ দিয়ে চলে যায়।

আমি ধবধবে আব্রু ভেদ করে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করি, কারণ, তার উচ্চারিত বাক্যটি এর আগেও আমি কোথায় যেন শুনেছি।

অসংলগ্ন ঘটনা ঘুরে ঘুরে আসে, আর টিকটিকির খসে পড়া লেজের মতো কাঁপা রাত মাথা আছড়াতে থাকে মাটিতে।

গ.

ঘুমোবার আগে বই পড়া আমার প্রতিদিনের কাজ। নইলে কেমন জানি খালি খালি লাগে।

বই খুলি–

কালো পিঁপড়ের মতো অক্ষর। সারিবদ্ধ।

একটু পর যা মগজের মধ্যে বিড়বিড় করে হাঁটতে থাকবে।

পড়তে নিই,

কিন্তু থেকে যাই। থামতে বাধ্য হই।

: তুমি কখনও ঘুণপোকা দেখেছ?

: না।

আমি রুনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, গত পরশু।

: তারপর, তোমার বিবাহিত জীবন কেমন চলছে–

: ভালো না–

আমি নিজেও কোনও দিন ঘুণপোকা দেখিনি, রুনাকেও প্রশ্ন করেছিলাম। কোনও প্রশ্নই হঠাৎ আসে না। প্রতিটি প্রশ্নই দীর্ঘদিন ধরে ভেতরে ভেতরে তৈরি হতে থাকে।

ঘ.
আজ অমাবস্যা। বাইরে ত্রিশূলের তিন ফলার ওপর অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। পাশের ঘরে মাহমুদা 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে' শুনছে। বাবা-মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।
পড়তে চেষ্টা করি।
কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।

ঙ.
আমি হামিদ উদ্দিন (বি.এ) চাকরি খুঁজছি। যে কোনও ধরনের চাকরি। চাকরির ভীষণ প্রয়োজন আমার।
নইলে একটা উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছি আমি।
চেনাজানা অনেকের সঙ্গে দেখা হয় না আজকাল। নাকি নিজেকেই নিজে আড়াল করে রাখি।
নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয় কি?
সরু গলিটার ভেতর দিয়ে কুয়াশা হামাগুড়ি দিতে দিতে, দেয়ালের বাইরে মাকড়সার জালে আটকে যায়।
মাহমুদা, তুই কিন্তু আজকাল মোটেই লেখাপড়া করছিস না।
বুবুর জন্য তোর খারাপ লাগে না। এ বাড়ির মেয়ে ছিল, সে এক দিন।
তোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ছিল সে। কাকতালীয়ভাবে এক ধনী লোকের সাথে বুবুর বিয়ে হয়ে গেল।

চ.
টিনের চালে কুয়াশা জমে আছে। এ ঘরের দেয়ালে কোনও মহামানব বলে কি কিছু আছে?
আজকাল মাঝে-মধ্যেই আমার শরীরের ভেতরে নাকি বাইরে অন্যরকম এক কষ্ট দাপাদাপি করে। সে কষ্টটাকে হাতের মুঠোয় ধরা যাক। ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিই কষ্টটাকে।
ঘৃণা করতে শুরু করেছি, না কি আমি আগে থেকেই ঘৃণা করতাম। এত মানুষের ভিড়ে আমি কোথায়?
না কি আমি নেই। আমার থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

ছ.

গত পরশু প্রায় দেড় বছর পর, রুনার সাথে হঠাৎ দেখা হল।

রুনার প্রথম প্রশ্ন ছিল : আমি এখন কী করছি?

যে প্রশ্নটাকে ভয় পাই, সেটাই করে বসল সে।

: তুমি ঘুণপোকা দেখছ?

আমার পাল্টা প্রশ্নে রুনা চমকে যায়। আমি আসলে পালাতে চাচ্ছিলাম। যদিও কোনও প্রশ্ন হঠাৎ করে আসে না।

রুনাকে খুব একটা মনে পড়ে না। সে দিন নক্ষত্রের পতন দেখে ওর কথা মনে পড়েছিল।

রুনা আসলে আমার সাহস নেই। তাই নক্ষত্রের পতনের সাথে তোমাকে তুলনা করে নিজের খোঁড়া সান্ত্বনার শর্তে নিজেই লুকিয়ে থাকি।

তুমি প্রায়ই বলতে : আমি নাকি খুব ভালো–

'খুব ভালো' 'মহৎ' এসব বলে কিছু নেই। শরীরে জোরে ফুঁ দিলে চামড়ায় ঢেকে থাকা কঙ্কাল বেরিয়ে আসবে সবার।

তবুও ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলে দেয়ালের চারকোণা আলো দেখে মনে হয়, পৃথিবীতে কেবল মাত্র অন্ধকার বলে কিছু নেই।

জ.

চাকরি খুঁজছি। একটা চাকরির খুব প্রয়োজন।

নইলে দিন দিন উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছি।

মা খাবার এগিয়ে দিতে দিতে প্রায়ই বলেন : তোর বাবার চাকরি তো আর বেশি দিন নেই, বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে বলেছে–।

আমি মায়ের মুখের স্বচ্ছ সরল পর্দার আড়ালে কঠিন পাথর দেখতে পাই। এ সব কথার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অর্থগুলো বুঝে নিতে পারি।

ঝ.

পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই। বুবুর বিয়ের মাস খানেক পর তোকে একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার কিনে দিয়েছিল, যাতে তুই এখন গান শুনছিস। আমি কিছু নিতে চাইনি, বুবু প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। অবশেষে চৌদ্দশো টাকা নিয়েছিলাম একসেট মানিক রচনাবলি কিনব বলে।

কেনা হয়নি।

পাড়ার চা আর সিগারেটের দোকানদার যাদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে ঘরে ফিরতাম তাদের সমস্ত বাকি শোধ করেছিলাম। সেই সব বন্ধু যারা একশ দুশো টাকা পাবে বলে অনেক দিন দেখা করিনি, তাদেরকে দেখা দিয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ার সিগারেটের দোকানদারের সামনে বুক উঁচিয়ে বলেছিলাম : দশটা ফাইভ দাও। সিগারেট টানতে টানতে আমাদের গলিতে ঢুকেছিলাম।

বাসার সামনে বুড়ো লাইটপোস্টটা ঝিমুচ্ছিল আগের মতোই। বুবু অনেক দিন আসে না। নাকি আসতে দেয় না।

হয়তো সে আর নিজে থেকেই আসতে চায় না। সে মানুষ এবং পরিবর্তমান প্রাণীদের একজন।

ঞ.

বাইরে অমাবস্যার জমাট অন্ধকার। তুই বার বার রিওয়াইন্ড করে আজ জোছনা রাতে ... ... শুনছিলি এতক্ষণ। এখন বন্ধ করে দিয়েছিস। নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিস।

বুবুর যে লোকটার সাথে বিয়ে হয়েছে, তাকে প্রথম থেকেই আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু যে ছেলেটি উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তার মতামতের কী দাম আছে। লোকটার বিয়ের বয়স পার হয়েছে অনেক আগেই। তার বাপজান আয়ুব-মোনায়েমের নুনু চুষে অনেক ধন-সম্পত্তি আর ধানমণ্ডিতে মহল তৈরি করে ইন্তেকাল করেছে। ছেলে তার ওপর দাঁড়িয়ে দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ইত্তেফাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতি বৎসর বাপজানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে, মৌলভি হায়ার করে কোরআন খতম দেয়। লোকটা খায় আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। মাঝে মাঝে চ্যাংড়া চ্যাংড়া মেয়েমানুষ ভাড়া করে ফর্সা শরীর চাটে।

বুবু আর আসে না। নাকি আসতে দেয় না।

ঐ লোকটাকে আমার খুন করতে ইচ্ছা করে।

আচ্ছা, আমিও কি রুনার সাথে এরকম ব্যবহার করতাম? মাহমুদা, আজকাল তোকে খুব অচেনা লাগে। তুইও কি একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস?

ট.

হাঁটতে থাকলে মাঝে মাঝে মনে হয়, পায়ের পাতা উধাও হয়ে গেছে। তখন হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। তবুও হাঁটি। মাথার উপর হাতুড়ি পেটাতে থাকে রোদ।

ঠ.

আজ বিকালে বাবার মুখোমুখি হয়েছিলাম। ঠিক মুখোমুখি নয়, কারণ আমি সারাক্ষণ মাথা নিচু করে ছিলাম।

বাবা বলল : আমি জামাইয়ের কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি; তুই যা। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হবে।

আমার উত্তর ছিল : বাবা, আমার সাথে আরিফ নামে একটা ছেলের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। ওর দুলাভাই একজন হাই অফিসিয়াল। উনি আমাকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
এই ঢাকা শহরে একজন আরিফ এবং তার হাই অফিসিয়াল দুলাভাই হয়তো আছে কিংবা নেই। কিন্তু আমি তাদের চিনি না, কোনওদিন চিনতাম না।

ড.
মাহমুদা, তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?
বুবু তুমিও কি ঘুমে? রুনা তুমি ...
আচ্ছা, ঈশ্বর বলে আদৌ কি কিছু আছে?
ঘুণপোকা দেখতে কেমন?
কোনও প্রশ্নই এমনি এমনি আসে না। প্রতিদিন ভেতরে ভেতরে প্রতিটি প্রশ্ন বেড়ে ওঠে গোপনে। সিগারেট ধরাই। ধোঁয়া ছাড়ি। মশারির মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া উড়তে থাকে, হঠাৎ ঢুকে পড়া মশার মতো।
পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।

ঢ.
আমি এবার পড়ার টেবিলের পেটের মধ্যে ঢুকে থাকা চেয়ারটার দিকে তাকাই। এই চেয়ারটা, ঠিক চেয়ারটা নয়, চেয়ার থেকে আসা শব্দ নয়, চেয়ারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঘুণপোকা বারবার আমার মনোযোগ নষ্ট করছে।
বেশ কদিন ধরেই আমি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আজ শব্দের তীব্রতা এত বেশি যে, তার আমার সমস্ত মনোযোগ চুরমার করে দিচ্ছে। অথচ রাতের এ সময়টুকু আমার কাছে খুব মূল্যবান। আমি জানি না ঘুণপোকা দেখতে কেমন, তারা সংখ্যায় কত এবং চেয়ারের ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

আমি চেয়ারটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ঘুণপোকা খুঁচিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়ে, খাবার এগিয়ে দিতে দিতে তিনি শান্ত গলায় বলেন : তোর বাবার চাকরি আর বেশি দিন নেই।
কাল সকালে মা হয়তো তেমনি শান্ত গলায় বলবেন : চেয়ারটা ভেঙে ফেললি। আমি তখন মায়ের মুখের স্বচ্ছ সরল পর্দার আড়ালে কঠিন পাথর দেখতে পাব। সিদ্ধান্ত বাতিল করে, আমি চেয়ারটাকে আধ হাত উপরে তুলে চার পায়ের উপর মেঝেতে ছেড়ে দিই। হঠাৎ রতের নীরবতা খান খান করে আমাদের গলি দিয়ে চেয়ার আর মেঝের সংঘর্ষের শব্দ দৌড়াতে দৌড়াতে বড়ো রাস্তায় চলে যায়।
কান পাতি, চেয়ারের ভেতর থেকে আসা রিরক্তিকর শব্দটা আর শোনা যায় না।

ণ.
কষ্টার্জিত নীরবতার মধ্যে আমি পড়তে শুরু করি।
যে দাস নিজের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের মুক্তির জন্য সংগ্রামে উদ্যোগী তার অর্ধেক দাসত্ব ইতিমধ্যেই অবলুপ্ত। বৃহদায়তন ...
আবার থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।
[রচনাকাল : ১৯৮৬]